নগরে প্রান্তরে

নির্বাচিত গল্প-সংগ্রহ

সুশীল জানা

সুবর্ণরেখা ॥ কলকাতা ৯

উৎসর্গ

বড় বৌমা শমিতাকে

লেখকের অন্যান্য বই

—ছোট গল্প—

পদচিহ্ন

শেওলা

গ্রাম নগর

চিরদিনের কাহিনী

ঘরের ঠিকানা

শ্রেষ্ঠগল্প সংকলন

—উপন্যাস—

মহানগরী

বেলাভূমির গান

সূর্যগ্রাস

—কিশোরদের জন্য—

গল্পময় ভারত

১ম খণ্ড

২য় খণ্ড

বিপ্লবের ডাক

শতক্রুর সন্ধ্যা

সেকালের গল্প—১ম

সেকালের গল্প—২য়

সেকালের গল্প—৩য়

—ভারতের প্রাচীন প্রেম-গাথা—

সহস্র বর্ষের প্রেম

সূচীপত্র

সখা

'লগর মাঝির সঙ্গে তোমার সাদির কথা !' বন্‌শী সকৌতুকে বললে, 'তবে যে তুমি হলে মোর সয়া। লগর যে মোর সাঙাৎ ছিল।'

মংলা কেমন অন্যমনে বললে, 'সে কথার পর চার-পাঁচ বছর কেটে গেল।'

'লগর এখন কোথায় ?'

'সে তো চলে গেল কয়লার খাদে।' মরা গলায় আস্তে আস্তে বলে মংলা, 'হঠাৎ একদিন চলে গেল ক্ষেপে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কোনো খবর নাই হে।'

'মন খারাপ কোরোনি, হে সয়া—সে আসবে।' বন্‌শী লগর মাঝির কথা বলে, 'ছোট যখন ছিলাম—মহিষের পাল নিয়ে চরাতে আসতাম জংগলের ডাহীতে, সে-ও আসত। মোরা লাচতাম, গাইতাম, বাঁশী বাজাতাম, শালবনে ফুল পাড়তাম মহুয়ার। সে-সব দিন মনে পড়ে যাচ্ছে হে সয়া।'

মংলা কিন্তু আর কোনো কথাই বললো না। চুপ ক'রে রইলো দূরে দিগন্ত ছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে। তার উজ্জ্বল কালো চোখে ওই শূন্য পোড়া প্রান্তরের শূন্যতা প্রতিবিম্বিত হয় বুঝি কয়েক মুহূর্তের জন্যে, তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বললো, 'সেদিন উড়ে পুড়ে গেছে। জংগল লিয়েছে জমিদার, গোচর-ডাহী লিয়েছে কাগজের কল। জমিন গেছে, গো-মহিষ গেছে, সুখ গেছে—শান্তি গেছে হে বিদেশী। আমি এখন কাগজকলের ঘাস কেটে মরি—আর তুমি কি না গাঁ ছেড়ে আজ লুকিয়ে আছ মোর ঘরে।'

'হাঁ—আছি। কিন্তু চিরদিন কি লুকিয়ে থাকব সয়া ? আবার ঘুরে আসবে সেদিন।'

'কি জানি, বিদেশী।—'

'মোকে তুমি এখনো বিদেশী বলেই ডাকবে, সয়া ?'

মংলা হেসে বললে, 'তুমিতো তাই বলেছিলে একদিন মাঝি।'

'আজ তো একটা সম্পর্ক বেরিয়ে পড়লো হে সয়া।'

হঠাৎ একটা বিষণ্ণতার ছোঁয়া লাগে মংলার মুখটায়। তবু মুখে একটু হাসি টেনে এনে বললো—'যাই, গরম জল আনি, তোমার ঘা ধুয়ে দিতে হবে।'

ঘুরে এল খানিক বাদে মংলা গরম জল নিয়ে—পায়ের ঘা ধুতে বসলো বন্‌শীর।

বন্‌শী নিজের ঘায়ের দিকে চেয়ে চেয়ে বললো, 'শালাদের গুলিটা ভাগ্যে ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। না-হলে পচে মরতে হত তোমার ঘরে সয়া।'

মংলা কোনো কথা বললো না—মুখ নীচু করে এক মনে জলের ছিটে দিয়ে ঘা ধুতে লাগল।

বন্‌শী ফের বললে, 'সেরে এসেছে—না কি, বল?'

মংলা অন্য মনে শুধু বললে, 'হুঁ।'

হঠাৎ বন্‌শী মুখ খিঁচিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'আস্তে আস্তে—আস্তে হে, সয়া।'

মংলা বোধ হয় নিঃশব্দে একটু ফিক করে হেসে ফেলেছিল। বন্‌শী বললে, 'হাসলে যে।—'

'এমনি।' মংলা মুখটা আরও গোঁজ করে ঘা ধুতে লাগল।

'এমনি হাসলে?'

মংলা আর কোনো কথা বললে না। এমনি সে হাসে নি ঠিক—ভাবছিল, এই লোকটাকে প্রথম যেদিন সে আবিষ্কার করলো তার জালানির মাচার মধ্যে—সেদিনের কথা। ঠ্যাংয়ের কিছুটা দেখা যাচ্ছিল শুধু—আর এক জায়গা থেকে রক্ত চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল মাটিতে। মনে হবে বুঝি—ওই রকম একটা ঠ্যাং কে যেন তার জালানির পাঁজার মধ্যে কেটে ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

চমকে উঠেছিল—ঠিক ভয় পায় নি মংলা, নিঃশব্দে ফিরে গিয়ে চাল থেকে টাঙিটা নামিয়ে ঘুরে এসে বলেছিল, 'কে ঢুকেছিস বটে—বেরিয়ে আয়, নাহলে দিলম ঠ্যাং কেটে।'

প্রথমে ঠ্যাংটা নড়েও না চড়েও না।

'তবে দিলাম টাঙির কোপ।' মংলা ধমকেছিল। একটা জোয়ান মরদ বেরিয়ে এল তারপর—তার জাতের মানুষ, শুধু মাথায় নেই যা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেরিয়ে এল ঠ্যাং ঘষটে ঘষটে। তারও হাতে টাঙি।

'কে তুই বটে।' টাঙি বাগিয়ে মংলা রুখে দাঁড়িয়েছিল।

'চিনবেনি মোকে, আমি বিদেশী।'

'বিদেশী! কুন গাঁয়ের লোক বটে হে!'

লোকটা মংলার কুঁড়ের পেছনের জংগলটা দেখিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'জংগলের ওপার—গিরধিনি।'

'তো মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি ক্যানে?'

লোকটা অক্লেশে বললে, 'রাতটা থাকতম।'

'আর দিন এখনও শেষ হয় নি। ঢুকেচিস মোর মাচার মধ্যে!' মংলা বাজে কথায় ভুলবার মেয়ে নয়! বাপ মরে যাওয়ার পর একাই সে ঘর করছে। উনিশ কুড়ি বছরের গাঁট্টা-গোট্টা জোয়ান সাঁওতাল মেয়ে। ধম্‌কে বলেছিল, 'কে তুই বল ঠিক্ ঠিক্।'

'বিদেশীর নাম জেনে কী হবে। রাতটুকুন্ তো শুধু মাথা গুঁজে থাকতম—'

'মোর মাচার মধ্যে ঢুকলি আর নাম বলবিনি! গিরিধিনির লোক ত ইদিকে এসেছিস ক্যানে।'

'এই—কাঠ কাটতে।'

'হুঁ!—তোদের জমিদার জংগল কেড়ে লেয়নি?'

'লিয়েছে। তাইত বেরিয়ে পড়েছি।'

'তা মোদেরও তো লিয়েছে।'

'তবে চাষের জমিন পাই যদি—'

'জমিন! হোই ছাথগা—বাবুই ঘাস। কাগজকলের মালিক গোচরডাহী আর ধানী জমি সব কেড়ে লিয়ে ঘাসের চাষ করেছে।'

'মোদেরও তাই।'

'তবে! সব জেনে শুনে ন্যাকামী করছিস ক্যানে তবে?'

এত জেরাতেও এতটুকু ঘাবড়াচ্ছে না লোকটা। তার এস্তার মিছে কথা যে বুঝতে পারছিল না মংলা, তা নয়। তবে মনে মনে নিজেও সে বিব্রত হয়ে পড়ছিল—কি করবে সে এ লোকটাকে নিয়ে।

লোকটা আরও বললে, 'আজ রাতটা মোকে থাকতে দিলে ভোর ভোর আমি চলে যাব। পায়ে বরায় দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, বড় ব্যথা হচ্ছে।'

'হুঁ। কুথা ছিল বরা?'

'বনে।'

'বনে! সত্যি কথা বল—কুথায় দেখেছি যেন তোকে। ঠিক দেখেছি মনে হচ্ছে।' মংলা পাকড়াও করেছিল শেষ পর্যন্ত।

লোকটা হেসে বলেছিল, 'কুথায় দেখবে আবার মোকে। আমি বিদেশী। তোমার দাওয়ায় পড়ে থাকতে দাও শুধু রাতটা—ভোর ভোর যেখানে হোক চলে

যাব। আমি তোমার জেতের লোক—দুঃখী লোক। মোকে অবিশ্বাস কোরোনি। ভয় কোরোনি।'

'আরে দূর! তোকে আবার ভয়।' ঠোঁট বেঁকিয়ে মংলা বলেছিল, 'তবে থাক গে যা—হোই চ্যাটাই পাতা আছে দাওয়ায়।'

'চ্যাটাই-মেটাই মোর দরকার নাই।—হোই জ্বালানীর মাচাং-এ থেকে যাব।'

'হুঁ। লুকাতে চাস? তুই ঠিক চোরাই হাঁড়িয়া চোলাই করতিস, আর পুলিস তাই তোকে তাড়া করেছে।'

'তাই যদি হয়—ধর। জেতের লোককে পুলিসে ধরিয়ে দিবে?'

নাঃ—লোকটা অসম্ভব!—তাকে আপাদমস্তক একবার যাচাই করে দেখেছিল মংলা চোখ কুঁচকে। তারপর বলেছিল—'নাঃ, পুলিস বড় হারাম। মোদের বন্‌শী মাঝিকে ধরবে বলে তল্লাট ঢুঁড়ে ফেলছে।'

'বন্‌শী মাঝিটা আবার কে হে?'

'আরে দূর ভূত কোথাকার! তার নামও শুনিস নাই?' মংলা অবাক হয়ে বলেছিল, 'সে বড় ভালো চ্যাংড়া হে।'

'তবে ভালো। আমি বিদেশী—মোর অত কথায় কাজ কী!'

'কাজ কী!' মংলা রুখে বলেছিল, 'এই যে মোদের বন কেড়ে লিলে, ডাহী জমিন সব কেড়ে লিলে, মোদের মরদ গুলান বিদেশে পালালো—তা ঘুরোৎ চাস না?'

'চাই তো। কিন্তু দেয় কে?'

'বন্‌শী মাঝি বলে—সব আবার ঘুরোৎ হবে। মোরা লড়াই করে কেড়ে লিব।'

'তো লে কেড়ে।' লোকটি বলেছিল গা ছেড়ে, 'আমি কি না বলেছি?'

তার এই গা-ছাড়া জবাবে মংলা আবার গাল দিয়েছিল, 'বিদেশী ভূত!'

রাতের বেলা সেই বিদেশী ভূতটাকে বাইরের ঘুপটি দাওয়ায় একটা চ্যাটাই পেতে শুতে দিয়েছিল মংলা। নিজে শুয়েছিল কুঁড়ের ভেতরে, বাঁশের দরোজায় ভালো করে খিল এঁটে। কে জানে, বিদেশী শয়তানটার মনে কী আছে!

হঠাৎ ঘোর রাত্তির বেলা বন্ধ দরোজায় ঘা। আর চাপা গলায় ডাক:

'আহে—আহে—আহে—'

ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় লেগেছিল বৈ কি মংলার—কে জানে কী মতলবে ডাকছে লোকটা। দম বন্ধ করে বলেছিল—'শয়তানীর মতলব থাকলে কেটে ফেলাব একেবারে।'

লোকটা ককিয়ে বলেছিল, 'না গো—একটু জল দিতে পারো ? ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

হাতে টাঙি নিয়ে দরজা খুলেছিল মংলা। দেখে লোকটা হুঁ-হুঁ করছে। জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী হল বটে ?'

'জ্বর। বড় তেষ্টা। আর মোর জখম পা-টা যেন খসে যাচ্ছে হে।'

দেখতে দেখতে পা-টা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। অতএব ভোর ভোর যে-বিদেশীর চলে যাওয়ার কথা, তা আর হলো না। অধিকন্তু লোকটার ফাই-ফরমাস খাটতে হল মংলাকে। সেদিন ঘাস কাটতে যাওয়া হলো না তার। লোকটা বললে, 'যাবে একবার পিয়ারডোবা গাঁয়ে—মোর কুটুম আছে, গুরাই মাঝি। তাকে বলবে যেয়ে শুধু—তোর মামাত' ভায়ের অসুখ। দেখবে—ই খবর আর কারুকে দিবেনি কিন্তুক।'

কী করে মংলা আর—যেতে হলো। বিদেশী লোক বিপদে পড়ে গেছে।

লোকটার কী রহস্য আছে কে জানে; তবে আছেই কিছু!

খবর দেওয়ার পর গুরাই মাঝি আর একটি ছোকরা এলো রাতের অন্ধকারে ঘুপটি মেরে। দেখে মংলা তো আগুন। বললে, 'কী রকম লোক বটে হে তোমরা। খবর দিলম সকালে—এলে রাতের বেলা। ইদিকে কাহিল হয়ে পড়েছে তোমাদের রুগী।'

বিদেশী বললে, 'চেঁচাও নি হে।—'

মংলা গর্ গর্ করতে করতে চলে গিয়েছিল। তারপর ফিস্-ফাস্ গুজ-গাজ কথা ওদের হলো অনেকক্ষণ ধরে। খানিক বাদে চলে গেল দুজন—রুগী রইল পড়ে যেমন যেখানে ছিল। লোক দুজন চলে যেতেই ছুটে এসেছিল বিদেশীর সামনে মংলা—রাগে নয়, শ্রদ্ধায়—আনন্দে, মর্মজ্বালায় জ্বলে।

'এতক্ষণ বলোনি কেন মোকে—বলোনি কেন! যদি বিপদ হত!'

'কী বলবো হে ?'

'তুমি বন্শী মাঝি!'

'কে বললে ?'

'এই যে আমি আড়ি পেতে শুনলম।'

এবার বিদেশী চুপ।

'সারাদিন তোমাকে আমি দাওয়ায় ফেলে রাখলম!' অনুশোচনায় এবার যেন কান্না পেয়েছিল মংলার। বললে, 'চলো ঘরের ভেতরে।' ঘরের ভেতরে শোয়ার জায়গা করে দিয়ে বন্শীকে শুইয়ে দিল মংলা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে

মাথা নীচু করে কী যেন ভাবল একটু। বললো আস্তে আস্তে, 'মোকে ক্ষ্যামা. কর।'

বন্‌শী কাৎরে বললে, 'এদিকে পা-টা মোর খসে গেল হে।'

মংলা আবার বললে, 'কাল থেকে মোর ঘরে তোমার অনেক কষ্ট গেছে।'

'ও সব কিছু না হে।'

'দেখি তোমার পা ?' মংলা এতক্ষণে পায়ের ঘা-টা দেখতে দেখতে বললে, 'বন্দুকের গুলি লেগেছিল কাল।'

'কী করে জানলে হে ?'

'শুনেছি। সবাই জানে। বন্‌শী মাঝিকে কাল জংগল ঘেরাও করে পুলিস ধরতে গেছ্‌ল—পারে নি। কোথায় নাকি পালিয়ে গেছে।' মংলা আবিষ্ট ভাবে বললে, 'কিন্তু সে যে মোর ঘরে !—'

'মোর কথা কারুকে আর বলোনি তো।'

'না। আমি ভাবলাম, হোক বিদেশী—জেতের লোক ত ! লোকে জানলে হয়তো কোন বিপদ-আপদ হয়ে যেতে পারে। থাকবে তো একটা রাত মোটে —তো থাক। তাই বলিনি।'

'খুব বুদ্ধি তোমার হে !'

'আমি যাই এখন—রেতের বেলা ঘায়ের পাতা খুঁজে পাই কোথায় দেখি আবার।'

'রাতে থাক না।'

'উঁ হুঁ—দেরি হলে খারাপ হতে পারে হে, ঘায়ের ভেতরে রস ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে পাতা বসিয়ে দিলে ভেতরে যদি কিছু থাকে ত সব ঠেলে বেরিয়ে আসবে। ফুলা কমে যাবে, দরদ থাকবেনি। আমি যাই।—'

সেই বিদেশী—বন্‌শী মাঝি। দ্বিতীয় দিনে রাতে শোবার ব্যবস্থা উল্টে গেল। বন্‌শীকে ঘরে দিয়ে দরজা আগলে শুলো মংলা, পাশে টাঙি। শুলো বটে—ঘুম হল না সারা রাত। বাইরের প্রতিটি শব্দে চম্‌কে উঠতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে। বন্‌শী বলেছিল একবার, 'বাইরে শুলে যে তুমি !'

'হাঁ, কেউ এলে রইলম আমি। তুমি ততোক্ষণে ঘরের দেয়াল ভেঙে চলে যেতে পারবে বনের দিকে।...'

বন্‌শী মাঝির এত কাণ্ডে হাসবে না মংলা। ঘা এখন সেরে আসছে—আর কদিন বাদে দিব্যি চলে বেড়াতে পারবে। খোঁড়া হয়ে যাওয়ার বিপদ কেটে গেছে। প্রথম দিনেই পাতা বেঁধে দিলে এত কাণ্ড হত না।—ঘা পচে বিষিয়ে

উঠতো না। কিন্তু প্রথম দিন লোকটা মাচা থেকে ঘষটে ঘষটে বার হয়ে এসে বললে কি না, 'বিদেশী'!—

ঘা ধুয়ে নতুন করে তাতে কি একটা বুনো পাতা বসিয়ে দিয়ে উঠলো মংলা। বললে, 'পা এবার সেরে উঠেছে মাঝি—কিন্তু খবরদার বাইরে বেরিয়োনি।'

কৌতুক করে বন্‌শী বল্‌লে, 'কোথায় যাব আর সয়া, অমন শুইয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে! মংলা সয়ার ই ঘরের কোণ ছেড়ে কোথাও যেতে আর মন নাই মোর।'

সরস কৌতুক কোথায় গিয়ে কেমন যে বাজে কাকে। এক নিমেষ, চম্‌কে তাকায় বুনো মেয়ের চোখ।

'মনে রইলো মাঝি'—বলে তাড়াতাড়ি উছলানো মুখটাকে ঘুরিয়ে নিল মংলা অন্যদিকে। আস্তে আস্তে বললে, 'এবার যাই আমি ঘাস কাটতে, দেরি হলে পয়সা কাটবে চোর গুলান হে।'

দিনের শেষে মংলা সেদিন যখন ঘুরে এলো তখন খোঁপায় তার কৃষ্ণচূড়ার এক-থোকা ফুল গোঁজা। এসে দাঁড়ালো বন্‌শীর সামনে—সারাদিনের ক্লান্ত মুখটাও যেন মিষ্টি হাসিতে ভরে আছে। শুধোলে, 'বাইরে বেরোওনি ত বিদেশী?'

কৌতুক করে বন্‌শী বললে, 'হ্যাঁ—ঘুরে এলম তোমাদের গাঁয়ের বস্‌তি।'

মুহূর্তে পাংশু হয়ে উঠল মংলার মুখ।

বন্‌শী হাসলো।

মংলা বললে, 'তুমি ত জান না মাঝি, তোমাকে ধরার জন্যে পাঁচ শ' টাকা দেবে বলে থানায় ঢোল দিয়েছে। যদি কেউ—' মংলা ভয়ে থেমে গেল।

বন্‌শী বললে, 'বলো কি গো সয়া! তবে তুমি খপর দিয়ে এসো থানায়, তারপর ওই পাঁচ শ' টাকা নিয়ে চলে যাও মোর সাঙাতের কাছে রেলগাড়ীতে চেপে।'

'ই কথা তুমি বললে, মাঝি!' মংলা ভারি চোখ তুলে তাকালো একদৃষ্টে বন্‌শীর দিকে।

বন্‌শী হেসে উঠলো। বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা—মোর কথা না হয় ঘুরোং দাও। যেওনি তুমি। কিন্তু সয়া মাথায় ফুল দিয়েছ। মুখ-চোখ যেন কেমন ধারা। আজ ঠিক মোর স্যাঙাতের কথা মনে পড়েছে তোমার।'

মুখ-চোখ ভারি হয়ে উঠলো মংলার—বন্‌শীর সামনে যেন দাঁড়াতে আর সে পারছিল না। যাওয়ার সময় বলে গেল শুধু, 'সে মোর কাছে মরে গেছে হে বিদেশী।'

ডেকে আর হালকা কথা বলতে সাহস হলো না বন্‌শীর। 'ই হাদার জঙ্গলের মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলা দায়।··· অদের ভাব-সাব বুঝা ভার।'

মংলা বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারে। তারপর খোঁপার ফুলগুলো টেনে কী ভেবে অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। সহসা কেন যে তার মনে হলো—ফুলের তার আর দরকার নেই।

দাঁড়িয়ে ছিল সে একভাবে, এমন সময় সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো এক আধবুড়ো সাঁওতাল। বললে, 'বলো বন্ মাঝিকে—পিয়াশাল থেকে এসেছি।'

মংলা বললে, 'চলে যাও ঘরের ভিতরে।'

কিছুক্ষণ বাদে আবার একটি লোক বেরিয়ে এল বনের ভিতর থেকে ঘাপটি মেরে। বললে, 'শালবোনি থেকে এসেছি—বন্ মাঝিকে বলো।'

এমনি করে লোক এল আরও কয়েকজন। গোদা পিয়াশাল, শালবোনি, পিয়ারডোবা, কালিপাথরি, চন্দ্রকোনা। জমায়েত হলো এসে একে একে। এমনি হয় এক-একদিন। বিরাট এক পাহাড়ী জংগলের কিনার ঘিরে আদিবাসী এলাকা—লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত, দরিদ্র। গর্‌গর্ করছে আরণ্যক জীবন—আগুন জ্বলে ওঠার আগে গুমরে-মরা ধোঁয়ার মত। সেই অসন্তুষ্ট ধোঁয়ার ঘূর্ণির তালে যেন ঘর ভরে যায় মংলার। সেদিন অনেক কী সব শলা-পরামর্শ করে ওরা চলে গেল একে একে রাত যখন গভীর হলো।

মংলা এতক্ষণ বসেছিল দাওয়ার এক কোণে। এসব কথার মাঝখানে বন্‌শী মাঝি তাকে ডাকে না, বরং কথার ছলে যেন সরিয়ে দেয়। হয়তো কোনও গোপন কথা হয়। রাগ হয়, অভিমান হয় মংলার—তারই ঘরে লুকিয়ে থেকে বন্‌শী মাঝি তাকে বিশ্বাস করে না!

সেদিন সবাই চলে যাবার পর মংলা উঠি উঠি করছিল ঘরের ভেতরে যাবে বলে—এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ধপ্ ধপ্ করে খোঁড়া পা টেনে স্বয়ং বন্‌শী মাঝিই এসে হাজির বাইরের দাওয়ায়।

'সয়া!—'

মংলা তাড়াতাড়ি তার সামনে ছুটে এসে দাঁড়ালো।

বন্‌শী মাঝি দু'টো হাত মুঠো করে ধরল তার। বলে উঠলো—'তুমিই হলে মোর আদৎ সয়া। মুখ ফুটে বলতে হয় না কিছু—প্রাণের কথা আপনি বুঝে লাও।'

'কী হলো মাঝি ?' মংলা ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে তাকালো তার মুখের দিকে।

'কী হলো সয়া ? এত কাণ্ড করছো তলায় তলায় — বলোনি ত মোকে এক-দিনও !'

'কী করলাম, মাঝি !'

'এর মধ্যে একদিন চন্দ্রকোনা গেছলে ?'

'গেছলাম, মাঝি !'

'সেখানে বলে এসেছ — এ-গাঁয়ের তোমরাও যাবে জংগলে দখল নিতে ?'

'হ্যাঁ, মাঝি !'

'এর মধ্যে কবে ঘাস কাটার মজুরী বাড়ানোর জন্যে দু-দিন কাজ বন্ধ করেছিলে না কি ?'

'করেছিলাম, মাঝি।'

'সবাই তোমার কথা শুনল ?'

'কথাটা যে সকলের, মাঝি। আমি কে ? আমি তো তাদেরি একজন।'

'এসব কথা নিয়ে মোর সঙ্গে তো শলা-পরামর্শ করোনি কোনদিন।'

'তোমাদের শলা-পরামর্শে মোকেও তো ডাকনি কোনদিন মাঝি।'

'মোর ঘাট হয়েছে, সয়া। আর একটা কথা, আমি তোমার ঘরে আছি — এখানে তোমাদের সবাই কি তা জানে ?'

'তা জানে না।'

'কী বলেছ তাদের ?'

'বলেছি — ফেরার। বলেছি — লুকিয়ে আছে। আর বলেছি — চিরকাল কী সে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবে — দিনের আলোর মুখ কী দেখবে নি ?'

মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে রইলো বন্‌শী মাঝি। অন্ধকারেও যে উদ্দীপ্ত আবেগ ঢাকা পড়ে না, সেই স্ফুরিত আবেগ কেঁপে উঠতে শুনলো তার গলায়, ঝলকে উঠতে দেখলো তার চোখে। এই মেয়েটা কোথায় কোন গাঁয়ে গাঁয়ে বস্তিতে ঘুরে বেড়িয়েছে একা, গেছে চন্দ্রকোনার মাতব্বরদের কাছে লুকিয়ে, একজোট করেছে তাদের মেয়ে-মরদকে, অথচ কিছুই জানায় নি তাকে। মেয়েটাকে হঠাৎ মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করে বন্‌শীর।

বন্‌শী মংলার কথার জের টেনে আস্তে আস্তে বললে, 'ঠিক — অন্ধকার চিরদিন থাকবেনি, সয়া — সবাই মোরা আলোর মুখ দেখবো।' তারপর হঠাৎ চোখে পড়লো বন্‌শীর, মংলার খোঁপার কৃষ্ণচূড়ার থোকাটা তো নেই ! বন্‌শী বলে উঠলো, 'তোমার মাথার ফুল গেল কোথায়, সয়া ?'

মেয়েটা কেঁপে উঠলো যেন সহসা। বললো, 'ফেলে দিয়েছি।'

'কেন, সয়া ? বহুদিন পরে ফুল দিয়েছিলে—আমি এসে দেখিনি আর কোনদিন।'

মংলা কোন জবাব দিল না সে কথার। বন্‌শীর কোমরটা শক্ত করে ধরে বললে, 'চল—ঘরে চল, মাঝি। কাঁধে ভর দিয়ে চল মোর। লাঠি ছেড়ে হাঁটা তোমার উচিত হয় নি।'

বন্‌শী বললে, 'সকলের মুখে তোমার কথা শুনে লাঠির কথা ভুলে গেলাম হে, সয়া। মনে হলো—লাফ দিয়ে আজ ছুটে যেতে পারি।'

'চুপ করো, মাঝি।—'

মংলার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বন্‌শী বললে, 'না হে, সয়া—কথা বলতে দাও। তোমার দিকে চেয়ে কথা বলতে দাও আজ। চুপ ত অনেকদিনই করেছিলাম—বাপ-ঠাকুরদাদা পাথরের চাঙা কেটে কেটে ধানের জমি করেছিল—সেখানে মোরা আজ উঠবন্দী চাষী। উঠ বললে, যা চলে, কোথায় যাবি ? বনের লোক মোরা বনে ছিলাম। কাঠ কাটতাম—ফুল পাড়তাম মহুয়াব, খেতাম তাই বেচে। তাও কেড়ে-কুড়ে ব্যবসা করছে খোট্টা জমিদার। গোচর-ডাহীতে গোরু-মোষ চরাতাম—তাও কেড়ে লিয়ে বাবুই ঘাসের চাষ করলো কাগজকলের মালিক, আর পাশে খুলে দিল গোরু-ধরা খোঁয়াড়। গোরু ধরে ধরে সব নিলাম করে লিলে। চুপ থেকে থেকে ফৌত হয়ে গেল গরীব বাপ-ঠাকুরদাদা। আর কত চুপ করে থাকবো বল, সয়া ?—'

জংগলের মানুষ কথা কয়ে উঠেছে। আশ্চয সেই দীপ্তিতে ঝকমক করে ওদের চোখ।

বন্‌শী বললে, 'তোমাদের সকল পড়শীকে আজ ডেকে আন—আমি কথা বলব।'

শাল-মহুয়ার জংগল ঘেঁসে একটা মরা গাঁয়ের কোণ দেখে যেখানে একদিন গা ঢাকা দিতে এসেছিল বন্‌শী—দেখতে দেখতে সে জায়গাটা নতুন এক প্রাণস্পর্শে যেন নড়েচড়ে উঠলো। অরণ্যের লুকানো আগুন ধুঁইয়ে উঠতে লাগলো আস্তে আস্তে নিঃশব্দ অসন্তোষের মাঝখানে।

সে আগুন জ্বলে উঠলো একদিন। কাজে বেরোবার আগে মংলা বন্‌শীর পায়ের ঘা ধুতে বসেছিল—এমন সময় একটি মেয়ে ছুটে এলো হাউ মাউ করে।

'মোদের গোরুগুলান সব চালান করে দিলে শয়তানরা গো দিদি—সব কটা গোরু।'

মংলা চকিতে মুখ তুলে তাকালো মেয়েটার দিকে।

'ঘাসে মুখ দেয় নাই—কিছু না।' মেয়েটা হাত কচলাতে কচলাতে অসহ্য গলায় বললে, 'চরাতে যাচ্ছিলাম—জবরদস্তি ধরে খোঁয়াড়ে লিয়ে গেল হাসতে হাসতে।'

চোখে চোখে তাকাল মংলা আর বন্‌শী, নীরবেই। বুঝলে ওরা—এ-জবরদস্তির মানে কী। এ-গাঁয়ের বস্তি উজাড় করে চলে গেল সব ক'টা গোরু। মোটা মুনাফা লুটবে ঘাস-ক্ষেতের খোট্টা মালিক, মুনাফা লুটবে সরকারী খোঁয়াড়, শুধু ভিটে মাটি চাটি হয়ে যাবে এ-গাঁয়ের মানুষগুলোর। চালান হয়ে যাবে গোরুগুলো কোথায় না কোথায়। শহর-কারখানা অঞ্চলে বিকোবে গোস্ত হয়ে।

মংলা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বন্‌শীর ঘায়ের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'ঘা প্রায় সেরেই এসেছে, মাঝি—কিন্তু হাঁটার লোভে ঘরের বার হয়ে প'ড়ো নি যেন। আমি যাচ্ছি—সাবধানে থাকবে, বেশী হাঁটা হাটি—', বলে বন্‌শীর স্তব্ধ শুকনো চোখের দিকে চেয়ে হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। সেখানে নিঃশব্দ ভৎর্সনা, বিরক্তি, নির্দেশ। চকিতে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল মংলা।

'মোদের মরদগুলান কোথায়?'

বাচ্চা সাঁওতাল মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বললে, 'কাজে চলে গেছে ত'।'

'চল, কোথায় দেখি?'

এদিকে বন্‌শী বসে রইলো কান পেতে। ওর চোখে চাপা উত্তেজনা, ঔৎসুক্য। অনেকক্ষণ পরে শুনতে পেল সে একটা হল্লা—গোলমাল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাইরে এসে দাঁড়াল বন্‌শী। দূর থেকে শুধু হল্লাটাই শোনা যায়—এখানকার নিঃশব্দ আকাশের শূন্যতা শিউরে উঠছে তাতে ক্ষণে ক্ষণে। আর কিছু বোঝবার উপায় নেই। বন্‌শী খোঁড়া পা টেনে টেনে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগলো শুধু। একসময় গোধূলী নামল অরণ্যপ্রান্তে। বন্‌শী সাগ্রহে চোখ মেলে আছে ঘর-মুখো গোরু-ভঁইসের ডাক শোনবার জন্য। কিন্তু চমকে উঠলো সে ধোঁয়ার তাল দেখে। সেগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে আকাশে—তারপর শোনা গেল বাতাসে গোরু মহিষের বুক-কাটা আর্তনাদ, আর মানুষের হল্লা। বাঁশ ফাটার শব্দ।...

এমন সময় মংলা এলো ছুটতে ছুটতে—সারাদিনের ক্লান্তকঠিন মুখ ধূলি-ধূসর। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'শয়তান গুলান খোঁয়াড়ে আগুন লাগিয়ে দিলে, মাঝি।

মোরা সবাই গোরুর জন্যে ক্ষেতের কাজ বন্ধ করে বসেছিলাম। ওরা আগুন লাগিয়ে দিলে।' ক্ষোভে, ব্যর্থতায় যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো ওর।

বন্‌শী তাকিয়ে আছে নীরবে—স্তব্ধ চোখে।

মংলা বলল, 'এবার তোমাকে এখান থেকে সরে যেতে হবে মাঝি। হারামীরা একটা গোলমাল পাকাবে, পুলিস ডাকবে নির্ঘাৎ।'

'তবে? চলে যাব বলছ কেন?' বন্‌শীর গলায় ক্রোধ, রোখ।

'যদি ধরা পড়ে যাও!' উত্তেজনায় বুক কাঁপছে মেয়েটার, কেন যেন চোখ ছলছল করে উঠছে। খ্যাপা গলায় বলে উঠল, 'সে মোর সইবেনি—সে মোর সইবেনি বিদেশী। তুমি বাইরে থাকলে মোদের সাহস—মোদের জিৎ। তোমার বাইরে থাকা যে মোদের শক্তি।'

'তবে?'...

'চলে যাও জঙ্গলের দক্ষিণ। সব ঠিকঠাক করে দিচ্ছি।'

'একটা জংলা নদী আছে না?'

'শুকনা কাঠের মান্দাস করে দিব—ভেবোনি মাঝি।' তারপর মংলা আস্তে আস্তে বললে, 'তোমার পা-টা শুধু আমি সারিয়ে তুলতে পারলাম না মাঝি।'

রাগে একটা থাবড়া বসিয়ে দিলে জাংয়ে বন্‌শী—বলে উঠল, 'এই ঘেয়ো পা-টা আমাকে বসিয়ে দিয়েছে হে সয়া। এ জংগল ঘিরে আমার ঢের কাজ ছিল—আমাকে নড়তে দিলনি, আমাকে ছুটতে দিলনি।'

'আমি যাই—আমি যাই—সব ঠিকঠাক করি।' মংলা প্রায় ছুটে চলে গেল।

চললো বিদেশী বিদায়ের তোড়জোড়। সন্ধ্যের অন্ধকারে শুকনো কাঠের ভেলা তৈরী করে লুকিয়ে রেখে এলো মংলা ঝাঁটি বনের ভেতরে। বন্‌শীর নির্দেশ মতো বাঁশের মোটা একটা লাঠি কেটে রাখলে। কয়েকজনের পাহারা মোতায়েন রাখলে দূরে দূরে। বন্‌শীর সঙ্গে দেওয়ার জন্যে বাঁধলো ছোট ছোট গুটি দুই পুঁটলি। আজ সারা সন্ধ্যেটা কেবলি মনে হতে থাকলো তার—একটি লোক আজ চলে যাবে; এতদিন যে ছিল তার ঘর জুড়ে। তাকে ঘিরে আরও কত কী!

রাত যখন গভীর হলো তখন ডাকলো মংলা, 'মাঝি!'

গলার স্বরটা বড় ভারী লাগে নিজেরই কানে। বন্‌শী মুখ তুলে তাকালো। মনে হল—মেয়েটা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। সবটুক জীবনীশক্তি ওর গলায় এসে ঠেকেছে। অনেক কাজ করেছে হয়তো।

পুঁটলি দুটোর দিকে চেয়ে বন্‌শী বললে, 'ই সব কী, সয়া?'

'দুটো মুড়ি-চিঁড়ে—আর ওটায় আছে গুড়, পাটালী, নারকোল।'

'ই সব কেন করেছ আবার সয়া?'

'বনেই যে দুদিন কেটে যাবে মাঝি!'

'তোমার দেওয়া শুধু এই লাঠিটা ধরে আমি হেঁটে যতে পারতাম সারা বন, সয়া—এ লাঠিতে তোমার জোর, তোমার সাহস, তোমার যাদু মিশাল আছে।' বলে বন্‌শী লাঠিটা তুলে নিল।

মংলা পুঁটলি দুটো লাঠিতে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে সামনে থেকে সরে দাঁড়ালো—তাকালো শুক্‌নো চোখে বন্‌শীর দিকে কয়েক মুহূর্ত। ফিস ফিস করে বললে, 'যাও মাঝি। আর দেরি ক'রোনি। নদীর ধারে মোর লোক মোতায়েন আছে।'

বন্‌শী পুঁটলি বাঁধা লাঠিটা কাঁধে তুলে নিয়ে বললে, 'যাই তবে, সয়া। দিনের আলোয় দেখতে আসব আবাব—দিন যেদিন আসবে। আজ পালাচ্ছি অন্ধকারে।' একটু থেমে আবার বললে, 'ভেবোনি তুমি। আমি জানি সাঙাৎ মোর একদিন ফিরে আসবেই—মোদের জংগল যেদিন ঘুরিয়ে নেবো, জমিন যেদিন মোদের হবে। সেদিন কেউ ছেড়ে যাবেনি আর জংলা গাঁয়ের মাটি।'

একদৃষ্টে গভীর কালো চোখ দুটো মেলে চেয়ে রইলো মংলা। পাথর-কুঁদো মুখে ঠোঁট দুটো শুধু নড়ে উঠলো একবার—কিন্তু কিছু বললে না।

বন্‌শী দাওয়া থেকে নেমে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

সেইদিকে শুক্‌নো চোখ মেলে চেয়েছিল মংলা। হঠাৎ মনে পড়লো, তাইতো—সেই যে বিদেশীর হাতে টাঙিটা ছিল একদিন, সেটা তো দেওয়া হলো না!—সামনের চালেই গোঁজা ছিল সেটা। তাড়াতাড়ি সেটা পেড়ে নিয়ে ছুটলো সে বনের দিকে। বন্‌শী যাচ্ছে সামনেই।

পেছন থেকে ডাকলো মংলা, 'মাঝি।'

বন্‌শী ঘুরে দাঁড়ালো।

মংলা বললে, 'তোমার টাঙি।—'

'টাঙি!' বন্‌শী বললে, 'থাক সয়া ওটা তোমার কাছে। তোমার ছেলে হলে তার হাতে দিয়ে বলবে মোর কথা। বলবে মোর সাঙাৎকে।'

মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ালো মংলা।

তারপর টাঙিটা বুকের কাছে চেপে ছুটে পালিয়ে এলো ঘরে। এসে কুঁড়ের ঝাঁপ বন্ধ করে হু হু করে কাঁদতে লাগলো উপুড় হয়ে। কেন যে কাঁদে বুনো মেয়েটা—শুধু সে-ই জানে।

অধর মাঝি

গাঁউলি খুদে অফিসারের দল তার কেরানি-কারকুন আর তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল নদীর ওপারে—নিরাপদ অঞ্চলে। সরকারী জিপ মোতায়েন ছিল—তাতে চেপে বসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। মনের স্বস্তি চেপে রাখতে না পেরে একজন বলে উঠল, 'বাপ্‌রে, আচ্ছা এক জংলি দেশ। এই শুকা তো এই বান!'

একজন সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললে, 'দেরি হলে এলাকা ছেড়ে আর বেরুতে পারতাম না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। উপসাগর ছোঁয়া নাবাল দেশ—অসংখ্য নদীনালা জটিল স্নায়ুজালের মত ওর মৃত্তিকা ভাগ ঘিরে ঘিরে, পাক দিয়ে ছুঁয়েছে সাগরের জল। বৃষ্টিহীন শুকায় ভাটিতে বুকফাটা ডাঙা, বানে দেখতে দেখতে টইটম্বুর।

সরকারী জিপ স্টার্ট দিল সগর্জনে—তারপর ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল মহকুমা শহর মুখো।

'যাও—পালাও।'···

বিড়বিড় করে বললে খেয়া নৌকায় দাঁড়িয়ে থাকা একটা আধবুড়ো দেহাতী মানুষ।

মোটরের কৃত্রিম শব্দতরঙ্গটা তার সামনে থেকে একটা অনাবশ্যক অসঙ্গতিপূর্ণ ব্যাপারের মত বৃষ্টিভেজা হাওয়ার দমকায় মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। ঘোর হয়ে এল আবার এখানকার অকৃত্রিম সেই আদ্যিকালের প্রকৃতি—নির্মম সত্যের মত, অন্ধ নিয়তির মত। যতদূর চোখ যায়—আকাশ মাঠপ্রান্তর নদীনালা জুড়ে সেই রহস্যময়ী নিঃশব্দতা—দুর্বোধ্য, গম্ভীর আর নিথর।

অর্ধোলঙ্গ; কাদা-পলিমাখা বলিষ্ঠ কাঠামোর দেহাতী আধবুড়ো মানুষটা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পাথরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তার নৌকোয়—সঙ্গীহীন, চিন্তামগ্ন, পরিত্যক্ত। পাক ধরেছে ওর মাথার চুলে। তবু ওর মুখমণ্ডলের পাথুরে খাঁজে খাঁজে বয়সের দাগমারা অভিজ্ঞতা ও পৌরুষের কাঠিন্য যেন সোচ্চার। চৌকো চিবুকে অনমনীয় একটা দৃঢ়তার ছাপ। সে অধর মাঝি···এই নদী, তার উজান-ভাটি, বান তুফানের সঙ্গে তার আবাল্যের পরিচয়। সেই পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতার চোখে তাকাল সে একবার পশ্চিম আকাশের দিকে—

সেখানে বিশ্রী এক কালিঢালা জ্রকুটি। তাকাল একবার নদীর দিকে—রাগে যেন গরগর্ করছে সেখানে পশ্চিমা ঢল্। খরস্রোতের তলা থেকে উগ্‌রে উগ্‌রে উঠছে কোন পাহাড় ধোয়া গিরিমাটির রং—নোংরা থক্‌থকে। গা ঘিন্ ঘিন্ করে স্নিগ্ধ পলিমাটির দেশের মানুষের। এ রঙের সঙ্গে অধর মাঝির ঘৃণার সম্পর্ক—রুজির বিরোধ চিরদিনের।

হঠাৎ যেন সে ক্ষেপে গেল বেচারা কাঠের নৌকোটার ওপর। হিঁচড়ে টেনে তুললে নোঙর। হালে একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে খিস্তি করে উঠল নৌকাটার ওপর, 'চল শালা হারামির বাচ্চা···ঘোরা মুখ।'

ফিরে চলল ওপারে। এবার একলা।

আজ খেয়া বন্ধ। দুই পারই জনশূন্য। দম্‌কা বাতাসে বৃষ্টির ফোঁটাগুলো তার আদুল গায়ে এসে লাগছে কাঁকরের টুক্‌রোর মত।

এ পারের খেয়াঘাটের কাছে এসে একটা সরু খালের মধ্যে নৌকাটা ঢুকিয়ে দিযে নোঙর ফেললে অধর মাঝি। তারপর নালা খানা ডিঙিয়ে, জলা ভেঙে ফিরে চলল সে দূরের গ্রামে।

আকাশ অন্ধকার। বৃষ্টি সমানে পড়ছেই। নদীচরের জংলা দেশ। যতদূর চোখ যায়—শুধু ধানখেত আর ধানখেত। উঁচু গাছপালার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সে অনেক দূরে দূরে গ্রামের কাছে দেখা যায় শুধু কয়েকটা বাবলা গাছের মাথা। অঝোর বৃষ্টির ধারায় তাও ঝাপসা হয়ে গেছে।

বিকেল হতে না হতেই যেন সন্ধ্যে। কাছের লোকই আবছা। অধর নিজের ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়াতেই রামদাসের মেয়ে বললে, 'কে!'

অধর বললে, 'আমি বৌমা।'

মেয়েটা লজ্জায় জিভ কেটে মাথায় ঘোমটা তুলে ওই জলের মধ্যে দিয়েই অধরের পাশ দিয়ে সুড়ুং করে ছুটে পালাল। যতই চেনাশোনা পড়শীর মেয়ে হোক, সামনে যে হবু শ্বশুর। কুসুম লজ্জায় মরে গেল।

তার পড়ি-মরি করে ছোটা দেখে অধর সস্নেহে বললে, 'আস্তে বৌমা—আস্তে যাও। পড়ে যাবে।'

মেয়েটা ততক্ষণে এক ছুটে ঘর।

মেয়ের মুখে খবর পেয়ে খানিক বাদে তামাক খেতে খেতে তার বাপ এসে হাজির। চাষ-আবাদের কাজ শেষ রামদাসের, মাঠের মাঝে ধানগাছগুলো বেড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। চাষীর ঘরে এখন অনন্ত আশা আর কয়েকদিনের বিশ্রাম। সেই আশা আর বিশ্রামের আমেজ রামদাসের চোখে-মুখে। রামদাস হেসে হেসে

বললে, 'বেয়াই, চলে এলে যে! বর্ষা-বাদলের দিনে বেয়ানের কথা মনে পড়ে গেল বুঝি।'

হবু সম্পর্ক ধরে ডাকাডাকি ঠাট্টা মস্করা ওদের মধ্যে চলছে বহুদিন ধ'রে।

কিন্তু অধর মাঝির মুখ আজ নোংরা আকাশের মতো। সেখানে ঠাট্টা মস্করা আজ আর বেরুল না। থমথমে গলায় বললে, 'না বেয়াই, খেয়া বন্দ। গাঙে রাঙা জল দেখা দিয়েছে। জল বাড়ছে শাঁ শাঁ করে। তার ওপরে পুবালী হাওয়ার দমকা আর শেষ বর্ষার এই অঝোর ধারা। গতিক মোর ভাল লাগছে না বেয়াই। তাই চলে এলাম।'

রামদাসের জমাটি মেজাজ ভাঙার নয়—বহু পরিশ্রম, বহু কষ্টের শেষে একটা আশা ও স্বপ্ন জমাট বেঁধে আছে তার চোখে মুখে। সে মুখ স্বপ্নাতুর চাষীর মুখ।

রামদাস বললে, 'ওসব অলক্ষুণে কথা আর ভেব না ভাই। ভালয় ভালয় কটা মাস কেটে যেতে দাও। মাঠের লক্ষ্মী ঘরে তুলে আমার ঘরের লক্ষ্মীটিকে তোমার ঘরে হাজির করে দিই এই অঘ্রাণে। তারপর আমি নিশ্চিন্ত।'

'সে কি আমি চাইনে বেয়াই।' অধর মাঝি বললে, 'কিন্তু গাঙের গতিক ভাল নয়—এ তোমাকে বলে দিলাম। আমি গাঙের মানুষ—গাঙকে চিনি বেয়াই।'

রামদাস ওর ভয়কে আমল দিলে না। বললে, 'যতো হোক না—শুকার গাঙ বেয়াই। অত বড় বাঁধ আছে—ডাকুক না কত বান ডাকবে।'

'কিন্তু গাঙ যে টিপি হে—চড়ায় চড়ায় বুক চিতিয়ে আছে। জল টানবে কোথা দিয়ে?' অধরের চোখে-মুখে কথায় মরা নদীর তিক্ত অভিজ্ঞতা—একটা অনাগত ভয়।

কিন্তু তবু স্বপ্ন বুনে চলে রামদাস, যেমন করে ধান বুনেছে। চাষীর স্বপ্ন।... মাঠের ধানগাছগুলি বাড়ছে,—হিল হিল—খিল খিল করছে উদ্ভিন্ন-যৌবনা একপাল কিশোরীর মতো। রামদাস বললে, 'বেটি মোর পা তুলে বসে আছে তোমার ঘরে আসবার জন্য। তুমি পড়ে থাক খেয়াঘাটে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন—তুমি তো জান না, দিনের মধ্যে কতবার যে ছুটে ছুটে আসছে তোমার ঘরে!'

এমন সময়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল অধর মাঝির বড় ছেলে গগন—রামদাসের হবু জামাই। কাদা মেখে ভূত—ফিরে এল মাঠ থেকে। কোঁড়া জোয়ান ছোকরা, মাথায় বাবরি ছাঁট চুল। বাপের মতো লম্বা চওড়া চেহারা—চওড়া কপাল, চওড়া চিবুক। চেহারার মধ্যে যেন একটা কঠোর প্রতিজ্ঞা স্থির হয়ে আছে। গগন দাওয়ায় উঠে বসল।

রামদাস জিজ্ঞেস করলে, 'আর কত বাকি তোমার আবাদ শেষ হতে গো?'

'আজ শেষ করে এলাম।' গগন বললে।

'বাস!' হবু জামাইয়ের জন্য মস্ত বড় একটা দুর্ভাবনা যেন ঘুচে গেল রামদাসের। বললে, 'ভাল ধান হবে এবার। আজ দেখি তোমার টিকেবাড়ির পাঁচ কাঠায় ধানগাছ এরি মধ্যে হাব্‌সে উঠেছে। ওখানে কোন না পাবে দশ মণ। তারপর জলার মাঠ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে বিশ মণ। তারপর বৌমারির মাঠে সাত আট মণ।'

ধান ধান ধান।...মণ মণ ধান।...

রামদাস উছলে পড়ে শত ধারে। প্রায় পঞ্চাশ ষাট মণের একটা হিসেব খাড়া করে আঙুলে টুসকি দিয়ে বললে, 'বাস, আর কি চাই বেয়াই?'

'না, আর কি চাই!' অধর মাঝি সহসা বুঝি হারিয়ে গেল অনাগত সেই সোনার ধানের স্বপ্নের মধ্যে। বললে, 'ওরা সুখে থাক—মা লক্ষ্মী আমার ঘরে আসুক, সুখে ঘরকন্না করুক। ছেলেপুলে হোক—বংশ বাড়ুক। আর কী চাই!'

গল্পগুজব করে সন্ধ্যের পরে রামদাস চলে গেল। যাওয়ার সময় তার আশা আর স্বপ্নগুলো যেন চাপিয়ে দিয়ে গেল অধর মাঝির ওপরে। ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের কোণে, কিছুটা সচ্ছল উষ্ণ আশ্রয়ে সেইগুলো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। বিছানায় রাতের অন্ধকারে তার দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহের কাছে ঘন হয়ে আসে দ্বিতীয় পক্ষের বৌ সুমতি। কর্কশ হাতটায় ছোঁয়া লাগে দ্বিতীয় পক্ষের যমজ দুই সন্তান কালা আর ভোলার নরম মসৃণ গা, মনে ঘুর ঘুর করে প্রথম পক্ষের বড় ছেলে গগনের কথা—আর একটা লজ্জাচকিত কিশোরীর কথা। এই সামান্য লোকটার মন বলে, আর কী চাই—আর কী চাই!...

রাত করে বৃষ্টিটা যেন আরও জোরে নামল। সঙ্গে তেমনি পূবের হাওয়া। চালা থেকে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রান্ত ধারায় জলের কলকল শব্দ। এ ঘনঘোর বর্ষায় আর কিছু শোনা যায় না—আর কিছু দেখা যায় না। এর মধ্যে নদীচরের ছোট্ট গ্রামটুকু ঘুমে ঘোর।

হঠাৎ সেই ঘুমন্ত অন্ধকারে চাষীদের গোয়ালে গোয়ালে গোরুর ডাক শোনা যায়—খোঁয়াড়ে ছাগল ভেড়ার আর্তনাদ। ধড়মড় করে ঘুম থেকে উঠে বসল অধর মাঝি। কানে এসে লাগে অশ্রান্ত জলধারার শব্দ। বাইরে বেরিয়ে এল। উঠোন ভেসে তখন জল ছুঁই ছুঁই করছে উঁচু দাওয়া। বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ডাক পাড়ল গগনকে।

গগন ঘুম চোখে বলল, 'কী!'

অধর মাঝি বললে, 'উঠোন জলে ভরে গেছে। আলো জ্বেলে দেখ দিকি—কিসের জল। বৃষ্টির জল কিনা—'

গগন আলো জ্বালল। ঝুঁকে দেখল। বললে, 'বুঝতে পারছি না।'

অধর এক আঁজলা জল তুলে নিলে চোখের সামনে। হাত কেঁপে উঠল তার। বলে উঠল, 'এ যে সেই রাক্ষসী রাঙা জল রে!'

'বান!'

'গোরুবাছুরগুলো ভয় পেয়ে ডাকছে, খুলে দে, খুলে দে আগে। ওরে ডাক পাড় সবাইকে। বাঁধ ভেঙে গেছে। হেই মা গঙ্গা।—'

গগন ভয় পায় হঠাৎ। উঠোনে চেঁচাতে থাকে প্রাণপণে পড়শীদের নাম ধরে।

দশ-পনেরো ঘর প্রজার একটা গাঁ—অতর্কিত একটা আর্তনাদের মাঝখানে অন্ধকারে জেগে উঠল মানুষগুলো। কুকুরের আর্তনাদ, গোরু-ছাগলের ডাক, কাচ্চাবাচ্চার সহসা ঘুমভাঙা কান্না—আর জোয়ান মানুষের ভয়-পাওয়া হাঁকডাক আদিম বৃষ্টিভেজা অন্ধকারটাকে যেন এক মুহূর্তে একটা ভয়াবহ নরক করে তোলে। তারপর আর্তনাদের মহাপিণ্ডটা কোথায় মিলিয়ে যায় দিগন্তবিসারী হা-হা করা জলার মধ্যে।

গগন কোমরের কাপড় কষে উঠোনে নামতে যাচ্ছিল—অধর মাঝি তার হাত চেপে ধরলে, 'কোথায় যাবি?'

'চল পালাই।'

'এই জলে? মরবি!' একজন পুরোনো অভিজ্ঞ মাঝির সতর্কতা অধরের চোখে। বললে, 'এই জল ভেঙে-এই অন্ধকারে কোথায় ছুটে পালাবি তুই? পেছনে রাক্ষসী, এর মধ্যে যে ছুটবে—সেই মরবে।'

'তবে?'

সুমতি গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে স্বামীর, চোখে অসহায়তা। যমজ দুটো ছেলেকে চেপে ধরেছে বুকে। বছর তিনেক বয়স হবে বাচ্চা দুটোর—ভয়ে আঁকড়ে ধরে আছে মাকে। অধর একজনকে তুলে দিলে গগনের কাঁধে, নিজে তুলে নিলে আর একজনকে। সুমতির হাত ধরে বললে, 'উঠোনে নেমে দাঁড়া সবাই চালা ধরে। ঘরের দেয়াল ধসে পড়ে চালা এখনি বসে যাবে।'

উঠোনে নামল সবাই। জল তখন হাঁটুর ওপরে। চালা ধরে দাঁড়াল ওরা অধরের কথা মতো। চালাটা কড় কড় করছে। জল বাড়ছে একটু একটু করে হাঁটুর ওপরে। স্রোতের বেগ দ্রুত।

সেই জল ভেঙে ভেঙে অন্ধকারে এসে দাঁড়াল রামদাসের বেটি।

অধর শুধোলে, 'কে ?'

মেয়েটা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল, 'বাবা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চলে গেল কোথায়—দেখতে পেলাম না ! আমি দেখতে পেলাম না !'

'মরেছে !' অধর বলে উঠল অস্ফুট কণ্ঠে। মেয়েটাকে বললে, 'দাঁড়িয়ে থাক মোর পাশে, চালা চেপে ধরে থাক।'

দেখতে দেখতে মাটির দেয়াল ধসে পড়ল চারদিক থেকে—চালাটা বসে গেল জলের ওপরে কাৎ হয়ে।

অধর সতর্ক গলায় বললে, 'এবার উঠে পড় সবাই চালার ওপরে। একদিকে সবাই চেপে বসিসনি—ছড়িয়ে বস চারদিকে।'

কালা আর ভোলাকে বসিয়ে দিলে তার মায়ের তুপাশে। বললে, 'কপাল তোদের। শক্ত করে চেপে ধরে বসে থাক।'

সকলকে বসিয়ে দিয়ে অধর উঠল এক পাশে। উঠে বসে বললে, 'চালা এমনি থাকলে রইলম এই চরে—না হলে কোথায় যেয়ে মরব জানি না। হে মা গঙ্গা !'

চারিদিকের অথৈ অন্ধকারে আর কিছু দেখা যায় না। আর্তনাদের সেই মহা-পিণ্ডটা যেন ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। অনেক দূর থেকে হাওয়ায় ভেসে আসে তু-একটা ভয়াবহ ডাক—এক আধটুকু আর্তনাদ। মৃত্যু কণ্টকিত। এ অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তোলে গাঁউলি কুকুরের অসহায় কান্না। তারই মধ্যে রামদাসের স্বপ্ন বিছানো ধান ক্ষেতের ওপর দিয়ে বয়ে যায় উচ্ছ্বসিত রাঙা জলের সর্বনাশ।

বর্ষার ঠাণ্ডায় আর ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে কালা আর ভোলা, কাঁপছে সুমতি আর কুসুম।

অধর মাঝি আবার হুঁশিয়ারী দিলে, 'চালা খবর্দার ছাড়বি নি। ভয় নাই। চেপে বসে থাক।'

গগন বলে উঠল, 'চালা যেন নড়ছে বাবা !'

অধর বুঝতে পেরেছে আগেই। নদীঘাঁটা অভিজ্ঞ মাঝির বুক তার আগেই ধক্ করে উঠেছে। মুখে কোন কথা এল না। বোবার মতো শুধু সে চেয়ে রইল অন্ধকারে সীমাহীন—অন্তহীন জলরাশির দিকে। এ চালা এবার ভেসে যাবে তুর্ভাগ্যের কোন তুর্জ্ঞেয় পথে কে জানে।

গগন ভয় পেয়ে আবার বলে উঠল, 'চালা ভেসে উঠেছে বাবা !'

অধর মাঝি শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'চল বাপ এবার কপাল নিয়ে। রইল পড়ে এ ভিটা—রইল পড়ে এ চর।'

সুমতি চালায় মাথা ঠুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'চুপ কর বৌ—চুপ কর।' অধরের গলায় সান্ত্বনা, 'মাঝির বৌয়ের এখন সাহস চাই।'

ভয়ে চোখ মেলে চেয়ে আছে রামদাসের বেটি, চেয়ে আছে কালা আর ভোলা। খরবেগ স্রোতধারায় চালাটা ভেসে চলেছে কোন নিরুদ্দিষ্ট অন্ধকারে। কোথাও এতটুকু সাড়াশব্দ নেই, মেঘলা আকাশে চিহ্ন নেই একটি তারারও।

গগন বললে, 'কোথায় কোনদিকে যাচ্ছি বল ত? বুঝতে পারছি না কিচ্ছু যে।'

অধর নিষ্ঠুর নিশ্চিত গলায় বললে, 'দক্ষিণে—বাহার গাঙ।'

'হায় কপাল। সে যে সাগর!' গলা কেঁপে উঠল গগনের।

'কে জানে কপাল কোনদিকে নিয়ে যায় বাপ।' অধর নিখুঁত দিসারী গলায় বলল, 'তবে চালা এখনো যাচ্ছে গাঙের ধারে ধারে চরের ওপর দিয়ে—গাঙের টানে এখনও পড়েনি।'

'কি করে বুঝলে?'

'এই গাঙের জল ঘেঁটে যে বুড়া হয়ে গেলাম রে বাপ। গাঙের আসল টানায় পড়লে চালা আরও জোরে ছুটত।'

তাই বটে। চালাটা চলেছে এঁকেবেঁকে—ঘুরে ঘুরে। চরের উপরে উচ্ছ্বসিত জলস্রোত পাক খাচ্ছে—ঢেউ তুলছে, বাঁক নিচ্ছে। নদীর একটানা খরস্রোত নয়। তবু নদী যে কত দূরে আছে—তাই বা কে জানে! শুধু চালার ওপর থেকে এ কটি প্রাণী চেয়ে আছে অগাধ অন্ধকারে। সব কথা—সব প্রশ্ন আস্তে আস্তে থেমে এল ওদের। দুর্জ্ঞেয় ভাগ্য আর দুরন্ত প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করে জড়ের মতো বসে রইল ওরা। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে মাথায়—ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে যাচ্ছে শরীরের পেশী। জলে ভিজে ভিজে গলে পড়ছে হাতের মুঠো থেকে চালার পুরানো খড়।

প্রথমে গেল ভোলা। চালা থেকে খসে পড়ে গেল জলে। সামান্য এক পলকের একটু আর্তনাদ। তারপর সব চুপ।

গগন চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা ভোলা পড়ে গেল যে!'

'খবরদার, চালা থেকে নামবি না।' অধর ঠাণ্ডা গলায় হুঁসিয়ারী দিলে, 'কী করবি তুই, ওর কপাল।'

সুমতি ফুঁপিয়ে উঠল।

কালা চেয়ে আছে। একটু শব্দ নেই বাচ্চাটার মুখে। শুধু বিস্ফারিত দুটো

চোখ—মাছের চোখের মতো। ভেতরে ভেতরে ও যেন মরে শেষ হয়ে গেছে। কচি মুঠো দুটোতে চেপে আছে চালার খড়—সে দুটো কালিয়ে শক্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কখন আস্তে আস্তে গলে যাওয়া খড় সরে এল তারও মুঠো থেকে। ঠাণ্ডায় শক্ত হয়ে গেছে সারা দেহ। নেমে গেল—সর সর করে সেও নেমে গেল চালা থেকে।

গগন চেঁচিয়ে উঠল আবার, 'বাবা, কালা পড়ে গেল!'

'যাক। ওর কপাল বাপ্!'

সুমতি মাথা ঠুকে পড়ল চালায়। সামান্য একটা ফোঁপানির শব্দও শোনা গেল না তার।

চালাটা চলেছে।···

কচি কচি চারটে হাতে কালা আর ভোলা আজ সন্ধ্যেবেলায় তাকে জড়িয়ে ধরে কি বলতে চেয়েছিল যেন কিসের কি কথা! নাঃ, কিছু মনে পড়ছে না অধর মাঝির। সতর্ক দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে শুধু সে সামনের অন্ধকারে। একটা ঢিপি নেই—একটা বড় গাছ নেই, শুধু অঢেল অনির্দিষ্ট অন্ধকারের স্রোত। মাঝে মাঝে কখনও বা এক-আধটা কাঠির মতো বাবলা গাছ—তাও নাগালের বাইরে। শুধু বোঝা যায়—এখনও চালাটা ভেসে চলেছে জলস্ফীত চরের উপর দিয়ে।

তার মুখোমুখি সামনের চালায় তেমনি মাথা ঠুকে পড়ে আছে সুমতি। অনড়—অসাড়। অধর একবার চোখ ফিরিয়ে দেখল। ডাকতে ইচ্ছে হল—ডাকল না। আহা, তার যমজ ছেলের মা! কি বলেছিল যেন গাঁয়ের সবাই? ভারী পয়মন্ত! হুঁ, কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে অধরের।

এই তো সেদিনের কথা—আকাশে একটু মেঘের চিহ্ন নেই—চলে গেল আষাঢ় শ্রাবণ মাস। হাত গুটিয়ে বসে আছে চাষী, গোরুগুলো ছিঁড়ে খাচ্ছে তামার পাতের মতো মরা ধানগাছের পাতা। ইন্দ্রের পূজা হল, ধ্বজা উড়ানো হল। তবু জল নেই। শেষে হল ব্যাঙের বিয়ে। ডোবা থেকে দুটো ব্যাঙ ধরে এনে বিয়ে দিল সবাই। বিয়ের পর সবাই বললে, 'এ ব্যাঙ জলে ছাড়বে কে?'

পয়মন্ত লোক চাই—যার হাতের ছোঁয়া লেগে মাঠ ভরে হবে ফসল। ব্যাঙ ডাকবে, মেঘ গলে জল হবে—ভরে উঠবে শুকা মাঠের জলা। কে সে এমন পয়মন্ত আছে এ চরে?

সবাই বললে, 'অধর মাঝির দ্বিতীয়পক্ষ সুমতি।'

রামদাস বলেছিল, 'বেয়ান ভারী পয়মন্ত—নতুন বউ এসেই দুই যমজ ব্যাটা বিইয়ে দিয়েছে গো! ওর জুড়ি কেউ নাই এ চরে।'

তারপর······

গগন চেঁচিয়ে উঠল আবার, 'গেল, গেল—পড়ে গেল। বাবা!'

সুমতির সেই মাথা ঠোকা অনড় মূর্ছিত দেহটা গড়িয়ে পড়ল চালা থেকে।

অধর শুধু বললে, 'যার যেমন কপাল বাপ্ !' তারপর বিড় বিড় করে কি বললে শোনা গেল না। অন্ধকারে বসে রইল সে একভাবে চালা চেপে। অভিজ্ঞতায়, স্বার্থে, জীবনের মায়ায় অটল একটা নিষ্ঠুর মূর্তির মতো।

গগনের অসহ্য লাগছে এই নীরবতা—এই নির্মম নিরুদ্দিষ্ট ভেসে চলা। সে কথা বলতে চায়! বলে উঠল, 'কোথায় চলেছি?'

কেউ উত্তর দিল না। অধর বসে আছে একভাবে। জীবন মৃত্যুর মাঝখানে পড়ে হঠাৎ লোকটা যেন দুর্জ্ঞেয় আর নির্মম হয়ে উঠেছে।

গগন অস্ফুট কণ্ঠে বললে, 'কুসুম, ভাল করে চালা ধরে রাখিস।'

কুসুম বললে, 'ধরে আছি তো।'

'ভয় করছে?'

কি বলবে—মেয়েটা যেন ভেবে পেল না।

গগন আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবা, চালাটা খুলে যাচ্ছে!'

অধর তার সেই সতর্ক নিথর চোখ তুলে তাকাল। জলের তীব্র স্রোতে আর কতক্ষণ টিঁকে থাকবে চাষীর কুঁড়ে ঘরের চালা। দড়িগুলো আলগা আলগা হয়ে ফেঁসে যাচ্ছে—খসে যাচ্ছে খড়, টুকরো টুকরো বাতা বাখারি। দেখতে দেখতে ওটা চার টুকরো হয়ে গেল।

গগন চেঁচিয়ে উঠল, 'আলাদা হয়ে গেল। বাবা!'

'যে যার কপাল নিয়ে যাও বাপ!' অধরের সেই ঠাণ্ডা স্বার্থপরের মত কথা।

কিন্তু কোথায় যাবে!—এই অন্ধকারে—একা! কুসুম তার বিচ্ছিন্ন চালাটা থেকে আর্তনাদ করে উঠল—অধর মাঝির চালা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল জলে। ধরে ফেললে। ঝাঁকিতে খুলে গেল আরও কয়েকটা বাঁশ বাখারি।

'ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—ডুবে যাবে।' অধর পা দিয়ে ঠেলতে লাগল মেয়েটার শক্ত মুঠো-করা হাত।

'যাব—আমি যাব মাঝি। আমি যাব তোমাদের সঙ্গে?'

'গেল গেল! কোথায় যাবি চুলোয়। ছাড় ছাড়।' অধর তার শক্ত বলিষ্ঠ পা দিয়ে ঠেলে সরাতে চাইল মেয়েটার শক্ত মুঠো। এক পা—তারপর দুই পা।

কুসুম শুধু বলতে লাগল, 'আমি যাব—আমি যাব, মাঝি।'

দুই পায়ের চাপে ডুবে গেল মেয়েটা, ছিঁড়ে নিয়ে গেল অধরের খানিকটা চালা। বিমূঢ়ের মতো চেয়েছিল গগন—চেঁচিয়ে উঠল, 'কুসুম!'

কোন সাড়া নেই।

'সে কোথায় গেল বাবা?'

'জানি না।' অধরের সেই অকম্পিত নিষ্ঠুর গলা।

'বুড়ো শয়তান! বাঁচ, বাঁচ তুমি একলা!' গগন ঝাঁপ দিল কোনদিকে যেন। অতল অন্ধকারে বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মতো শোনা গেল তার বলিষ্ঠ বাহুর জলক্ষেপ! দূরে—ক্রমশ দূরে। অধরের চালাটা তখনও ভেসে চলেছে তার দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের অন্ধকারে। আর তার চালা থেকে ছেঁড়া ছোট্ট অংশটুকু কোথায় ভেসে ভেসে হারিয়ে গেল কে জানে। তবু বসে আছে সে একভাবে দয়াহীন মায়াহীন সতর্ক আরণ্যক আদিম একটা জীবের মতো। কোথায় তলিয়ে গেছে তার স্বপ্ন, কোথায় তলিয়ে গেছে তার সহস্র জীবনকথা, তার ঘর জমি চর—একটা গোটা মানুষের জীবন।

এক জায়গায় এসে চালাটা যেন ঠেকল। আর চলছে না। ভাঙা চালার তলা দিয়ে শাঁ শাঁ করে কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে জল, অন্ধকারে সে সতর্ক দৃষ্টি চালিয়ে দেখল। কিছুই দেখা যায় না। একভাবে বসে রইল কিছুক্ষণ। অত্যন্ত সাবধানে একটা পা নামালো চালা থেকে। মাত্র হাঁটু জল। পায়ে ঠেকল মাটি।

মাটি তো নয় জীবন। যেন কত কোটি জন্মের প্রত্যাশার ধন—স্বপ্নের কামনা।···

দুর্জ্ঞেয় ভাগ্যের কাছে এতক্ষণ আত্মসমর্পণ করা জড়পিণ্ডের মতো দেহটায় ফিরে এল বাঁচবার কামনা। আস্তে আস্তে সমস্ত মানবসত্তা ফিরে এল যেন তার মধ্যে। চালা ছেড়ে দিয়ে দু'পায়ে সিধে হয়ে উঠে দাঁড়াল সে। এগোল এক পা এক পা করে। জল কমছে। কমতে কমতে জল শেষ হয়ে গেল পায়ের তলা থেকে! মনে হলো—সে যেন ঢালু গা বেয়ে উঁচুতে উঠছে। একটা টিপির মতো। পায়ে ঠেকল দুটো কি তিনটে গাদাগাদি মানুষ।

কথা বলতে গেল, গলা দিয়ে প্রথমটা স্বর বেরুল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সে হাবা একটা জানোয়ারের মতো। খানিক বাদে গলা খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলে। কথা বলল।

'কে !'

সাড়া নেই।

'বেঁচে আছ ?'

কেউ সাড়া দিলে না।

চুপ করে বসে রইল সে সেইখানে।

ক্রমশ জল নেমে যাচ্ছে ঢিপির তলা থেকে, দূরে সরে যাচ্ছে জলকল্লোলের শব্দ। বসে রইল সে ভোরের অপেক্ষায়। কোনটা কোনদিক—তাও সে বুঝতে পারল না। শুধু এইটুকু তার মনে আছে—সে দক্ষিণে ভেসে এসেছে। যেন একটা আদিম মানুষ বসে রইল পাথরের মূর্তির মত।

তারপর ভোর হলো। চারদিকে রাঙা জলের সমুদ্র।

ভোরের আলোয় তাকাল সে দুটো মৃতদেহের দিকে। একটা পুরুষ একটা মেয়ে। উলঙ্গ। পুরুষটির বলিষ্ঠ একটা বাহু জড়িয়ে আছে মেয়েটার কোমর। কে জানে কোথা থেকে ভেসে আসা। মুখ থুবড়ে মরেছে আশ্রয়ের শেষ সীমায় এসে। দুজোড়া হাত খামচে ধরেছে ঢিপির মাটি—মানুষের জন্মগত অধিকারের মত। দেহ দুটো সে উল্টে চিং করে ফেললে। বড় বড় চোখ বের করে তাকাল বিহ্বলের মত। কুসুম না ! গগন না !

দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে বসল অধর মাঝি। লোকটার স্থির পশুর মতো চোখে এতক্ষণে নামল মানুষের অশ্রু। ভাঙা গলায় গুমরে গুমরে বললে :

'তোদের আমি বিয়ে দেবো বলেছিলাম—বিয়ে দেবো বলেছিলাম।'

একটি মানুষের মৃত্যু

দিনটা ছিল কি একটা ছুটির। সিনিয়র উকিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ব্রজ আচাযি্যর বৈঠক তখনও জমে ওঠেনি। দু'চার জন উকিল-বন্ধু সবে মাত্র জুটেছে। এমন সময়ে শাদা পোশাকে একটি লোক এল কিছু খোঁজ-খাঁজ করতে। ফালতু দু-চার কথার পর জিজ্ঞেস করল, 'রোগা মত—কাল মত, লম্বায় বড় জোর পাঁচ ফুট দু' ইঞ্চিটাক হবে, এ এলাকায় নতুন এসেছে—চেনেন নাকি?'

'চেহারার বর্ণনা যা দিচ্ছেন—এ তো বাঙালী মাত্রের।' ব্রজ আচাযি্য বললে, 'কি করে বুঝব মশাই কার কথা বলছেন!'

'এই বছর চল্লিশ বয়স হবে—জুলফির কাছে দু'চারটে চুল পেকেছে। এমনিতে শান্তশিষ্ট মত দেখতে'—

'কে বল দেখি?' ব্রজ আচাযি্য তাকাল তার উকিল বন্ধুদের দিকে।

মহেশ দত্ত বললে, 'বুঝেছি। এ এলাকায় নতুন এসেছে বলছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় জোর মাস দুয়েক।'

শুধু মহেশ দত্ত নয়, এবার নগেন ভট্চাযও বললে, 'বুঝেছি। ওই যে সেই পূবপাড়ার কেরাণীটোলার দিকে থাকতো হে!'

'বুঝেছি।' ব্রজ আচাযি্যও বললে, 'সেই ছেঁড়া বাজারের-থলে হাতে বাজারে যেতে দেখেছি তাকে বটে। নামটা কি বল দেখি।'

'বলছি।' মহেশ দত্ত নিজের কপালে কয়েকবার টোকা মেরে বললে, 'শচীবিলাস'...

নগেন ভট্চায বাধা দিয়ে বললে, 'কখখনো না। শ্রীবিলাস...শ্রীবিলাস রায়। হেঁ হেঁ—আমার মেমারী এখনও এত ফেল করেনি হে!'

ব্রজ আচাযি্য বললে, 'আমার মনে হচ্ছে—নামটা ওর শুধু বিলাস, শ্রীও নয়, শচীও নয়। কারণ সে আমার কাছে একদিন এসেছিল কোন এক বিধবার কি একটা ব্যাপার নিয়ে।

মহেশ দত্ত বললে, 'আরে সেই তো ওর বাড়িউলি—সেই যে মদের দোকান ছিল...মুরারী সাহা, তার বিধবা। ওদের বাড়ির নিচের তলায় থাকত।'

'শুধু কি থাকত! আরও কত কি শোনা যায়।' বলে নগেন ভট্চায মিটিমিটি

হাসতে লাগল। ব্রজ আচায্যির দিকে চেয়ে বললে, 'তোমার কাছে যে এসেছিল নিশ্চয়ই ওই বিধবার বাড়ি সম্পর্কে অথবা মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সের ব্যাপারে কিছু'—

'তাই।' ব্রজ আচায্যি বাধা দিয়ে বললে, 'ওই বিধবা মহিলাটির তো একটি বিবাহযোগ্যা কন্যাও আছে, শুনেছি। তা ছাড়া ও বাড়িটার কিছু কিছু বদ্‌নাম'—

মহেশ দত্ত কথাটা লুফে নিয়ে বললে, 'বিলক্ষণ। মা মেয়ে দুই। সেই জন্যই তো আত্মীয় স্বজন কেউ ওদের দিকে মুখ তুলেও তাকাত না। তার মধ্যে এসে পড়ল ওই শচী-বিলাস না শ্রীবিলাস না শুধু বিলাস। ওই ওদের কর্তা হয়ে দাঁড়াল।'

নগেন ভট্‌চায বললে, 'শুনি নাকি কোন কোর্টে একটা মামলাও চলছে সম্প্রতি —সে সব ওই বিলাসের দেখা-শোনায়।'

ব্রজ আচায্যি বললে, 'লোকটা তা হলে খুব পরার্থপর বল।' মহেশ আর নগেন দুজনেই অশ্লীল ভাবে হে হে করে হাসতে লাগল। মহেশ দত্ত বললে, 'এমন মধুর পরার্থপরতার সুযোগই বা কজনের ভাগ্যে ঘটে বল।'

সিনিয়র উকিলদের কর্মহীন সরস আসর, আলগা কথা—পরচর্চা।

ব্রজ আচায্যি রসিকতা করে বললে, 'কিন্তু মধুর কোনটি ?'

মহেশ হে হে করে বললে, 'দুটিই শুনি। একটি মধুর—একটি মধুরতর। তাই নিয়ে লোকটার পরিবারের সঙ্গেই মাঝে মাঝে ভীষণ ঝগড়াঝাঁটি লেগে যায়।'

ব্রজ আচায্যি বললে, 'তুমি অনেক খবর রাখ দেখছি।'

মহেশ দত্ত বললে, 'আরে আমার মুহুরি হরিপদর যে একদা ওটা ছিল মধু-বৃন্দাবন। জান তো হরিপদকে—কেমন ঘোড়েল! তোমার ওই বিলাস এসে তাকে পর্যন্ত কাৎ করে দিলে। ও-মুখো আর হতে পারে না সে।'

'লোকটা করত কী ?' ব্রজ আচায্যি শুধোলে।

মহেশ বললে, 'কেউ বলে কলকাতায় নাকি ব্যাবসা আছে, কেউ বলে—ওসব স্রেফ গুলতাপ্পি। কোন্ অফিসের নাকি কেরাণী।'

নগেন ভট্‌চায বললে, 'ছুটির দিনে কখনো সখনো বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে গঙ্গার দিকে ওকে বেড়াতে যেতেও দেখতুম।'

'আরে রাখো ওসব আদেখলাপনা।' মহেশ বলে ফেললে, 'সে তো তুমিও মাঝে মাঝে পরিবারের সঙ্গে বেড়াতে বেরোও।'

'তার মানে!' নগেন গর্জে উঠল, 'ওই একটা ওঁছা লোকারের সঙ্গে তুমি

আমার'—বলে থেমে গেল। মনে পড়ল সহসা—একজন বাইরের লোক আছে। বাইরের লোকটি মন দিয়ে ওদের সব কথা যেন গিলছে।

এমন সময় ব্রজ আচায্যির আড্ডার বড় একটা দল সকলরবে ঢুকে পড়ল বৈঠকখানায়। ভূপেন ঘোষাল হাসতে হাসতে বললে, 'ষাঁড় দুটোর লড়াই লেগে গেছে এরই মধ্যে।'

শাদা পোশাক এবার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। ব্রজ আচায্যিও তাকে বিদায় করতে ব্যস্ত। বললে, 'এই তো শুনলেন সব। ওর বেশী আর জানিনে। আমাদের সঙ্গে তো বিশেষ মেশামেশি ছিল না—বুঝতেই পারছেন।'

শাদা পোশাকের লোকটি সেটা বেশ ভালভাবেই বুঝেছে। শহরতলির হাফ মফঃস্বল এলাকা—ব্রজ আচায্যিরা তার উঁচু তলার মানুষ। ওই শচীবিলাস, না শ্রীবিলাস, না শুধু বিলাস এই সব নেতৃস্থানীয় মানুষদের কেউ নয়। যেতে যেতে সে ব্রজ আচায্যির বন্ধুবৎসল কৌতুকময় কণ্ঠস্বরটা শুনতে পেলে—বোধ করি যুধ্যমান দুই বন্ধুকে ঠাণ্ডা করছে:

'তা জীবনে এক-আধটুক পরস্ত্রী সঙ্গ বা প্রেম-টেম কি আর হয় না কারুর। ও কিছু নয়। বলি রক্ত মাংসের মানুষ তো হে। ওতে তোমার নগেন চটা উচিৎ নয় আর মহেশ তোমার খোঁচাও মারা উচিৎ নয়।

হো হো করে একটা অট্টহাসি উঠল বৈঠকখানায়।

শাদা পোশাক এবার সিধে চলল মুহুরি পাড়া কেরাণীটোলার দিকে।

ছুটির দিন। মুহুরিপাড়া নীরব। কোর্ট ছুটি বলে গাঁ-দেশের বাড়িতে চলে গেছে অনেকে। সাক্ষী তালিমের বদলে কোথাও বা বসেছে তাস-পাশার আড্ডা। হরিপদকে খোঁজ করে শাদা পোশাক এসে দাঁড়াল এক তাসের আড্ডায়।

কেস আর মক্কেলের গন্ধে তাস ফেলে সকলে একসঙ্গে তাকে প্রায় ভীমরুলের মত ঘিরে ধরলে। সে হেসে ফেলে বললে, 'আমার মামলা-মোকদ্দমা নয় মশায়—আমি শুধু হরিপদবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

হরিপদ একটু বিস্মিত হয়ে তাস ফেলে উঠে এল। বললে, 'কি ব্যাপার বলুন দেখি!'

'বিলাস বলে আপনি কাকেও জানেন? নতুন এসেছে—শুঁড়ী মুরারী সাহার'—

'বাস বাস—আর বলতে হবে না।' হরিপদ থামিয়ে দিয়ে বললে, 'তাকে খুব চিনি। চিটিং কেস তো?'

'প্রায়।'

'হবেই। ও আমি আগেই জানতাম—হবে। ওর জন্যে আর আড়াল

আবডাল কি মশাই, ওকে আমরা সবাই জানি'—বলে হরিপদ শাদা পোশাককে তাসের আড্ডায় এনে বসালে। খেঁতুদের দিকে চেয়ে বললে, 'বলিনি ওই বিলাসের কথা ? এই দেখ, এই দেখ, এই দাদাটি আমাদের ফেঁসেচেন তার কাছে। আরে বাবা, হরিপদ নন্দী ছায়া দেখলেই মানুষ চেনে। তা কত টাকায় ফাঁসলেন ?'

লোকটি আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, 'মানে ঠিক টাকা নয়—এই একটা জমির ব্যাপার—মানে'—

'জমি!' হরিপদ বললে, 'কিনবেন বুঝি ? ওর যে চালচুলো নেই মশাই! আর নেই বলেই তো যা খুশি তাই করে বেড়াচ্ছে। সেই যে বলে—ল্যাংটোর নেই বাটপাড়ের ভয়। কোথা থেকে ফোর-টুয়েন্টি করে এসে জুটেছে এখানে—ঢুকেছে আবার ওই বজ্জাত মাগীটারই ঘরে। ওই যে বললেন মুরারী সাহা, তারই বিধবা, প্রভাবতী।'

অবিনাশ তাস গুটিয়ে বললে, 'প্রভাবতীর ওপরে তোমার রাগ আছে হরিপদ, তুমিও তো ওখানে সেঁধোবার চেষ্টা করেছিলে একদিন। অঢেল টাকার বিধবা মালিকানী।'...

হরিপদ চোখ মটকে বললে, 'দেখ্‌, তা বলে ওই গরীব বুড়ো যোগেন মাস্টারের দশটা টাকা নিয়ে ওই চিটিংবাজের মতো ফাঁকি দিইনি।'

অবিনাশ বললে, 'আমাদের মতো ঘরে হাত চালাচালি ধার না করে কে ? বিলাসও তাই করেছে।'

পরেশ মুহুরি বললে, 'কিন্তু তা না হয় হলো, পরাণ মুদি যে অত ধড়িবাজ, তার সঙ্গে ওর অত ভাবসাব কেন বল দেখি ?'

'আর কেন! দোকানে ওর নির্ঘাৎ মোটা ধার।' হরিপদ বললে, 'ওই শোন হে অবিনাশ, তোমার বিলাস গিয়ে এখন আবার পরাণ মুদিকে পথে বসাচ্ছে। এক ধার-বাকির তাগাদা ছাড়া পরাণ আবার কুটুম্বিতে করতে যায় কার বাড়িতে ? ব্যাটাকে দেখলে তো আমার পরাণ উড়ে যায়।'

'সে তোমার অনেক ধার-বাকি আছে---তাই।' পরেশ বললে, 'আমি কিন্তু বিলাস আর পরাণকে বেশ হাসি-খুশি অবস্থায় দেখেছি।'

অনাদি মুহুরি এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। হঠাৎ সে বললে, 'আর একটা কথা শুনলে তো তোমরা একেবারে চম্‌কে উঠবে হে! একদিন দেখি, রাখাল সা--ওই যার এখন মদের দোকান, তার সঙ্গে রাত নটার পর বিলাস খুব গপ্‌প করতে করতে ফিরছে!'

'তবে !' হরিপদ অবিনাশের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে, 'তবে ! আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, মদের দোকানে অন্তত ওর পাঁচশ'টি টাকা ধার। প্রভাবতী ওর বাড়িউলি···আর ওগুলো সব—ওই যে কি বলে, অনু···অনু··· অনুসঙ্গ।'

অবিনাশ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি যে বল তার ঠিক নেই—একই বাড়িতে বৌ ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে !'···

পরেশ বললে, 'রাখাল সা'র মেয়েরাও ওর বাড়িতে যায় দেখেছি।'

হরিপদ বললে, 'লোকটা ভারি মেয়ে ঘেঁষা।' তারপর একটু অর্থপূর্ণ হেসে বললে, 'স্টারটা ওসবে ওর ভাল। কিন্তু বাছাধন কখন যে কাকে পথে বসাবে তার ঠিক নেই। মাঝে মাঝে বৌটা তো ওর চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে। কেন বল দেখি ?'

অনাদি বললে, 'সে ঘর করতে ঝগড়া-ঝাঁটি হয় না কার বাড়িতে ? আমি দেখেছি—বিলাস সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায় !'

হরিপদ বললে, 'দেখ, একদিন একটা খুন-খারাপি হবেই হবে, তখন সব কেলেংকারি বেরিয়ে পড়বে। আমার কথা বিশ্বাস করছ না তোমরা'—

অবিনাশ বললে, 'কি জানি ভাই। গত বোশেখের মেলায় দেখি—চার ছেলে মেয়ের হাতে পুতুল বাঁশী-টাশি সব কিনে দিয়ে কত্তা গিন্নি দুজনে পথ দিয়ে চলেছে হাসিখুশি হয়ে।'

পরেশ বললে, 'সে আমিও দেখেছি।'

অনাদি বললে, 'সে আমিও দেখেছি।'

হরিপদ মুখ গোমড়া করে বললে, 'সে আমিও দেখেছি। সে তো আমরা সবাই করি—সে আর নতুন কী ! কিন্তু প্রভাবতীর সঙ্গে ওর ব্যাপারটা পাড়ার সবাই জানে—তোমরাও জান।'

অবিনাশ হেসে বললে. 'সে তুমিই ভাল জান। আর ধার-কর্জ, ছেলেমেয়ে বৌয়ের কথা যদি বলো—ও আমরাও যা, বিলাসও তাই। গরীব ছাপোষা গেরস্ত।'

শাদা পোশাক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলে। এখানে আর কোনও খবর নেই।

হরিপদ বললে, 'উঠলেন ? যান তবে। ওর সম্বন্ধে সাবধান মশাই—এক নম্বর চিটিংবাজ।'

শাদা পোশাক পথে নামল এবার। সিধে পথ ধরলে পরাণ মুদির দোকানে।

পরাণ মুদি তখন খেরো বাঁধা খাতায় হিসেব করছিল। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দোকানে খদ্দের নেই। পরাণ একলা। শাদা পোশাক দোকানে উঠে বসলো। বললে, 'বিলাস রায়কে চেন ?'

'বিলক্ষণ।—এই তো'—পরাণ হাত তুলে পথ দেখিয়ে দিলে।

'না, আমি যেতে চাইনে। কিন্তু জানতে চাই—কি রকম লোক।'

'খুব ভাল। সদাশয় ব্যক্তি।' পরাণ একটু হেসে বললে, 'শুধু আমার একটু ক্ষতি করে দিয়েছেন।'

শাদা পোশাক উৎকর্ণ। বললে, 'টাকা ? কত বাকি ?'

'না না—সে সামান্য। সে এখানে সব বাবু ভায়াই করে। বুঝি তো, ছাপোষা বাবুদের চলে না।' পরাণ বললে, 'আমার ক্ষতি হল ছেলেটাকে নিয়ে।'

'কি রকম ? ছেলে বিগড়ে বদ্ করে দিয়েছে বুঝি ?'

'আজ্ঞে না—না—না। ছেলেটা পড়েছিল এই ক্লাশ এইট পর্যন্ত। তারপর আমি দোকানে বসিয়ে দিয়েছিলাম।' পরাণ বললে, 'তা বিলাসবাবু বলে কয়ে আবার জোর করে তাকে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিলেন। ছেলেটা অবিশ্যি ভালো—মাস্টার-বাবুরাও বলতেন। কিন্তু তাতে ফল হয়েছে এই যে দোকান ঠেলে মরছি এখন আমি একা।'

'আচ্ছা প্রভাবতী কে ? তার সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক ?'

পরাণ কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'তিনি—মানে প্রভাবতী ওঁকে কী চোখে দেখেছেন জানি না, বোধকরি বা দেবতাই হবেন।'

শাদা পোশাকের শিরদাঁড়া সিধে হলো। শুধোলে, 'বিলাসের তো বৌ ছেলে-মেয়ে আছে ? শুনেছি, প্রভাবতীরও নাকি খুব বদনাম ?'

'বুঝেছি—যা বলতে চান।' পরাণ বললে, 'ওঁকে পেয়ে প্রভাবতী তা হলে বেঁচে গেছেন।'

'আচ্ছা, তোমার ছেলেকে আবার ইস্কুলে পড়ানোয় ওর কি লাভ—কি স্বার্থ ?'

'কিছু না'—পরাণ বললে, 'উনি দয়া করে পড়াটড়া দেখে দেন। টাকা দিতে চেয়েছিলাম—তা উনি বললেন, থাক—বরং ধারে তুমি সওদা দাও, ওই ঢের।'

'ওকেই বলে বাঁচার কৌশল। আচ্ছা লোকটা কি খুব বদমেজাজী ? মানে খুব গোঁয়ার—অহংকারী ?'

'আজ্ঞে তা তা—মানে কখনো সখনো। আবার খুব ঠাণ্ডাও।'

শাদা পোশাক বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

পরাণ ঘাবড়ে গেল। তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার নামটি—'

'সে শুনে তোমার লাভ নেই।'

শাদা পোশাক এবার সিধে চলল মদের দোকান—রাখাল সাহার বাড়ি। ওই মোক্ষম জায়গায় না গেলে এসব লোকের আসল পরিচয় পাওয়াই যায় না।

সেখানে গিয়ে সে সোজা জিজ্ঞেস করলে, 'মদের জন্যে বিলাসের কাছে আপনার কত টাকা পাওনা?'

'পাওনা?' রাখাল সাহা যেন আকাশ থেকে পড়লে। বললে, 'একটা পয়সাও না।'

'তা হলে সব মেটানো আছে?'

'বলেন কি! উনি আবার মদ খেলেন কবে?'

'মানে ওকে আপনি মদ বেচেন নি?'

রাখাল একটু ঘাবড়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা করে বললে, 'বেচিনি—একবার একটা পোর্ট দিয়েছিলাম ওঁর স্ত্রীর ছেলে হওয়ার পরে। সে তো উনি খাননি।' বলে রাখাল চেয়ে রইল এই অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির দিকে—কে জানে, এ লাইনের কোনো অনুসন্ধান চলছে কিনা। পরের আবার একটা প্রশ্নে সে আরও অবাক হয়ে গেল।

'আপনার সঙ্গে তো ওর খুব দহরম-মহরম—আপনার ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত খুব যাওয়া আসা করে।'

'তা করে।' রাখাল এবার গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার মেয়েকে উনি পড়ান।'

'টাকা-পয়সা নেন, না ওই বিনি পয়সায়, মাঝে মাঝে এক-আধটা পোর্ট ঠেকিয়ে দেন?'

রাখাল দৃঢ় গলায় বললে, 'উনি টাকা নেন—পোর্ট দিই না।'

'আচ্ছা, প্রভাবতী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক?'

রাখাল গম্ভীর হয়ে বললে, 'প্রভাবতী আমার বৌদি হন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা মোকদ্দমা হতে যাচ্ছিল—সে নিয়ে পাড়ায় দলাদলির অন্ত ছিল না। উনি ছিলেন অবিশ্যি বৌদির পক্ষে। শেষ পর্যন্ত উনি মাঝখানে এসে সেটা মিটিয়ে দেন। বলা যায়—তাতে আমরা দু' পক্ষই বেঁচে যাই।'

'আচ্ছা।' শাদা পোশাক উঠে দাঁড়াল।

'আপনার নাম ?'

'পরেই জানবেন।'

রাখাল সাহাকে অবাক করে দিয়ে শাদা পোশাক যেমন আচমকা এসেছিল—তেমনি আচমকা চলে গেল। আর যেতে যেতে ভাবতে লাগল : ক্রিমিনোলজির বাঁধা ছকে একটা কালতু লোক কিছুতেই আঁটল না ! একই সঙ্গে সে যেমন গোঁয়ার—তেমনি ঠাণ্ডা, জীবন সংগ্রামে যেমন কৌশলী—তেমনি উদার, যেমন স্বার্থপর—তেমনি পরার্থপর। কাম আছে, প্রেম আছে, অহংকার আছে, বিনয় আছে। দলাদলি করে—অথচ কোন দলেই তার নামের পাত্তা পাওয়া যায়নি। এ অসম্ভব !

লোকটি প্রায় চটেই হাঁটার বেগ বাড়িয়ে দিলে। রাত তখন বেশ হয়েছে। মগজ তোলপাড় করে ভাবতে লাগল : কী রিপোর্ট দেবে হেড কোয়ার্টারে !

রাত আরও গভীর হলো। শহরতলীর পল্লী নিঝুম। শুধু একটা বাড়িতে দুটো বর্ষীয়সী নারী রাত জেগে উৎকর্ণ হয়ে রইল—কখন বাইরে কড়া নড়ে ওঠে। কিন্তু নড়ল না—এ এলাকার আর সকলের সঙ্গে সেটাও যেন ঘুমিয়ে গেছে।

চেয়ারম্যান ব্রজ আচাযি্যর আড্ডায় খবরটা এসেছিল রাত্তিরেই—কলকাতা ফেরৎ কেরাণীদের মুখে। মেয়েদের মস্ত নাকি এক মিছিল বেরিয়েছিল। তাতে কেউ আশ্চর্য হয়নি। কারণ মিছিল তো আজকাল লেগেই আছে। ভাত নেই, কাপড় নেই, চাকরি নেই—আশাও নেই। তাই মিছিলেরও অন্ত নেই। এখন না হয় অসূর্যম্পশ্যার দেশে মেয়েরাও বেরিয়ে পড়েছে! আর পুলিসের ব্যাপারেও আশ্চর্যের কিছু নেই—কারণ সামলাতে না পারলে তারাও চালিয়ে দেয় গুলী। আশ্চর্য শুধু একটা মানুষের মৃত্যু। কে একটা ক্ষ্যাপা লোক ছুটে গিয়েছিল গুলীর মুখে।

ব্রজ আচাযি্য জিজ্ঞেস করেছিল, 'মরে গেছে ?'

'প্রায়। হাসপাতালে তো নিয়ে গেল। উনি ছুটে গিয়ে মেয়েদের সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাত মেলে গুলী আগলাতে গেছেন। ক্ষ্যাপা—একদম ক্ষ্যাপা !'

'মিছিলের চাঁই-টাই বুঝি ?'

'না স্যার, সামান্য লোক—আমাদেরি মত কেরাণী। বাড়ি ফিরছিল।'

'নাম-টাম কিছু শুনলে ?'

'বিলাস না কি বললে কারা।'

বিলাসই বটে। অফিস থেকে বাড়িই ফিরে আসছিল বিলাস—মাঝপথ থেকে আর বাড়ি ফেরা হয়নি রাতে। পরদিন বাড়ি এল ফুলে সাজানো খাটিয়ায়। সকালে। ইতিমধ্যে সহরময় রটে গেছে তার মৃত্যুর বিবরণ। অজানা অচেনা নিরীহ লোকটা সহসা হয়ে উঠল শহরের স্মরণীয়।

পাড়ায় হুলুস্থুল। মেয়েরা ছুটে এসে দাঁড়াল রাস্তায়—কাঁধ দিতে এগিয়ে এল নানা দল—অনেক যুবক। এল অনেক ফুল। মরা সেঁতানো পাড়াটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল সহসা। গড়ে উঠল এখানে আরও একটা মিছিল। মিছিলের আগে শবাধার। দেবতা নয়, রাজা নয়, উজির নয়—নগণ্য একটা মানুষ, মুহূর্তের এক অসামান্যতায় জীবনের এবং মৃত্যুরও, সমস্ত সামান্যতাকে অতিক্রম করে গেল। দেখতে দেখতে মানুষের চলার পথের ধারে গড়ে উঠলো তার বেদী। সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে কে একটি মেয়ে এসে বেদীর ওপরে জ্বালিয়ে দিয়ে গেল একটা প্রদীপ।

চিরবাঞ্ছিত

এ হলো পুরানো মানুষের পুরানো গল্প। সে অনেক দিন আগের কথা।

শহর মফস্বল। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ডাক্তার গগন দত্ত তার এক নাতির জন্মোৎসবে বিরাট ভোজের আয়োজন করেছে। শহরের মাননীয় আর গণনীয় কেউ বাদ পড়েনি আমন্ত্রণ থেকে। কলমুখর মেয়ে মহল আর সঙ্গে ল্যাপটানো এণ্ডি-গেণ্ডিতে সারা বাড়ী থৈ থৈ। তার তোড়ের মুখ থেকে ভেসে এসে গগন দত্ত ঠেকেছে গিয়ে বাড়ির সামনের লনের এক কোণে। সঙ্গে তার বুড়ো আধবুড়ো বন্ধুরা। ব্যবসায়ী, উকিল, সহব্যবসায়ী চিকিৎসক, অধ্যাপক। গগন দত্ত নিজে সার্থকনামা ডাক্তার—তার আড্ডায় তাই সব শ্রেণীর মানুষের ভীড়। তারা সবাই পোড় খাওয়া—ঝড় খাওয়া। অনেক ঠেকেছে—অনেক দেখেছে। এক কথায় যাদের বলা হয় পাকা মুরুব্বি-মাতব্বর ব্যক্তি।

উৎসবের জোয়ার তখনো লাগেনি। আমন্ত্রিতরা একে একে আসছে। বিকেল গড়িয়ে সবে তখন সন্ধ্যে।

আমন্ত্রিত বন্ধু মহলে চলছে তখন গগন দত্তের নির্ভেজাল স্তুতি:

'সুখ শান্তির মূর্ত প্রতীক যদি কেউ থাকে তো সে হলো গগন দত্ত।'

কথাটা নীরবে যেন ঠেলে ফেলে দিয়ে গগন দত্ত মৃদু হাসতে হাসতে নেতিবাচক মাথা নাড়তে লাগলো। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা ঠিক নয়—ঠিক নয়—ঠিক নয়।

তখন কথা ওঠে পুরুষার্থ নিয়ে: 'অর্থ সম্মান পসার প্রতিপত্তি—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। বাস্ আর চাই কী? বুড়ো বয়সে এখন শেষ মোক্ষটির যা অপেক্ষা।'

গগন দত্ত পাকা চুল ভরা মাথাটা তবু নেতি-মুদ্রায় নাড়তে লাগলো।

জবরদস্ত পাবলিক প্রসিকিউটার নিবারণ চক্রবর্তী নড়ে চড়ে বসে তর্জনী তুলে প্রায় সওয়াল আরম্ভ করলে, 'বেশ—এক এক করে জবাব দাও।'

দর্শনের অধ্যাপক মথুর সেন বললে, 'ঠিক—সেইটেই লজিক।'

নিবারণ চক্রবর্তী বললে, 'আগে বলো, অর্থ তুমি পেয়েছ কি না? এবং প্রচুর পেয়েছ কি না?'

গগন দত্ত সবটা থামিয়ে দিয়ে বললে, 'আরে থাম থাম। বুঝেছি তোমাদের লজিক আর সওয়াল। দেখ, বৃত্তির তাড়ায় অনেক পরিবারে আমার আনাগোনা, অনেক রকমের মানুষ দেখেছি আমি। তাদের অনেক আধি-ব্যাধি, অভাব-

অনটন শোক-সন্তাপ দেখেছি ভাই। বছরের পর বছর অনেক দেখে দেখে মোদ্দা কথা এই প্রশ্নটাই মনে হয়েছে বার বার—মানুষ ঠিক চায় কী? জান?'

সকলের মধ্যে প্রশ্নটা ফেলে দিয়ে গগন দত্ত যেন জবাবের আশায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইলো। কিন্তু নীরব সবাই। কেবল পাবলিক প্রসিকিউটার নিবারণ চক্রবর্তী দমবার পাত্র নয়। সওয়ালের ভঙ্গীতে ফের বললে, 'তুমিই বলো।'

'শান্তি।' গগন দত্ত মাথা নেড়ে বললে, 'অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে ওইটিই সে চেয়েছে—কখনও ভুল পথে, কখনও ঠিক পথে। অর্থ কি তোমার সেই শান্তি দিতে পারে?'

কলরব উঠলো। কেউ বললে—পারে। কেউ বললে—পারে না। কেউ বললে, অর্থেই সব—সুখ বলো আর শান্তি বলো। দর্শনের অধ্যাপক মথুর সেন বললে, 'অর্থম্ অনর্থম্।' নানা জনের নানা কথা এসে পড়ে, নানা দৃষ্টান্ত—নানা গল্প।

শহরের বিখ্যাত জহুরী শংকরীপ্রসাদ বললে, 'আপনাদের কথা শুনে শুনে আমার একটি বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। বাঙলা দেশের ক'টি বিখ্যাত অর্থবান বংশের মধ্যে তিনি ছিলেন একটি।'

বড ঘরের প্রসঙ্গে কেচ্ছা শোনবার জন্যে আমিষপ্রিয় বেরালের মতো সবাই উৎসুক হয়ে তাকালো শংকরীপ্রসাদের দিকে। মস্ত ব্যবসায়ী সে—শহর কলকাতা পর্যন্ত তার কারবার। বাঙলা দেশের বড় বড় ঘর তার বাঁধা খদ্দের। তাই বড ঘরের বহু কেচ্ছা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা থাকা স্বাভাবিক।

শংকরীপ্রসাদ বললে, 'বন্ধুর নামটা আমার গোপনই থাক। তাকে চৌধুরী বলে ডাকতুম—সেই নামই এখন থাক।' বলে সে গল্প সুরু করলে।

... সে আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। চৌধুরী ছিল শংকরী-প্রসাদের সহপাঠী ও ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। বন্ধুত্বটা টিকে ছিল বহুদিন, তবে সহপাঠ খুব বেশীদূর এগোয়নি। সরস্বতীর সেবা কিছুটা করার পর শংকরীপ্রসাদ পৈতৃক ব্যবসায়ে এসে লেগে গেল লক্ষ্মীর আরাধনায় এবং চৌধুরী কলেজে গিয়ে ঢুকলেও বিদ্যার চেয়ে জমিদারবংশসুলভ অবিদ্যাগুলোর দিকেই ক্রমে ক্রমে তার আকর্ষণ বাড়তে লাগলো। কলেজ থেকে বেরোবার আগেই তার বাবার অকাল মৃত্যুতে ডাক পড়লো জমিদারীর শূন্য সিংহাসনে। পড়ার পাঠ চুকিয়ে চৌধুরীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কলকাতা ছেড়ে কিছু দিনের জন্যে চলে গেল সে জমিদারীতে।

বছর দুই তার আর কোনো খবর নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে কলকাতার

দোকানে এসে হাজির—শংকরীপ্রসাদ তখন বাপের জায়গায় এসে বসেছে। বন্ধু সমাগমের যে আবেগ উচ্ছ্বাস—তা শংকরীপ্রসাদের দিক থেকে অল্প ছিল না কিন্তু চৌধুরীর মেজাজ অন্য রকম। তার চোখ মুখ একটা চাপা উত্তেজনায় অস্বাভাবিক। বললে, 'তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে। গোপনীয়।'

একটু বিস্মিত হয়েই শংকরীপ্রসাদ তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

চৌধুরী বললে, 'শিবসাগরের ছোট তরফ তোমাদের দোকানে একটা পুরনো নেকলেস ভেঙে গড়তে দিয়েছে?'

'তা দিয়েছে।'

'তাতে একটা রক্তমুখী নীলা আছে?'

'তা আছে।'

'ওই নীলাটা তোমাকে বদলাতে হবে। ওকে আসল দাও, নকল দাও—যা পারো করো, কিন্তু ওর ওই নীলাটা আমার চাই এবং আমাকে ঠিক ওই রকম একটা নেকলেস করে দিতে হবে।'

বলে কী লোকটা! শংকরীপ্রসাদ জানে—ওদের দুই তরফের বংশানুক্রমিক রেশারেশি—কিন্তু তার জন্যে চুরি! তার পৈতৃক ব্যবসার সুনাম নষ্ট! সবটাকে হালকা করার জন্যে শংকরীপ্রসাদ বললে, 'যতদূর জানি তোমার রাজলক্ষ্মীটি তো এখনও শুভাগমন করেননি। আগে আসুন—তখন না হয় সৌভাগ্যের নীলা দিয়ে তাঁকে সোনার নেকলেসে বাঁধবে। সে নীলা তখন আমি পৃথিবী চুঁড়ে এনে দেবো বন্ধু, ভয় কী!'

'উহুঁ, সেটা তুমি খুঁজে-পেতে ছোট তরফকেই দাও। আপাতত এই নীলাটা আমাকে দিতেই হবে।'

চৌধুরীর জেদটা বুঝলো বটে শংকরীপ্রসাদ কিন্তু তার প্রস্তাবে সম্মত হতে পারলো না। অপ্রকৃতিস্থ চৌধুরী প্রায় রাগ করেই চলে গেল।

পরে নানান সূত্রে খবর পেতে লাগলো শংকরীপ্রসাদ—মোসাহেব পরিবৃত চৌধুরীর জমিদারীর হালচাল। রক্তমুখী নীলার দুরধিগম্য সৌভাগ্য ও শত্রু-নিধনের শক্তি আয়ত্ত করতে না পারলেও ছোট তরফের সঙ্গে তার বড় রকমের পাল্লার দৌড়ে কমতি ছিল না কোথাও। মোসাহেবেরা এসে খবর দিলে—'ছোট তরফ ঘুড়ি ওড়ানোতে হাজার টাকা খরচ করবে।' সঙ্গে সঙ্গে বড় তরফ থেকে চেক্ কেটে দিলে দশ হাজার। এমনি খবর চালাচালিতে বড় তরফের একমাত্র বংশধরটি টাকার জোরে চারদিকে নিন্দা ও প্রশংসার বান ডাকিয়ে দিলে।

শংকরীপ্রসাদ ভেবেছিল, চৌধুরী জীবনে আর তার দোকান মুখো হবে না

কোনোদিন—জেদ ও রোকের মানুষ সে চিরকাল। পুরানো খদ্দের বলো আর বন্ধুত্ব বলো, দুটোই খতম হয়ে গেল। দীর্ঘদিন আর দেখাসাক্ষাৎ নেই—যদিও শংকরীপ্রসাদ খবর পেতে লাগলো যে সে আজকাল ইয়ারদোস্ত নিয়ে কলকাতাতেই আছে। এবং শুধু তাই নয়, ছোট তরফের সঙ্গে কি একটা সূক্ষ্ম মামলাও ফেঁদে বসে আছে। তার সাক্ষী উকিল এ্যাটর্ণী কৌশলীর দুরন্ত বাহিনী নিয়ে চার পাঁচ বছরের তীব্র যুদ্ধ ও রণহুংকার। ছোট কোর্ট বড় কোর্ট হাইকোর্ট—মায় প্রিভিকাউন্সিল।

হঠাৎ আবার একদিন চৌধুরী শংকরীপ্রসাদের দোকানে এসে হাজির। সেবারও তার সেই আবেগশূন্য অবিচলিত ভাব—আছে আবার সেই কথার গোপনীয়তা। এবার সঙ্গে এনেছে ছোট সুটকেশ ভরে এক গাদা গয়না—পিতৃ-পিতামহের কালের। যার হীরা মুক্তো খচিত অপরূপ কাজের সঙ্গে জড়ানো আছে শংকরীপ্রসাদের পিতৃ-পিতামহের সুনাম ও নৈপুণ্য। সে গৌরব চুলোয় গেছে—এখন চৌধুরীর টাকা চাই।

গয়নার গাদা এক পাশে সরিয়ে রেখে শংকরীপ্রসাদ বললে, 'এ সব গয়নাও শেষকালে নষ্ট করবে?'

'নষ্ট কেন? আমি তো বেচছি না—বাঁধা রাখছি।' চৌধুরী বললে, 'আসছে শনিবার ঘোড়দৌড়—এবার যা জবর টিপ্‌স পেয়েছি তাতে যা ফেলবো তার তিন গুণ ফিরে আসবে নির্ঘাৎ। তার থেকেই সব হয়ে যাবে—প্রিভিকাউন্সিলে একটা ব্যারিস্টার পাঠাতে কটা টাকাই বা আর যাবে?'

চৌধুরীর হিসাব অত্যন্ত সোজা এবং আশা উত্তুঙ্গ। অর্থ ও কামনার নতুন এক কুরুক্ষেত্র রচনা করে সে বসে আছে।

শংকরীপ্রসাদ বললে, 'বন্ধু ভাবে একটা কথা তোমাকে বল্‌তে পারি?'

'বলো।'

'ঘোড় দৌড়ে জিতবে কি-না জানিনে কিন্তু মামলায় জিতলে পাবে কী?'

চৌধুরী মাথা ঝাঁকি দিয়ে চটপট উত্তর দিলে, 'কিছু না—কিছু না, বিষয় খুবই সামান্য। বড় কথা—আমার সম্মান। ও আমি ছোট তরফের ঘাড়ে ধরে আদায় করবো, তবে ছাড়বো। যাই হোক, হাজার পঁচিশেক টাকা আমার কাল সন্ধ্যের মধ্যে চাই-ই চাই।'

শংকরীপ্রসাদ বললে, 'তোমার বিষয়ের অভাব নেই—চিরকাল তোমরাই বড় তরফ। তার ওপর তুমি একমাত্র বংশধর। কেন এই ছোট্ট একটা উত্তরাধিকার নিয়ে এমন কাণ্ড করছো? ও সব বাদ দাও—বিয়ে-থা করো এবার।'

জমিদারী গোঁ আর মেজাজে চৌধুরী চিরকাল রাজচক্রবর্তী। বললে, 'ও সব তুমি বুঝবে না—আধিপত্য কী, সম্মান কী! পয়সা আমাদের দুজনেরই আছে ঠিক কিন্তু তুমি পয়সা গুণে গুণে ঘরে তোলো আর আমি সেটা না গুণে খরচ করি। তফাৎ অনেক। যাক, টাকাটা আমার কাল সকালে চাই-ই চাই। এই রইলো ঠিকানা।'

রাগ হলো, অপমানিত বোধ করলে শংকরীপ্রসাদ। বন্ধুত্বের মান যখন থাকলই না তখন জাত্ জহুরীই হবে এবার থেকে। চুলোয় যাক চৌধুরীর ভালো মন্দ। গয়নাগুলো তার হীরে জহরৎ নিয়ে প্রায় লক্ষ টাকার মতো। পঞ্চাশ হাজার টাকায় সেটা কেনার আক্রোশে শংকরীপ্রসাদ পরের দিন সন্ধ্যে বেলা গিয়ে হাজির হলো চৌধুরীর ঠিকানায়।

কিন্তু ঢুকেই জায়গাটা সুবিধে মনে হল না। এতদিন শংকরীপ্রসাদ চৌধুরীর জমিদার সুলভ রোক ও খরচের কথাই শুনেছিল—আনুষঙ্গিক অন্যগুলো শোনেনি। আজ দারোয়ান বাহিত হয়ে একটা ঘরে ঢুকে তার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়ে গেল। কোনো কিছুর অভাব নেই—পঞ্চ ম-কারের চূড়ান্ত আয়োজন। ইয়ার দোস্ত অনেকগুলি—বাঈজী অবিশ্যি একটি এবং চৌধুরী একাই একশ'। মদের বোতলগুলো যেন আহ্লাদে গড়াগড়ি যাচ্ছে চৌধুরীর ইয়ার দোস্তের সঙ্গে সঙ্গে। তারই মধ্যে কথা শেষ করতে হলো শংকরীপ্রসাদকে—পরম আক্রোশে সে গয়না বাঁধা নয়, একেবারে বেচার প্রস্তাব পেশ করে দিলে।

চৌধুরী তখন রঙের তুঙ্গে—তার কাছে পঁচিশ কী, পঞ্চাশ কী! অর্থ ও কামনার টলমলো সমুদ্রে বাঈজীকে সঙ্গিনী করে তখন সে বাদাম তুলে দিয়েছে। বরং পঁচিশের জায়গায় পঞ্চাশ হাজার পেয়ে মত্ত হাতে টান মারলে বাঈজীর ঘাঘরা ধরে। বললে, 'ও সব ঝুটা চিজ খুলে ফেল পিয়ারী। দর্জি ডাকো—কারেন্সি নোটের পিরান পাজামা বানিয়ে দেবো। চলো জমিদারীতে।'

লজ্জা নিবারণের কোনো ঔৎসুক্য নেই কারুর, অগত্যা শংকরীপ্রসাদ নিজেই লজ্জা বাঁচানোর জন্যে দ্রুত কাজ সেরে বেরিয়ে এলো চটপট। শংকরীপ্রসাদের সঙ্গে তখনকার মত চৌধুরীর সেই শেষ দেখা।...

গল্প থামিয়ে শংকরীপ্রসাদ মনে মনে যেন একটু বিচলিত হয়ে চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ।

গগন দত্ত শুধোলে, 'তারপর?'

শংকরীপ্রসাদ বললে, 'তার মামলা, ঘোড়-দৌড় আর বাঈজী—এ তিনের ঝড়ে ফতুর হয়ে গেল সে কয়েক বছরের মধ্যে। শেষ খবর পেলাম—একেবারে ফকীর।

সব আশ্রয় গেছে—শেষে সেই বাঈজীটিরই অন্নদাস। বড় দুঃখ হলো। নিজেকে কিছুটা অপরাধীও মনে হলো। তার সেই পিতৃপিতামহের কালের গয়নাগুলো বাবদ লাভ ছিল আমার অনেক। তাকে কিছু সাহায্য করবো—এই মতলব করে ওকে ফিরিয়ে আনতে গেলাম অনেক খুঁজে খুঁজে। ও তখন কাশীতে। কিন্তু গিয়ে দেখি—কোথায় কী! সে নেই।'

অসহিষ্ণু পাবলিক প্রসিকিউটার বলে উঠল, 'মারা গেছে!'

শংকরীপ্রসাদ বললে, 'তা হলেও ভালো ছিল। গিয়ে শুনলাম, তার বিরুদ্ধে খুনের চার্জ! সে নাকি তার সাধের বাঈজীর কোন বাঁদীকে শেষ পর্যন্ত খুন করে তার গয়নাগাঁঠি নিয়ে পালিয়েছে। পুলিস আমার পেছনে লাগায় সেখান থেকে পালিয়ে এলাম তাড়াতাড়ি। পরে শুনেছিলাম—খুন ঠিক নয়, চৌধুরীকে তাড়াবার জন্যে বাঈজীর ওটা নাকি ছিল একটা চাল।'

'তারপর?'

'ওই শেষ খবর—জানিনে সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে। আপনাদের কথা শুনে তার কথা মনে পড়লো আজ। বিষয়-সম্পদ অর্থ তার প্রচুরই ছিল—কিন্তু শান্তি?'

দর্শনের অধ্যাপক গীতার কি একটা শ্লোক আউড়ে বললে, 'বিষয় সম্ভোগ থেকে কাম, তা থেকে ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিবিভ্রম, বুদ্ধিনাশ, শেষ—মৃত্যু।'

মথুর সেনের গীতার শ্লোকে কথার মোড় ঘুরে যায় ধর্মের দিকে। বুড়ো সবাই—একবাক্যে সকলেই প্রায় বলে উঠে, 'ওই শান্তি—ওই ধর্মই একমাত্র অবলম্বন।'

ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার সর্বানন্দ রায় বিলেত ঘোরা মানুষ, যুক্তি ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে আধুনিক। স্বদেশ বিদেশে ধর্ম ও তার উন্মত্ত পরিণতির হালফিল ঘটনা ও দুর্ঘটনার কিছু কিছু খবর জানার অভিমান আছে তার। তারই জোরে কথাটার সে প্রতিবাদ করে বসলো। বললে, 'ও দেশেও তো দেখে এসেছি ও বস্তুটি কত মারাত্মক। আমাদের দেশে তো কথাই নেই।'

বুড়োরা কেউ শিউরে উঠলো, কেউ ঠোঁট বেঁকিয়ে কটাক্ষ করলে—এই বিলেত ফেরৎ দো-আঁসলা লোকটা বলে কী!

সর্বানন্দ বললে, 'তখন বিলেত থেকে সবে ফিরে এসেছি। নতুন চাকরি, হেড কোয়ার্টার আমার এক রেলওয়ে টাউনে। সে-ও আজ প্রায় বছর তিরিশ আগের কথা। ভারি নীরব এক ধর্মসেবকের সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ঘটেছিল।'

সর্বানন্দের গল্প শোনার জন্যে মাত্র কয়েকজনই উৎসুক—অধিকাংশই কিন্তু

উসখুশ। ধর্মদ্বেষী নাস্তিকের কথা কোথায় শেষ হবে কে জানে? তারই মধ্যে সর্বানন্দ গল্প সুরু করে দিলে।

…সেই ধর্ম-সেবকটির নাম সর্বানন্দ জানে না। পাড়ার কেউই বোধ করি জানতো না। রেলওয়ে টাউন—আশে পাশে কিছু কারখানা। অধিকাংশই কুলি-কামিন, কিছু নিম্নবিত্ত কেরাণী কর্মচারী মহলের বাস। সবাই তাঁকে ডাকতো ঠাকুরমশাই বলে।

দিনের বেলায় তাঁকে রাস্তায় কখনো দেখা যেত না। সন্ধ্যের পরে গঙ্গার ধারের দিকে একটু বেড়াতে বেরোতেন। বেড়ানো তো নয়, আদাড় বাদাড় ভেঙে হন্ হন্ করে ছোটা। ধর্মভীরু কুলিকামিনের দল তটস্থ হয়ে উঠতো—পাছে কোন দিন ঠাকুরমশাইকে সাপে খায়। কেউ কেউ ছুটতো পিছু পিছু।

আর সারাটা দিন কাটতো তাঁর পুঁথিপত্তর নিয়ে। দূর থেকে নিত্য শোনা যেত সুর করে ভাগবত বা গীতা পাঠ। যেমন চেহারা—তেমনি ব্যবহারে একটি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক ভাব।

এই পর্যন্ত শুনেই শ্রোতাদের মধ্যে থেকে পাবলিক প্রসিকিউটার নিবারণ চক্রবর্তী যেন ধরে ফেললে ব্যাপারটা। বললে, 'বোঝা গেছে। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো—ঠাকুর মশাই একটি ভণ্ড এবং লম্পট।'

সর্বানন্দ টিপ্‌পনি কেটে বললে, 'যতো চোর ছ্যাঁচড় আর বদমাসদের মামলা করে করে আপনার দৃষ্টিশক্তি বিকৃত হয়ে গেছে মশায়। অতি বড় শত্রুও ঠাকুর মশায়ের ওই দোষটি দেখতে পায়নি। ধর্মের ঠাট দেখিয়ে শিষ্য সংগ্রহের আগ্রহ মাত্রও তাঁর মধ্যে কোনোদিন দেখিনি। ভদ্রলোকের পাড়ায় তিনি আসতেনও না। থাকতেন কুলি ধাওড়ার পাশ ঘেঁষে। শুনেছিলাম—গুরু তাঁর কাশীবাসী কোন এক মস্ত সাধু।'

সর্বানন্দ গল্প বলে চললো আবার।…

লোকালয় সাধুসন্থ পেলে সহজে ছাড়ে না। তাঁকেও ছাড়েনি। তুক্‌তাকের আশায় অনেকেই গেছে বটে কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরেছে। তবে গীতা পাঠ বা ভাগবত পাঠের ব্যাপারে কোন কোন নাছোড়বান্দা ভদ্রলোকের বাড়িতে কয়েকবার তিনি এসেছেন কিন্তু একটি পয়সাও কখনো ছোঁননি। তাঁর দয়া প্রেম ক্ষেম ও অহিংসার ব্যাখ্যা শুনে শুনে সর্বানন্দের বড় রাগ হতো—কারণ তাতে সর্বানন্দের নিজেকে পশু বা দানব ছাড়া আর কিছু মনে হতো না। অতি ধীরে ধীরে এই অজ্ঞাতনামা নীরব ধর্মসাধকটির মস্ত একটি অনুরাগীমণ্ডলী তৈরী হয়ে গেল—সে কুলি ধাওড়া থেকে ভদ্রবাড়ির গভীর অন্দর মহল পর্যন্ত। বয়স তখন তাঁর বড় জোর ত্রিশ হবে।

এমন সময় লেগে গেল প্রথম হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। স্বজাতি ও স্বধর্মের প্রীতি বশেই কিছু কিছু ভদ্র যুবকও তাঁর ধর্ম ব্যাখ্যার সভায় জুটতে লাগলো।

এদিকে দাঙ্গার ধাক্কায় ক্ষুদে শহর তখন টলমল। হিন্দু-মুসলমান কুলিকামিন ক্ষেপে উঠলে আর রক্ষে নেই। ভদ্রলোকেরা তটস্থ। এর মধ্যে একদিন দেখা গেল—ঠাকুর মশাই রেল লাইনের আশে পাশে ভোজপুরী আর বিলাসপুরী কুলি লাইনে লাইনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার মোদ্দা কথাটা হলো—ধর্ম গেল, জাত গেল—অতএব বিধর্মীকে নিশ্চিহ্ন করো। রক্তগরম ভদ্র যুবকরাও গীতার ধর্মে সদ্য জাগ্রত হয়ে আখড়া গড়ে লাঠি তরোয়াল ভাঁজা সুরু করে দিলে।

সর্বানন্দ একদিন ছুটে গেল তাঁর কাছে। বললে, 'করছেন কী, কুলি ধাওড়ার ক্ষুদে শহরটা যে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে! মজুরের এলাকা—দেখছেন না, হিন্দু মুসলমান মেশামেশি হয়ে আছে।'

ঠাকুর মশাইয়ের এতদিনকার নিস্পৃহ নির্বিকার চোখ দুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠলো। 'যদা যদা হি ধর্মস্য' বলে তিনি গীতার কি একটা শ্লোক দৃপ্ত কণ্ঠে শুনিয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনি এসব বুঝবেন না—সরে যান। বিলেতে জাতধর্ম সব খুইয়ে এসেছেন।'

শহরে তবু দাঙ্গা বাধে না। এদিকে সারা সন্ধ্যে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে ঠাকুর মশাইয়ের বক্তৃতাও থামে না। এই সংসার-বিচ্ছিন্ন—পরিবার-বিচ্ছিন্ন ধর্মসর্বস্ব লোকটা যেন ক্ষেপে গেল। এদিকে ঘর-সংসার ছেলেপুলে নিয়ে ভয়ে আঁৎকে মরে সর্বানন্দের মতো গেরস্থ মানুষরা—কোন দিন বুঝি বা আগুন লাগে।

এমন দিনে এক কাণ্ড ঘটে গেল। আত্মীয় স্বজনের গলগ্রহ এক বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা তাঁর বয়স্কা একমাত্র মেয়েকে নিয়ে ঠাকুর মশায়ের কাছে গিয়ে হাজির। মেয়ের কপাল নিয়ে তিনি বড়ই চিন্তিত। মাস দুই হলো কোন এক বরপক্ষ না-কি দেখে গেছে কিন্তু তারপর তাদের আর কোন খবর নেই। মেয়ের ভাগ্য যাতে সুপ্রসন্ন হয় ঠাকুর মশাইকে তার একটা বিহিত করে দিতেই হবে।

এতদিন ঠাকুর মশাই তুক্‌তাকে কোনো আমল দেননি। কিন্তু সেদিন বললেন, 'হবে—তিনদিনের মধ্যে বরপক্ষ সেধে আসবে। তবে একটি কাজ করতে হবে বাছা। সন্ধ্যে বেলায় গঙ্গাস্নান করে সেই ভিজে কাপড়ে সাতটি বেলপাতায় বুড়ো-শিবের পুজো করতে হবে।'

মেয়ের মা আঁৎকে উঠে বললে, 'পথে যে মোছলমানের পাড়া—ভর-সন্ধ্যায় সোমত্ত মেয়ে নিয়ে যাবো কেমন করে ঠাকুর! সময়টা যে বড় খারাপ।'

ঠাকুর মশাই বললেন, 'স্বয়ং মহেশ্বর সহায়—সাধ্য কি কেউ গায়ে হাত দেয়।'

কি জানি, মেয়ের মায়ের দুশ্চিন্তা বোধ করি দাঙ্গার চেয়েও বড়। সেদিন সন্ধ্যের পরে অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে মেয়ে বিরাজবালাকে নিয়ে মা রওনা হলো গঙ্গার ঘাটের দিকে। কিন্তু মুসলমান পাড়া পার হয়ে কিছুটা যেতে না যেতেই কোথা থেকে এসে পড়লো যেন বুনো একপাল ভঁইস। মেয়েটাকে যেন শিঙে লুকে নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সকালে সারা রাতের ধর্ষিতা মেয়েটার পাথর মূর্তি সঙ্গে করে মেয়ের মা কেঁদে গিয়ে পড়লো ঠাকুর মশায়ের পায়ে। বললে, 'রক্ষে করো ঠাকুর—এ মেয়েকে এখন রাখি কোথায় বলো। আত্মীয়-বন্ধু কেউ আশ্রয় দিতে চায় না—বলে, জাত যাবে।'

'জাত যাবে!' ঠাকুর মশায় সেদিন দিনের বেলাতেই বেরিয়ে এলেন বক্তৃতা দিতে গেরস্থ পাড়ায়—বামুন শূদ্র কোনো পাড়া বাদ রইলো না। ঠাকুর মশাই ডাক দিলেন—'কে করবে এই বিধর্মী ধর্ষিতা মেয়েটার পাণিগ্রহণ—কে নেবে প্রতিশোধ।' কিন্তু ক্ষুদে রেলওয়ে টাউনের ক্ষুদে যুবকগুলোর মধ্যে সিভ্যালরীর বোধ করি একান্ত অভাব ছিল—কারণ কেউই পাণিগ্রহণে এগিয়ে এলো না। তবে প্রতিশোধের জন্যে যুবক ও কুলিকামিনরা গর্জাতে লাগলো। দু-একটা খুনজখমও হয়ে গেল। পশ্চিমা হিন্দু-মুসলমানের বস্তিতে বড রকমের লড়াই একটা প্রায় লাগে লাগে। ওদিকে ঠাকুর মশাই সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে অপবিত্র বিরাজবালাকে কোথাও গছাতে না পেরে শেষ পযন্ত নিজের আশ্রয়েই ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁকে আর বের হতে দেখা গেল না—গুম্ হয়ে নিজের ঘরে বসে রইলেন। আর সামনে বসে বিরাজবালা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ওদিকে মেয়ের মা আবার কেঁদে ককিয়ে গাল পাড়তে পাড়তে একটা কথা ফাঁস করে দিলে। বললে, 'হাবামজাদা হিঁদু না মোছলমান—কে জানে গো! ধস্তাধস্তির সময় এক মুখপোড়ার নকল দাড়ি খসে পড়তে দেখলাম।'

পুলিস জোর তত্ত্বতালাস আরম্ভ করে দিলে। সরজমিন তদন্তে সত্যি সত্যি অকুস্থলে গিয়ে কতকগুলো নকল দাডির সন্ধান পাওয়া গেল। বিরাজবালাকে জেরা করে এইটুকু শুধু জানা গেল, গুণ্ডারা ছিল অবাঙালী পশ্চিমা। পুলিস কুখ্যাত ক'টাকে ধরে কষে ধোলাই সুরু করলে—তখন বেরিয়ে পড়লো এর-ওর নাম। ব্যাপারটা যখন ফাঁস হয় হয়—এমন সময় শোনা গেল, ঠাকুর মশাই হতভাগিনী বিরজাবালাকে নিয়ে কোথায় না কোথায় চলে গেছেন।

পরের দিন অপরাধীদের গোটা দলটা ধরা পড়ে গেল। তারা সাফ কবুল করলে—দোষ তাদের নয়, যত নাটের গুরু ঠাকুরমশাই। মুসলমান সাজতে তিনিই আদেশ দিয়েছিলেন—কর্মের নির্দেশও তাঁরই।…

সর্বানন্দ একটু দম নেবার জন্যে থামলো।

নিবারণ চক্রবর্তী বললে, 'তারপর ?'

সর্বানন্দ বললে, 'আর কি। সব রহস্য যখন ফাঁস হয়ে গেল তখন ওখানে রীতিমতো দাঙ্গা, খুনজখম। কেবল মেয়ের মা তারই মধ্যে গাল পেড়ে বেড়াতে লাগলো ঠাকুর মশাইকে লক্ষ্য করে, হারামজাদা বরের পিসি—কনের মাসি গো। আমার জাত ধর্ম সব গেল।'

'সেই ঠাকুর মশাই এবং মেয়েটি ?'—

'কিছুদিনের মধ্যেই ও জায়গা থেকে বদলি হয়ে গেলাম'—সর্বানন্দ বললে, 'আর খবর জানিনে। জানিনে ঠাকুর মশাই বা কোথায় আর বিরাজবালাই বা কোথায়।'

পাবলিক প্রসিকিউটার চক্রবর্তী মন্তব্য করলে, 'ক্রিমিন্যাল—১৪৭ ধারা'—

সর্বানন্দ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'ঠাকুর মশাইকে আর কোথাও আমি দোষ দিইনে—কারণ নিজের কৃতকর্মের বোঝাটা তিনি নিজেই সরিয়ে নিয়ে গেছেন। কিন্তু সেই নীরব ধর্মসাধকটির সরব ধর্মোন্মাদনা শেষপর্যন্ত তাঁকে কোথায় ঠেলে নিয়ে গেছে ! কারণ ওই ঘটনা নিয়ে নানা গুজব রটতে থাকে। তার ফলে ওই ক্ষুদে সহরটাতে প্রায় জনা পঞ্চাশের মতো হিন্দু-মুসলমান মারা যায়।'

গগন দত্তের আড্ডা থম্ থম্ করে—কেউ আর কোনো কথা বলে না। শুধু দর্শনের অধ্যাপক ইংরেজীতে কি একটা মন্তব্য ক'রে বললে, 'ঠিক, ও-পথ চিরকাল রক্তক্ষয় আর যুদ্ধের।'

গগন দত্ত বললে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, 'ওই অর্থ বলো, কাম বলো আর ধর্ম বলো—ওসব আমি কিছুই বুঝিনে। আমি জানি একটি দম্পতিকে আর তাদের পরিবারকে। এ আমার অত্যন্ত সাধারণ মানুষের অত্যন্ত সাধারণ কাহিনী কিন্তু কি অসাধারণ প্রেম আর শান্তি দেখেছি তাঁর ঘরে। তাঁদের সঙ্গে আজ আমার প্রায় বিশ পঁচিশ বছরের পরিচয়। কিন্তু—'

নিবারণ চক্রবর্তী বাধা দিয়ে বললে, 'কে সে !'

'বড় ছোট মানুষ—নিতান্ত ডাক্তার বলেই তাঁদের চেনবার সৌভাগ্য হয়েছে। তোমরা চিনবে না। একেবারে খেটে খাওয়া মানুষ—অর্থ ও কামনার বান ডাকাবার অবকাশ তাঁদের নেই। একটি ছেলে ও অন্ধ বৌ নিয়ে ঘর করে,

ধর্ম বলো আর জাতি-বিদ্বেষ বলো—কোনো কিছুর রণহুংকারে মাতবারও তাঁর আগ্রহ নেই।'

গগন দত্ত একটু থেমে বোধ করি গোটা ঘটনাটা একবার মনে করে নিলে। তারপর বললে, 'একদিন রুগী দেখে ফিরছি—সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। এমন সময় কেরাণীগঞ্জের এক জায়গায় দেখি কিছু লোকের ভীড়। একজনকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করতেই সে প্রায় ক্ষেপে উঠলো। বললে, দেখুন দেখি মশায় গেরস্ত পাড়ার মধ্যে কী কাণ্ড।'

বললুম, 'হয়েছে কী!'

ভদ্রলোক বললে, 'কে না কে, কা'কে জুটিয়ে এনে ঢুকেছে স্বামী-স্ত্রী বলে। এখন রোগ হতে সব বেরিয়ে পড়েছে। মাগীটা একবার বলে—কেউ না, একবার বলে অন্য রকম। এখন ফ্যাচ ফ্যাচ করে শুধু কাঁদছে।'

বললুম, 'রোগটা কি?'

রোগ সম্বন্ধে ভদ্রলোকের কোনো আগ্রহ দেখা গেল না। বললে, 'কে জানে মশায়। এখন ও পাপ দু'টোকে বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি।'

ঘরের ভেতরে ঢুকলাম—একটি যুবক জ্বরে বেহুঁশ, সর্বাঙ্গ যেন দলা দলা হয়ে ফুলে উঠেছে! দরোজায় কৌতূহলী ভীড়! বিছানার একপাশে বসে মেয়েটা কাঁদছে সত্যি। আর চারদিকে নানা জনের নানা মন্তব্য। কেউ বললে, 'প্রথমে ওদের ইস্‌টেশানের মুসাফিরখানায় দেখেছিলাম।' কেউ বললে, 'স্বামী-স্ত্রী তো আড়-আড়-ছাড়-ছাড় কেন।' এক বৃদ্ধা মন্তব্য করলে, 'সেই গোড়া থেকেই দেখছি তো—কেমন যেন একরকম।'

আমি ডাক্তার—তখনই মনে হলো, কার কি সম্পর্ক তা জেনে আমার লাভ কী! তাছাড়া বিপদে পড়ে বৌটার মাথাটাই যে খারাপ হয়ে যায়নি—তারই বা ঠিক কী। অথবা সম্পর্কের মধ্যে কোনো গলদ থাকতেও পারে। যাই হোক্‌, আমি রোগী দেখতে ঝুঁকে পড়লাম। দেখলাম, রোগ সাংঘাতিক। শহরে তখন বসন্ত দেখা দিয়েছে এবং এ হলো অতি সাংঘাতিক টাইপের বসন্ত—ভেতরটা পচিয়ে শেষ করে দেয়। মেয়েটাকে বললাম, 'আমি ডাক্তার। রোগীর বসন্ত হয়েছে—খুব খারাপ টাইপ। ওকে হাসপাতালে দিতে হবে।'

ডাক্তারের নাম শুনে মেয়েটা বোধ করি ভরসা পেল। এতক্ষণে তার কান্নার মধ্যেও ভালো করে একটু কথা বললে। বললে, 'দিন।'

আমি আশ্বাসভরা নরম গলায় বললাম, 'উনি তোমার কে!'

মেয়েটা আবার মাথা নুইয়ে কাঁদতে লাগলো। সম্পর্কসূত্র শূন্যে ঝুলতে লাগল।

এমন সময় আমার বেহুঁশ রোগী অতি কষ্টে যেন চোখ মেলে তাকালো। কে জানে, এই মেয়েটার সারাদিনের অপমান ও লাঞ্ছনা সে নিরুপায় নীরবতায় কতক্ষণ সহ্য করেছে। 'ডাক্তার' শব্দটা শুনে বোধ করি সে-ও প্রাণপণে রক্তবর্ণ চোখ দুটো একবার মেলে তাকালে। আমাকে দেখলে, তারপর মেয়েটার কান্নায় কাঁপা মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলো একটুক্ষণ। শেষে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে বললে, 'আমার স্ত্রী'—বলে গলা দেখালে। গলা তখন তার বসে এসেছে।

ওই প্রায় অন্তিম স্বীকারোক্তিটুকু শুনে মেয়েটি যেন চাঙ্গা হয়ে উঠলো, আমার ডাক্তারের চোখে তা সহজেই ধরা পড়ে গেল।

আমি উঠলাম হাসপাতালের ব্যবস্থা করবার জন্যে। দরজা পার হয়েছি—এমন সময় মেয়েটা ছুটে এসে ধপাস করে পড়লো আমার পায়ের কাছে। পাগলের মতো বললে, 'না ডাক্তারবাবু, হাসপাতালে না—হাসপাতালে না। ওখানে কেউ বাঁচে না।'

বললাম, 'এই কেস্—তুমি কি ঘরে রেখে বাঁচাতে পারবে?'

মেয়েটি বললে, 'আমার যে আর কেউ নেই।'···

'আচ্ছা—ঠিক আছে।'—বলে আপাতত বেরিয়ে এলাম। কৌতূহলী ভীড়ের কথা আর নাই বললাম। তাদের নির্লজ্জ আগ্রহ কেবল এই দম্পতির রহস্যাবৃত সম্পর্কটা জানবার জন্যে এবং তাড়াবার জন্যে।

বাড়ি ফিরে এসে মন পড়ে রইলো আমার ওইখানে। কেবলি মনে হতে লাগলো, ওই যুবকটি যদি ওই মেয়েটার কেউ না-ই হবে তবে এই সাংঘাতিক রোগ সে এড়ালে না কেন? জীবনে তার কেউ নেই বলে কী! কি জানি। কেমন মায়া পড়ে গেল। এবং ওকে বাঁচাবোই—রোক্ চেপে গেল। মেয়েটির অসাধ্য-সাধন সেবার কথা আর না-ই বললাম। সবটার মধ্যে দিয়ে সেদিন এইটেই বার বার মনে হয়েছিল—এত সেবা, এত যত্ন, এ'তে কেমন করে বলি, ও যুবক ওর কেউ না!

যাই হোক, যুবকটি তো সেরে উঠলো। এবার মেয়েটির পালা। শরীরে রোগের বিষ তার অনেক আগেই ঢুকেছিল—নতুন প্রতিষেধকে কোনো কাজই হোল না। যুবকটি সেরে উঠতেই ধরলো সেই সাংঘাতিক ব্যাধি।

আমি বললাম, 'আর নয়—এবার একে হাসপাতালে দিন।'

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন।

বললাম, 'আর দেরি করবেন না। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি।' এই

বলে বেরিয়ে এলাম। আসতে আসতে শুনতে পেলাম—মেয়েটি যেন ভয়ে ভয়ে অতি কষ্টে শুধালো, 'তুমি কি আমাকে হাসপাতালে দেবে ?'

ঘুরে দেখলাম, যুবকটি ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বলছেন, 'তুমি কি আমায় হাসপাতালে দিয়েছিলে ?'

জানিনে, কি পরম অবলম্বনে মেয়েটা তার স্বামীর হাতটা মুঠো করে ধ'রে যেন পরম নিশ্চিন্তে চোখ বুজলো।

চুলোয় যাক্ আবেগ—আমি ডাক্তার। কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি এনে হাজির করলাম। মেয়েটা ভাগ্যে তখন অচৈতন্য। যুবকটির নানা প্রতিবাদ সত্ত্বেও ওকে জোর করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। আর প্রতিদিন দেখতাম, যুবকটি হাসপাতালের দোরগোড়ায় প্রায় বসে বসে ধ্যান করছে। মনে মনে হেসে ভাবতুম—যৌবনের এ ধ্যানকেও লোকে সন্দেহ করে ? নিন্দে করে ?

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত রোগিনী আমার ফিরে এলো, কিন্তু দু'টি চোখ হারিয়ে। ফিরে এসে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে বললে, 'তোমার কাছে থাকলে চোখ দুটো আমার নষ্ট হতো না।'

স্বামী বললেন, 'ডাক্তারবাবুকে বলো—উনি যে তখন কিছুতেই ছাড়লেন না।'

স্ত্রী বললে, 'তুমি যেতে দিলে কেন।'

ওদের পুনর্জন্মের সে দ্বিতীয় মিলনের আবেগের সামনে বেশীক্ষণ আর দাঁড়াতে পারলাম না। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

সেই থেকে ওরা আমার বন্ধু। দেখেছি, কি ধৈর্যে আর সুগভীর প্রেমে ও মমতায় ওই অন্ধ মেয়েটাকে নিয়ে ভদ্রলোকের সংসার। একদিনের জন্যেও এর অন্যরূপ দেখিনি অথবা শুনিনি।

একদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বড় কষ্ট—না ?'

মেয়েটা হাসিমুখে বললে, 'কিসের কষ্ট ?'

বললাম, 'এই না দেখতে পাওয়ার ?'

মেয়েটি বললে, 'সব দেখতে পাই তো ! উনি যে সব বলে বলে দেন রোজ কি হলো কোথায়।'

ভদ্রলোককে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা অন্ধ মানুষের বোঝা নিয়ে বড় খারাপ লাগে—না ?'

শুধু বললেন, 'ও কিছু না—ও আমার পাওনা।'…

ওদের এক দুঃখ ছিল—সে হলো একটি ছেলের। বিশেষ করে মেয়েটির। তার সে সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কবে কি সাংঘাতিক চোট পেয়েছিল

জননকেন্দ্রে কি জানি। ভদ্রলোক একদিন সেই কথা তুলে বললেন, 'আমাদের একটা ছেলে দিতে পারেন?'

হেসে বলেছিলাম, 'ডাক্তার কি ভগবান!'

ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'ওই এক ওর বড় দুঃখ।'

কথাটা মনে ছিল। কারণ খারাপ লাগতো। ওই ওদের নিবিড় প্রেমের মধ্যে কেন একটি শিশুর কলতান উঠবে না! কতদিন ভেবেছি—তা হলে বড় ভালো হতো।

আমাদের মিউনিসিপ্যালিটিতে মারী মড়কের তো অভাব নেই। তারই একটা হিড়িকে ওই দম্পতিটির সন্তান-সাধ মিটে গেল। বাপ-মা ভাই-বন্ধু তিন কূলের নিশ্চিহ্ন একটা বাচ্চা পেয়ে গেলাম একদিন।

ভদ্রলোককে বললাম, 'কি মশায়, ছেলে চাই নাকি?'

ভদ্রলোক সাগ্রহে বললেন, 'সত্যি দেবেন?'

বললাম, 'দেবো। কিন্তু জাত ধর্ম—'

ভদ্রলোক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সে আমি তার চরম দেখেছি। আপনি আর নতুন কথা কী বলবেন।'

কি জানি কি ওঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা—তবু বললুম, 'পিতৃ পরিচয়টা অন্তত—'

ভদ্রলোক বললেন, 'চাইনে জানতে। সে সব আমাদের দিয়েই সুরু হোক।'

বললাম, 'বেশ—তবে আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন।'

ভদ্রলোক কৃতজ্ঞ হয়ে বললেন স্ত্রীর উল্লেখ করে, 'মাঝে মাঝে ওর করুণ মুখটা দেখে বড় দুঃখ হতো! এতদিনে আপনি আমাদের সব দুঃখের শেষ করলেন।'

সন্ধ্যেবেলা ন্যাড়া ছেলেটাকে ওঁর হাতে তুলে দিলাম—উনি প্রায় বুকে করে নিয়ে ছুটলেন অন্ধ বৌয়ের কাছে।

গল্পের শেষে গগন দত্ত একটু থামলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'সে-ও আজ অনেক দিনের কথা। ছেলেটি এখন ভালো পাশ করে বেরিয়েছে। তোমরা যদি কখনো তাদের সেই ছোট্ট ঘরটার মধ্যে গিয়ে বসো তা হলে আমার মতোই তোমাদেরও মনে হবে—শান্তি কী! বুঝতে পারবে—মোদ্দা কথায় মানুষ কি চায়। বুঝতে পারবে—মানুষের গভীর প্রেম, নির্ভরতা আর মমতার মধ্যে দিয়ে কেমন করে তা গড়ে ওঠে। কেমন ক'রে সকলের চোখের আড়াল দিয়ে সংসার ঠিক ধীরে এগিয়ে চলেছে।'

মথুর সেন বললে, 'দেখবার আগ্রহ রইলো।'

গগন দত্ত বললে, 'তাঁকেও নেমন্তন্ন করেছি আজ—এসে পড়তে পারেন অন্ধ বৌটির হাত ধরে।' বলতে বলতে গগন দত্ত সামনে তাকিয়ে সকলরবে অভ্যর্থনা করে উঠলো, 'এই দিকে রাজকুমার বাবু—এই দিকে আসুন।' বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এঁরই কথা বলছিলাম।'

সবাই তাকিয়ে রইলো। বয়স তাদেরই মতো—মাথার চুলগুলি সব পাকা, দীর্ঘ চেহারার মানুষ। দাঁড়িয়েছে ছেলে আর অন্ধ স্ত্রীর হাত ধরে—মুখে প্রশান্ত হাসি। গগন দত্তের কথায়—একটি পূর্ণ শান্তির মূর্তি।

শুধু দু'জন একটু অস্ফুট শব্দ করে উঠলো। তারা চিনেছে। জহুরী শংকরীপ্রসাদ বললে, 'আরে, এ যে চৌধুরী! রাজকুমার কি বলছেন—আদিত্য!'

আর সর্বানন্দ রায় সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'ঠাকুর মশায়!'

এবং দুজনেই ভাবতে লাগলো—এ কী সেই নতুন মানুষ! যে বার বার জীবনটাকে বদলে বদলে শেষ পূর্ণ শান্তির মূর্তি ধরে এসে দাঁড়িয়েছে সামনে—এক পাশে তার ছেলে আর একপাশে অন্ধ বৌ! কিন্তু অন্ধ বৌটি কে?

এমন সময় বেনামী রাজকুমার চৌধুরী স্ত্রীর একটা হাত একটু আকর্ষণ করে বললে, 'ওই দিকে চলো বিরাজ—ডাক্তার বাবু ওইখানে।'

তবে রাজকুমারের স্ত্রী সেই মফস্বল শহরের সমাজ-পরিত্যক্তা ধর্ষিতা বিরাজ-বালা! সর্বানন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

গগন দত্ত মৃদু হেসে বললে, 'তোমাদের ধর্ম-অর্থ জানিনে, কাম-মোক্ষ জানিনে। তবে এইটে জেনেছি—মানুষের সব চাওয়া এসে বোধ করি শেষ হয়ে গেছে আমার অতি অখ্যাত এই বন্ধুটির প্রেম আর শান্তির মধ্যে।'

জানোয়ার

'দারোগাবাবু—দারোগাবাবু!'—

ডাকাডাকিতে দারোগাবাবু উঠল বিলম্বিত প্রাতঃশয্যা থেকে। তখন প্রায় বেলা আটটা। গোঁফ বাগাতে বাগাতে বাইরে বেরিয়ে এল। বনওয়ারীবাবুর গোমস্তা তখন হাঁপাচ্ছে।

'কি হলো আবার?'

গোমস্তা শুধু বললে, 'বড়বাবু খুন।'

'খুন! বনওয়ারীবাবু!' দারোগা ভুরু কুঁচকে বললে, 'কাল অতো রাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করে এলাম—আহ্…'

গোমস্তা দম নিয়ে বললে, 'আজ্ঞে বেঙা মাঝি—শালা আজ সকালে কয়েকজনকে নিয়ে বনে জবরদস্তি কাঠ কাটতে যাচ্ছিল। তা আপনার বুদ্ধিমতো শালাকে ভজিয়ে-টজিয়ে ডেকে এনেছিলাম, না-না করে বৈঠকখানায় শালা ঢুকেও ছিল। তারপর বড়বাবুর সঙ্গে দুটো-একটা কথা হতে না হতেই ধাঁই করে কোপ মারলে হাতের কাঠ-কাটা টাঙিটা দিয়ে। বাস্।'

'ঘরে ঢুকেছিল যখন তখুনি সবাই ধরে ফেললে না কেন?'

'আমরা তো সব তৈরিই ছিলাম আপনার কথা মতো। তা বড়বাবু বোকার মতো'—

'হুঁঃ!' দারোগা বললে, 'বুনো জানোয়ারের সঙ্গে গেছেন বাক্যব্যয় করতে। বুনো জন্তুর সঙ্গে কথাটা আবার কী!' দারোগা বিরক্ত হয়ে আবার 'হুঁঃ' করে উঠল।

কথা হয়েছিল দুটো-চারটেই বটে।

বনওয়ারীলাল বাঘকে খাঁচায় পেয়ে যেন খোঁচা মেরে বলেছিল, 'বড় দেঁতেল হইচিস—হাঁ রে বেঙা!'—

বেঙা বলেছিল, 'হাঁ তো বাবু—বনের জন্তু মোরা, দেঁতেল বরা। বন কেড়ে লিলে মোদের—কাঠ কাটতে দিলেনি, গোরু-মহিষের ঘাস কেড়ে লিলে মোদের—কলের কাগজ বানালে, ঘর-জমিন লিলে, জেতের মেয়েমানুষ লিলে'—

'বটে রে শুয়োরের বাচ্চা! আবার মুখে মুখে কথা। এই বদ্রীনাথ'—

সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত মতো দড়াম করে বৈঠকের ভারী দুটো পাল্লা বন্ধও হয়ে

গিয়েছিল। কিন্তু বনওয়ারীবাবুর হঠাৎ বুকফাটা আর্তনাদে সব ব্যবস্থা কেমন ভেস্তে গেল। মড়াৎ করে দরজার হুড়কো ভেঙে ছুটে বেরিয়ে গেল বেঙা মাঝি।

'ধর—ধর—ধর।'

পাইক বরকন্দাজ ছুটল বেঙার পেছনে পেছনে! শিকার পালিয়েছে খাঁচা ভেঙে। গোমস্তা ছুটে এসেছে থানায়।

'এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বড়বাবু মারা গেলেন।'

দারোগা বললে, 'বুনো জন্তুর কাণ্ড! সাবধানে কাজ করতে হয়। ওগুলো কী মানুষ! অপরাধপ্রবণ জাত। ওদের সামলে ওঠা দায়। চল দেখি।'—

'বড়বাবুর দিকে চোখ মেলে তাকানো যায় না গো দারোগাবাবু। শালা এমনি বসিয়েছে কোপ।—দেখে মাথা ঘুরে যায়!'

'মানুষের জীবনের জন্যে ওদের কী কিছু মায়া আছে! বললুম যে, ওগুলো বুনো জন্তু। ওদের বস্তিশুদ্ধু মাগী-মদ্দ ধরে ধরে এনে ওই লাশ দেখাও—ওরা না পাবে ভয়, না হবে ওদের মায়া। ইংরেজরা কি আর সাধে ওই সব এক-একটা বুনো জাতকে অপরাধপ্রবণ বলে দাগিয়ে রেখে কড়া শাসন করত!'

'তা হলে চলুন আপনি।'

'যাব বৈকি।' দারোগা গোঁফ পাকাতে পাকাতে হাঁকলে, 'এই মহাদেও পরসাদ, সরযু সিং!'—

থানার ফৌজী সেপাই তৈরি হতে লাগল।

এদিকে বনওয়ারীবাবুর পাইক-পেয়াদার একটা দল ধাওয়া করেছে বেঙা মাঝির পেছনে। বেঙা ছুটছিল বুনো পথ ধরে। বাল্যের বহু পরিচিত অরণ্যভূমি—আনাচ-কানাচ, আর সুগঠিত পায়ে তার হরিণ-গতি। ধাওয়া-করা দলটা ক্রমেই পেছিয়ে পড়ল—দূরে সরে গেল তাদের হাঁকডাক হৈ-হাল্লা। বেঙা ছুটেছে উর্ধ্বশ্বাসে। দিনের আলোয় উদ্ভাসিত বাইরের খোলা প্রান্তর—যার এক প্রান্তে মিনমিন করছে তাদের ছায়াঘন দরিদ্র কুঁড়েগুলো। কিন্তু সেদিকে মায়া হয়ত আছে, আশ্রয় নেই। ক্রমশঃ গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল বেঙা—কিন্তু দিনের আলোয় অন্ধকার কোণ কই, আশ্রয় কই! শালের দীর্ঘদেহ ক্রমশঃ দীর্ঘতর হচ্ছে, মহুয়ার গাছগুলোও যেন পাল্লা দিয়ে মাথা তুলছে উপরে। মাঝে মাঝে দু-একটা কাঁটা বাঁশের ঝোপ—তার মধ্যে লুকোবার জায়গা নেই। ক্রমাগত ঘণ্টাখানেক ধরে সে ছুটল। ধাওয়া-করা দলটার হৈ-হাল্লা আর শোনা যায় না। বেঙা বসে পড়ল একটা শাল গাছের তলায়। টাঙিটা তখনো শক্ত

মুঠোয় ধরা—ওর সেই বিস্ফোরিত মুহূর্তের ক্রোধ হাতের মুঠোটায় যেন জমাট বেঁধে গেছে। তাজা রক্তের চিহ্ন শুকিয়ে গেছে টাঙির ফলায় ! গাছতলায় বসে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনল বেঙা—বাতাসে কলকণ্ঠ শোনা যায় কিনা। শোনা যায় না। ওর পঁচিশ বছরের বলিষ্ঠ নিঃশ্বাসে ভারী বুকটা কাঁপছে হাপরের মত—ওর নিকষ কালো দেহটা ঘাম ঝরে হয়ে উঠেছে জমাট কালো পাঁকের মত। হঠাৎ সে চমকে উঠে দাঁড়াল—কি যেন দুম্ করে শব্দ হলো একটা দূরে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠল বনওয়ারীবাবুর দোনলা বন্দুকটা। দূরে বন্দুকের শব্দে মুহূর্তের জন্য কেঁপে উঠলো অরণ্যের নিঃশব্দ প্রশান্তি। আবার সে ছুটতে শুরু করল গভীরতর অরণ্যের আশ্রয়ে। দেহটাকে লুকোবার মত একটা জায়গা খুঁজে নিতেই হবে।

দ্বিতীয়বারের এই আতঙ্কে কোন দিকে ছুটছে সে তার ঠিক নেই। হঠাৎ তার মনে হলো—যেন দিক ভুল হয়ে গেছে, কমে আসছে অরণ্যের গভীরতা। অথচ তা হওয়ার কথা নয়। এ অরণ্যভূমি অনেক বড়—শুরু হয়েছে ছোটনাগপুরের পার্বত্য প্রান্ত থেকে। এক পাশ এর ছুঁয়েছে গিয়ে উড়িষ্যার রিজার্ভ ফরেস্টের সঙ্গে—আর এক পাশ ঠেলে গেছে বিহারের দিকে মানভূম সিংভূম সাঁওতাল পরগনা। বাঙলা বিহার উড়িষ্যার বিরাট এক অরণ্য-এলাকা জুড়ে আদিবাসী ভূমি। কিন্তু ছুটতে ছুটতে বেঙা দেখলে—সেই জঙ্গল দ্রুত পাতলা হয়ে আসছে, যেন আর একটু গেলেই জঙ্গল শেষ হয়ে যাবে। তার সন্দেহ হলো—সেই যে একবার সে গাছতলায় একটু হাঁফ নিতে বসেছিল, তারপর আচমকা বন্দুকের শব্দ শুনে উঠে পড়ে ছুটতে শুরু করেছে—সেই সময়ে হয়ত দিক্‌ভুল করে ফেলেছে। সন্তর্পণে এগোতে লাগল বেঙা।

জঙ্গল শেষই হয়ে গেল বটে। তার ভয় হলো, হয়ত সে জঙ্গল থেকে বেরিয়েই, গিয়ে পড়বে বনওয়ারীবাবুর দলের সামনে। একটা ঘন বাঁশঝাড়ের আড়ালে সে থমকে দাঁড়াল। চারদিকে চেয়ে চেয়ে জায়গাটা প্রাণপণে চেনবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই চেনবার উপায় নেই। জঙ্গলের বাইরে সেই দিগন্তছোঁয়া পাথুরে প্রান্তর, কাঁসার পাতের মত রুগ্ন ঘাস আর পাথর-কাটা জমি। দরিদ্র কৃপণ পৃথিবীর আদিবাসী অঞ্চল। পায় পায় আরও একটু সে এগোল। হঠাৎ চোখে পড়ল তার—বনের প্রায় লাগাও একটা ভাঙা কুঁড়ে। যেন পরিত্যক্ত। দূরে আরও কয়েকটি ছাড়া ছাড়া ঝুপড়ি টঙের মত। আধচেনা জায়গা। তাদের গাঁ থেকে বেশ কিছুটা দূরে হলেও সে সকাল থেকে একনাগাড়ে অতোখানি ছুটেও তাদের এলাকা ছাড়াতে পারেনি। অরণ্যের দেবতা জঙ্গলেই ছলনা করেছে তার সঙ্গে।

সূর্য উঠেছে তখন প্রায় মাথার ওপরে—চোখে ঝলসাচ্ছে দীপ্ত দিনের আলো। এখন যেখানে হোক লুকানো দরকার। বনের লাগাও খড়কুটো তালপাতা দিয়ে ছাওয়া হতশ্রী ভেঙেপড়া কুঁড়েটার দিকে সন্তর্পণে এগোতে লাগল সে। কুঁড়ের পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কোন সাড়াশব্দ শুনতে পেল না। এরকম ভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক মনে হলো না। কুঁড়ের পেছনে ভেঙে ঝুলে পড়া ঝুপড়ি চালার তলায় কোনরকমে সে হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ল।

ওই অবস্থায় কান খাড়া করে রইল সে—জঙ্গলের দিকে কোন হাল্লা শোনা যায় কি না। একবার তার মনে হলো—হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় যেন কতগুলো মানুষের বহুদূরাগত একটা ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল। তারপর আবার সব চুপচাপ। বনওয়ারীবাবুর দল নিশ্চয়ই বুনো পথে এখনও ধাওয়া করছে। প'ড়ো চালার তলায় আরও নিজেকে সে গুটিয়ে নিল। জঙ্গলের দিকে এখন মোটেই নিরাপদ নয়।

কিন্তু সামনেই নতুন এক আপদ। খুব কাছেই কোথায় যেন একটা গোঙানির শব্দ শোনা গেল :

'হায় কদম্—হায় রে বাপ্।'···

চমকে উঠল বেঙা। গোঙানিটা মিইয়ে মরে গেল। আর কিছু শোনা গেল না। দূরের কলশব্দ শোনার জন্যে আবার কান খাড়া করে রাখল সে।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার গোঙানি :

'হায় গো'—

মনে হলো ভাঙা চালাটার ওপারেই কে যেন গোঙাচ্ছে। কান পেতে শুনতে লাগল বেঙা। কিছুক্ষণ চুপচাপের পর আবার গোঙানি :

'জল গো—হায় বাপ্।'···

বেঙা চঞ্চল হয়ে উঠল। শুনতে লাগল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে।

'হায় কদম—জল দে।'···

এ এক অসহ্য উৎপাত।

কে কোথায় গোঙিয়ে মরছে জলের জন্যে। গোঙানিটা বাড়ছেই ক্রমশ। অরণ্যের ছড়ানো নিঃশব্দ প্রশান্তি কেঁপে উঠছে থেকে থেকে। চঞ্চল হয়ে উঠল বেঙা—জায়গাটা আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না। ওই জলের কাতরানিই কিছুক্ষণের মধ্যে হয়ত ডেকে আনবে বনওয়ারীলালের দলকে। কিন্তু আশ্চর্য! ক্রমাগত ওই 'জল—জল—জল', অথচ কেউ কি নেই তার মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার?

তার মনে হলো—গলাটা বুড়ো বুড়ো, খস্‌খসে। মাথার ওপর থেকে সূর্য যত ঢলে পড়ছে ততো বাড়ছে তার জলের চেঁচানি। অতিষ্ঠ হয়ে বেঙা শেষ পর্যন্ত সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুল ভাঙা চালার ভেতর থেকে। সন্তর্পণে কুঁড়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। নাকে এসে লাগল একটা নোংরা দুর্গন্ধ। কুঁড়ের সামনে নিচু অন্ধকার দাওয়ায় একটা বুড়ী লুটোপুটি খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে জলের জন্যে। চারদিকে ভেদবমি। ব্যাপারটা বুঝতে বাকি রইল না বেঙার।

বেঙাকে দেখে বুড়ী বলে উঠল, 'হায় গো—জল…জল।'

'এমন কত্‌খন হৈছে বটেক বুড়ী-মা'—বেঙা জিজ্ঞেস করল চাপা গলায়।

বুড়ী শুধু বললে, 'জল—জল, হায় গো বাপ্‌।'

কিন্তু জল কোথায় ? ভাঙা কুঁড়ে ধ্বসে পড়েছে। আছে শুধু সামনের দাওয়াটুকু। বুড়ীর সংসার। হাঁড়িকুড়ি চ্যাটাই ভাঙা সরা। তারই মধ্যে থেকে খুঁজে-পেতে গলা ভাঙা জলের কলসী একটা আবিষ্কার করল বেঙা। জল ঢেলে দিলে বুড়ীর মুখে।

বুড়ী চুপ করল। কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজল যেন শান্তিতে।

আর বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ মনে করল না বেঙা। বুড়ীর কাছে থাকতে সাহস হলো না তার। গিয়ে আবার ঢুকল সেই আগের আস্তানায়।

কিন্তু কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবার সেই জলের জন্যে কাতরানি :

'হায় বাপ্‌—জল ! হায় কদম্‌—'

কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে বসে রইল বেঙা। কিন্তু জলের জন্যে চেঁচানি বেড়েই চলেছে ক্রমে। অতিষ্ঠ হয়ে বের হল আবার হামাগুড়ি দিয়ে। মনে মনে ভাবলে—এই বুড়ীই ধরা পড়িয়ে দেবে আজ তাকে নির্ঘাত।

বেঙাকে দেখে বুড়ী বুক আঁচড়াতে লাগল, 'হায় কদম্‌—জল।'

বেঙা বুড়ীর মুখে জল ঢেলে দিল আবার।

বুড়ী চুপ করল।

একটু বেশীক্ষণ নিরাপদ হওয়ার জন্যেই বোধ হয় বেঙা বললে, 'আরও একটু জল খেয়ে লাও বুড়ী-মা।'

আপদ দেখ। বুড়ী চোখ বুজল। জল খেল না।

বেঙা বিপন্নের মত এদিক ওদিক তাকাল। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কদম্‌ কে বটে বুড়ী-মা ? কোথায় গেছে ?'

বুড়ী ঘোলাটে চোখ মেলে শুধু তার দিকে তাকিয়েই রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

বেঙা বললে, 'আর জল খাবে? তো খেয়ে লাও।'

বুড়ী বমি করল। বসা গলায় আবার বললে, 'জল।'

জল দিল বেঙা। জিজ্ঞেস করলে, 'কত্‌খন এমন হৈছে বটে?'

কথা নেই। বুড়ী চোখ বুজল আবার।

ভারি মুশকিলে পড়ে গেল বেঙা। জলের কলসী বুড়ীর মুখের কাছে বসিয়ে দিয়ে ফিরে গেল আবার তার লুকোবার জায়গায়। সেখানে ঢুকে ভাবতে বসল—এ এক মহা ফ্যাচাঙের জায়গায় এসে পড়েছে সে। বুড়ীর কলেরা। ভেদবমি কতক্ষণ হচ্ছে কে জানে! কদম্ নামটা বুড়ীর মুখে খুবই শোনা যাচ্ছে বটে—কিন্তু সে যে কে এবং কোথায় গেছে, তার পাত্তা নেই কোনো। সূর্য এদিকে ঢলে পড়ল পশ্চিম দিগন্তের দিকে। বুড়ীর চেঁচানিও বাড়ছে ক্রমশ জলের জন্যে। সিটিয়ে আসছে বুড়ো মুখটা—বসে আসছে গলা। জলের জন্যে তার ওই কাৎরানি নিশ্চিন্তে আর শোনাও যায় না কুঁড়ের পেছন থেকে। কিছুক্ষণ গোঙানি শোনা না গেলে বেঙা ভাবে, এইবার বুড়ী বোধহয় গেল।

শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙা ঝুপড়ির মধ্যে থাকা যেন অসহ্য হয়ে উঠল তার। যেমন কপাল তার—বুড়ীটা কী এইখানেই মরতে বসেছে বেঘোরে। হয়ত ছেড়ে পালিয়েছে তাকে সবাই। বেঙা তো জানে—এ রোগ ছুঁলে বসতি কেমন করে উজাড় করে দিয়ে যায়। অথবা হয়ত তার মরদ বা জোয়ান ব্যাটা এ তল্লাট থেকে উৎখাত হয়ে চলে গেছে কোথাও কাজের ধান্ধায়। এ অরণ্যের চারপাশ ঘিরে তাদের জাতের মানুষ—তাদের হাল-হালৎ কী, সে ভাল করেই জানে। শেষ পর্যন্ত কাঠকুটোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বেঙা মাঝি বসল গিয়ে বুড়ীর পাশে।

ইতিমধ্যে বুড়ীর আরও কয়েকবার ভেদবমি হয়ে গেছে। কাদায় নোংরায় থক্ থক্ করছে সবটা—আর বিশ্রী একটা দুর্গন্ধ। বুড়ী আর চেঁচাতে পারছে না—থেকে থেকে হাঁ করছে শুধু। বোধ হয় জল চাইছে। কেবলি তার মনে হতে লাগল—একটা মানুষ বেঘোরে মরে যাচ্ছে তার সামনে, কেমন করে সে তাকে ছেড়ে যায়!

আশে পাশে তাকাল বেঙা—কিন্তু একটি জনপ্রাণীও দেখা যায় না। দূরে দূরে নিঃশব্দ কুঁড়েগুলি। বনের আড়াল ছেড়ে অতো দূরে গিয়ে খোঁজ-খবর করতে সাহসও হল না তার। কুঁড়েগুলোর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে—কাউকে যদি দেখতে পায়।

দেখা গেল একজনকে শেষ পর্যন্ত। একটি সাঁওতাল মেয়ে বেরিয়ে আসছে

দিনের শেষে বনের ভেতর থেকে—মাথায় কাঠকুঠোর বোঝা। হাত নেড়ে ডাকল বেঙা।

মেয়েটি এসে অবাক চোখে তাকাল তার দিকে।

বেঙা বললে, 'হুই দেখ, এ বুড়ীর ওলাউঠা হয়েছে। গুনিন-বদ্যি দেখালে বুড়ী বাঁচতেও পারে।'

মেয়েটি বুড়ীর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ রাখল তার ওপরে। অবাক হয়ে দেখছে তো তাকে দেখছেই। বিব্রত বোধ করে বেঙা—কি দেখছে তাকে অতো মেয়েটা! তার মুখ, বুক সর্বাঙ্গ—মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এতক্ষণে নিজের দিকে তাকিয়ে বেঙাও মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করল। বনওয়ারীলালের ফিনকি দেওয়া রক্তে কখন সর্বাঙ্গ সিক্ত হয়ে গেছল তার—সে সব জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে। হয়ত বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে। একটা খুনে—ডাকাত—শয়তানের মত হয়ত। আর সে-ই খুনেটা বলছে কি না—বুড়ীটাকে যদি বাঁচানো যায়!—

মেয়েটার জিজ্ঞাসু কৌতূহলী মুখের ভাব বুঝে বেঙা বললে, 'মোর কথা বলব পরে। এখন গুনিন-বদ্যি একটা ডাকতে পার?'

মেয়েটি বললে, 'ঘরকে যেয়ে বলি তবে মোর মাকে।'

একটু ভেবে নিয়ে বেঙা বললে, 'উহুঁ, মোর একটি কথা রাখবে? ভিন গেরামের লোক হলেও জেতের লোক তোমার আমি। মোর কথা সব বলব তোমাকে পরে। এখন তুমিই চলে যাও সোজা গুনিনের কাছে—ডেকে আন।'

মেয়েটি অবাক হয়ে শুধু চেয়েই রইল তার দিকে।

বেঙা জিজ্ঞেস করলে, 'বলতে পার—কদম্ কে?'

'বুড়ীর ব্যাটা।'

'গেছে কোথায়?'

'কাজ-কাম তো নাই ইদিকে—চার পাঁচ মাস হলো মোদের সব মরদদের সঙ্গে চলে গেছে খাদে।'

বেঙা বলল, 'যাও তবে তুমি গুনিনের কাছে।'

আর একবার অবাক চোখে চেয়ে চলে গেল মেয়েটি।

বেঙা বুড়ীর দিকে নজর দিল এবার। তাকে শুকনো দাওয়ার দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে সাফ-সুফ করতে লাগল সে। দাওয়া হাতড়ে খুঁজে-পেতে ছেঁড়া ময়লা ন্যাকড়া এনে লেগে গেল সেবায়। হাত-পা ঠাণ্ডা—খিঁচুনি ধরেছে। বুড়ীর পাশে বসে ঘষে দিতে লাগল বেঙা। আর মনে মনে ভাবতে লাগল, সন্ধ্যের আগেই হয়ত শেষ হয়ে যাবে বুড়ী। তারপর নিশ্চিন্তে সন্ধ্যের অন্ধকারে

সে হাঁটা দেবে এখান থেকে। তার আর কোন দায়িত্ব নেই। দেব্‌তা মারাং বুরু নিশ্চয় তাকে ক্ষমা করে দেবে।

দিন তখন শেষ হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। বুড়ীর মরার কিন্তু কোন লক্ষণ নেই। বরং হাত-পাগুলো ঘষে দেওয়ায় খিঁচুনিটা যেন কমে গেল। আরামে চোখ বুজে আছে বুড়ী। বিড় বিড় করে একবার বলল যেন :

'কদম্‌—হায় বাপ্‌।'

সন্ধ্যে নাগাদ বুড়ো এক সাঁওতাল-বদ্যি এসে বুড়ীকে দেখে ওষুধপত্তর দিয়ে গেল—যে মেয়েটি ডেকে এনেছে তাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে গেল। কুঁড়ের পেছন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখল বেঙা। শুনে বুঝে নিলে সব। দেশী গাছগাছড়ার ওষুধ—এটা বেটে খাওয়াতে হবে, ওটা ঠাণ্ডা জল দিয়ে—সেটা গরম জলে ইত্যাদি। মনে মনে ভাবল বেঙা—আজ রাতটা তবে যাবে এইভাবে। বুড়ী পড়ে আছে ঠিক একভাবে—সহসা মরবে বলে মনে হলো না তার।

মেয়েটিকে বললে বেঙা, 'ঘরকে তুমি চলে যাও হে। মোর কথা বলোনি কারুকে। কাল সকালে লুকিয়ে এসো একবার। আমি রইলম বুড়ীর কাছে। মোকে শুধু একটু আগুন আর একটা লম্ফ দিয়ে যাও। লাসের জন্যে শেয়ালগুলো ঘোরাঘুরি করছে বিকেল থেকেই।'

নিজের ঘর থেকে সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে মেয়েটি চলে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বেঙা আগুন জ্বেলে গরম জলে কি সব শেকড়-বাকড় সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিলে। হাঁড়ি পাতিলের আড়ালে মিনমিন করে জ্বলছে কেরোসিনের বাতিটা। ওষুধ সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়ে বুড়ীর ঠাণ্ডা হাতে পায়ে সেঁক দিতে বসল বেঙা।

বুড়ী হঠাৎ তার অচৈতন্যের ঘোর থেকে বলে উঠল, 'হায় কদম্‌—এলি!'

'হাঁগো—এলম।' বেঙা তাকাল বুড়ীর মুখের দিকে।

বুড়ীর গলা ঘড় ঘড় করে উঠল। আচ্ছন্নের মত বললে, 'মারাং বুরুর জঙ্গল আছে, হাঁসিল জমিন আছে, গোচর আছে।—যাসনি।'

'না—ক্যানে যাব!'

বুড়ী আর কোন কথা বলল না। যেন নিশ্চিন্তে চোখ বুজে পড়ে রইল।

বেঙা এবার লম্ফটা বুড়ীর মাথার কাছে বসিয়ে জ্বাল দেওয়া ওষুধটা খাওয়াতে বসল।

ঢোক দুয়েক বোধ হয় খাওয়ানো হয়েছে—এমন সময় ঘটে গেল বহুক্ষণের

সেই ঝুলে থাকা বিপর্যয়টা। বাইরের ঘন অন্ধকারে হঠাৎ একটা হুইশিলের শব্দ—তারপর দুদ্দাড় ছোটা পায়ের আওয়াজ। ওষুধ খাওয়ানো হাতটা একটু কেঁপে উঠল বেঙার—মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল হঠাৎ। ফস্ করে সে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মিন্‌মিনে আলোটা। লাফ দিল বুনো শুয়োরের মত গোঁ ভরে। তবু ধরে ফেললে তাকে—কঠিন জোড়া জোড়া হাত। ধস্তাধস্তি চলেছে কুঁড়ের সামনে। অন্ধকারে। টাঙিটা ছিটকে গেল কোথায় অন্ধকারে। বেঙা নিরস্ত্র।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে ব্বাপ্—মরি গৈল, মরি গৈল।'

এদিকে ওদিকে কড়া টর্চের আলো। কিন্তু সে আলোর সীমা পার হয়ে তখন দ্রুত চলে গেছে এক জোড়া বলিষ্ঠ পা। অন্ধকার অরণ্যভাঙা একটা সর্ সর্ শব্দ মিলিয়ে গেল দূরের হাওয়ায়। কাঁপতে থাকে বন্দুকের এলোপাথাড়ি আওয়াজ।

কে যেন বললে অন্ধকারে, 'জানোয়ার—বিলকুল জানোয়ার! হাতের একটা আঙুল কেটে নিয়ে চলে গেছে কামড়ে।'

'পাকড়ো শালেকো।'

একজন শুধু ডুকরে উঠল, 'আরে মরি গৈল রে বাপ্।'

বুনো শুয়োর তাড়ানোর হল্লা উঠল আবার জঙ্গলের দিকে। দূরে ধাওয়া করে চলল—হাওয়ার তরঙ্গে বন্দুকের বেপরোয়া শব্দ।

রাত যখন গভীর হলো—গাঢ় অন্ধকার ভরে যখন এখানকার বোবা আকাশ, প্রান্তর আর অরণ্যের অঢেল শান্তি আদিম স্থৈর্যে সংহত হলো তখন সেই অদম্য আরণ্যক জানোয়ারটি ফিরে এল আবার সেইখানে—সেই কুঁড়েতে, সেই বুড়ীর পাশে—বলিষ্ঠ দুঃসাহসী সহৃদয় একটা মানুষেরই মত। থমকে দাঁড়াল অন্ধকারে। গোটা তিনেক শেয়াল কি একটা ভারী জিনিস নিয়ে তখন যেন মহা আনন্দে টানাটানি করছে। তাকে দেখে ছুট্‌কো জানোয়ারগুলো ছুটে পালাল।

চুপ-কথার রূপকথা

জাহাজটা ডুবে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদের মহাপিণ্ড ঝড়ো আকাশের বিক্ষুব্ধ মহাশূন্যে গড়াতে গড়াতে মিলিয়ে গেল। উত্তাল তরঙ্গের মাথায় মাথায় দেখা গেল কতগুলো মানুষের প্রাণপণ বাঁচার চেষ্টা। লড়াই করছে ঝড়ে ফুঁসেওঠা ঢেউয়ের সঙ্গে—হাবুডুবু খাচ্ছে মাতঙ্গ ঢেউয়ে।

মোচার খোলের মতো শাদা জলি বোট একটা লুটোপুটি খাচ্ছে ঢেউ থেকে ঢেউয়ে—ওতে আছে কয়েকটা আপৎকালের লাইফবেল্ট আর জনা কয়েক মাত্র আরোহী, তারা প্রাণপণ চেষ্টায় সামাল দিচ্ছে নৌকোটাকে। চারিদিকে পিচঢালা অন্ধকার আর মাথার ওপরে ঝড়, সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো এক-একটা ঢেউ এসে আরও কোন এক গভীরতর অন্ধকারে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে নৌকোটাকে। সব ক'টি আরোহী নৌকো সামলাতে ব্যস্ত—ওদের মধ্যে একজন শুধু ধীর স্থির। নিঃশব্দে বসে আছে পেছন দিকে—যেন অপেক্ষা করছে চরম মুহূর্তের। বোধ করি সেই চরম প্রস্তুতির জন্যে লোকটি আস্তে আস্তে গায়ের জামা খুলল। বয়স হয়েছে—তবু চওড়া পেশল দেহে বলিষ্ঠতার আভাস।

গাঢ় অন্ধকারে তরঙ্গে তরঙ্গে দুলছে জলি বোটটা। এটাকে লক্ষ্য করেই উন্মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে এগিয়ে চলেছে আরও একটা লোক। প্রাণপণে একবার চীৎকার করে উঠলো, 'বাঁচাও—ও!'...

পাগলা ঝড়ে কোথায় উড়ে গেল তার ভাবী গলার ডাক। আবার সে প্রাণপণে নিজেকে কোনো রকমে ভাসিয়ে রেখে জল টানতে লাগলো দু'হাতে। লক্ষ্য ওই শাদা ছোট্ট নৌকোটা। ভাগ্যের পরিহাসের মতো ঢেউগুলো যেমন এক একবার কাছে এগিয়ে নিয়ে আসছে—আবার তেমনি ঠেলে দিচ্ছে তাকে দূরে।

হঠাৎ বোধ করি ওর কপাল খুলে গেল। ধরে ফেললে। নৌকোটার গলুই চেপে ঝুলতে লাগলো। দম নিতে লাগলো।

আরোহীদের মধ্যে একটু সাড়া উঠলো।

'আদমি!'...

কিন্তু কে কার দিকে তখন তাকায়। নৌকো সামলাতে সবাই ব্যস্ত। পেছনে বসে থাকা লোকটি গম্ভীর—চিন্তিত।

ততক্ষণে জল থেকে লোকটা গলুই চেপে ধরে এক ঝাঁকিতে উঠে পড়েছে নৌকোয়। এক মাথা চুল, মুখ ভরা দাড়ি গোঁফ—ভারী, পেশল চেহারা তারও। সেই অন্ধকারেও অতি সহজেই ধরা পড়ে তার আসামীর বেশভূষা—খাটো জাঙিয়া, গারদী কুর্তা, গলায় তক্তি। যে লোকটা তাকে সাহায্যের জন্য একটা হাত বাড়িয়ে ছিল তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো সে। হায় আল্লা—এ যে সেই তার রক্ষীদেরই একজন। বাঁচবার আশায় এ আবার কোথায় এসে পড়লো সে!

রক্ষী হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিলে, 'বৈঠ্।'

বসে একটু দম নিতে লাগলো—আর ভাবতে লাগলো। পলকে অতীত ষোলটা বছর তার চোখের সামনে দিয়ে ছুটে গেল—চারদিকে আশাহীন, প্রাণহীন গাঢ় অন্ধকারের মতো দীর্ঘ ষোলটা বছর। তার মধ্যে চার-চারবার সে পালাবার চেষ্টা করেছে গারদ থেকে—চার-বারই ধরা পড়ে গেছে। তারপর দ্বীপান্তর। স্বয়ং মৃত্যু এসে এবার তার মুক্তির পথ খুলে দিলে ঝড়ের মধ্যে। কিন্তু ঘুরে ফিরে আবার···

জায়গাটা কোথায়? এ কী সমুদ্র? লোকটা অন্ধকারে তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকালো, তারপর ফিরে তাকালো তার রক্ষীর দিকে। ইচ্ছে হলো—টুপ করে আবার নেমে যায় জলে। আবার সেই মৃত্যুর মত মুক্তি—দম আট্‌কানো উন্মত্ত ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়া!—আঃ, ষোল বছর পরে আবার একটা ভয়ংকর মুক্তি। কিন্তু নৌকোটা যদি বাঁচেই—তা হলে এরা তাকে আবার কোথায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

'আরে—অব্ বৈঠা ধর শালা।'

রক্ষী একটা বৈঠা তার হাতে গুঁজে দিলে। দিয়ে বসে পড়ল।

বৈঠা হাতে নিয়ে শানিত ছোরার মতো ঝিলিক দিয়ে উঠলো লোকটার চোখ। রক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। ঝিকিয়ে উঠলো ওর হল্‌দেটে দাঁতগুলো। না, শেষবারের মতো সে বাঁচবেই। তার মন বললে, 'বোধকরি এ জীবনে এই তার শেষ সুযোগ।'

ওদের মধ্যে কে একজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'বয়া—একটা বয়া দেখা যাচ্ছে।'

লোকটা দেখলে তাকিয়ে—বয়াই বটে। পিচ্ কালো অন্ধকারে একটা লাল আলোর বিন্দু নিয়ে দূরে কে যেন পাগলের মত লোফালুফি করছে। তবে এ সমুদ্র নয়—হয়তো মোহানা। হয়তো কাছে পিঠে কোন চর থাকলেও থাকতে পারে। আবার তার মন বললে, দুর্যোগের এই সুযোগে তাকে বাঁচতেই হবে।

রক্ষীটা বাঁচার উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে তার পাশেই—যেন অনিশ্চিৎ এই জীবনের পথে এখনও পাহারা দিচ্ছে তাকে। আবার তাকে গারদে পুরবে—আবাব হয়তো দশ বছর…বিশ বছর…

ধাঁই করে একটা বৈঠার বাড়ি পড়লো রক্ষীর মাথায়। আচম্‌কা লুটিয়ে পড়লো লোকটা।

'এই…এই…খুন…খুন…'

প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসের মধ্যেও জীবন ও মুক্তির আর একটা নাটক অভিনীত হতে থাকে। লোকটা ক্ষেপে যায়। মাথার ওপর তেমনি ঝড়ের ঝাপট, উত্তাল তরঙ্গ তেমনি লোফালুফি করছে নৌকোটা নিয়ে। তার মধ্যে কয়েকটা লোকের আর্তনাদ:

'খুন করে ফেললে—খুন করে ফেললে।'

লোকটা নির্মম বলিষ্ঠ হাতে একে একে বৈঠার ঘাযে তার প্রত্যেকটি খুনের চিহ্নকে যেন সবলে মুছে দিতে লাগলো। সে যেন তার কৃতকর্মের একটা সাক্ষীকেও বেঁচে থাকতে দেবে না, আজকের পালানোর সূত্রও সে ফেলে যাবে না এতটুকু।

একে একে লুটিয়ে পডছে লোকগুলো—বাঁচার তাগিদে সেই উন্মত্ত তরঙ্গের মধ্যেও লাফিয়ে পডলো দু-এক জন। লোকটা নৃশংস ভাবে সেই উত্তাল জলরাশি লক্ষ্য করে বৈঠার বাড়ি বসালে। একটা লোকও যেন না বেঁচে গিয়ে লোকালয়ে—সমাজে ফিরে বলতে পারে, চারবারের জেল পালানো সেই খুনী আসামী রহমতুল্লা আবার পালিয়েছে।…

আর একটি মাত্র লোক আছে নৌকোয়—তার এ জীবনেব শেষ সাক্ষী। লোকটা নীরবে বসেছিল এতক্ষণ অন্ধকারে অটল ধৈর্যের মূর্ত স্তূপের মতো—এতক্ষণে তার মনোভাব বোধ হয় বুঝতে পেরেছে। তাই বার বার তাকাচ্ছে উত্তাল জলরাশির দিকে—একটু ইতস্ততও করছে। মৃত্যু সামনে—মৃত্যু আশ-পাশে।

আর দেরি নয়—পালাতে পারে। রহমতুল্লা বীরদর্পে আবার শূন্যে বৈঠা তুললে। এই সময় হঠাৎ রহমতুল্লার চোখে ঝিকিয়ে উঠলো বয়ার সেই লাল আলোটা—সেটা যেন একেবারে সামনে। ঢেউয়ের মাথায় উঠে নৌকোটা যেন মাথা নীচু ক'রে ছুটেছে সেই বয়ার দিকে। তারপর মুহূর্তে একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। নৌকোটা সজোরে আছড়ে পড়লো বয়াটার ওপরে—ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শেষ আরোহী দুটি ছিটকে পড়লো জলে।

আবার সেই বিক্ষুব্ধ জলরাশির সঙ্গে লড়াই। রহমতুল্লা প্রাণপণে কোনো রকমে ভেসে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু ডান হাতটা যেন অবশ হয়ে আসছে। নৌকোটা ভেঙে পড়ার মুহূর্তে কোথায় যেন একটা চরম ঘা দিয়ে চলে গেছে তাকে। তবু বাঁচতে হবে। কূল নেই, আশা নেই—মৃত্যুর মত বীভৎস এক অন্ধকারে চারদিক ঘিরে কালো কালো ঢেউগুলো উঠছে আর নামছে। কতক্ষণ এই ভাবে লড়াই করলে শেষ পর্যন্ত বাঁচা যাবে—তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। একটা অন্ধ হতাশা এবং স্নায়ু ও পেশীর ক্লান্তি রহমতুল্লাকে ধীরে ধীরে অবসন্ন করে আনছিল। এমন সময় অন্ধ এক নিয়তির মতো বলিষ্ঠ লোমশ দুটো বাহু সাগ্রহে তার গলা জড়িয়ে ধরলো।

'কে! এ্যাঃই···ছাড় ছাড়।'

রহমতুল্লা তার বাহুপাশ ছাড়াতে চাইলে—কিন্তু সে দুটো যেন আরও নিবিড় আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরতে চাইল। তার বিপুল দেহভার নিয়ে তাকে যেন জলের তলার দিকে টানতে লাগলো।

রহমতুল্লা দাঁতে দাঁত চেপে সর্বশক্তি দিয়ে তাকে ছাড়াতে চাইল, 'ছাড়—ছাড়, উঃ—ডুবে যাব—এ্যাই—ছা—ড়।'

'আমি আর পারছি না—আমাকে বাঁচাও। তোমাকে অনেক টাকা দেব।' লোকটি দমচাপা খাবিখাওয়া গলায় বললে ফিস্‌ফিস্ করে, 'আমি আর পারছি না।'

'গলা ছাড়। ভেসে থাকবার চেষ্টা কর। রহমতুল্লা প্রাণপণে জল টানতে টানতে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললে, 'কাঠ—এই যে একটা কাঠ! পেয়ে গেছি! আল্লা! উঃ, গলা ছেড়ে কাঠ ধর।'

সেই ভাঙা নৌকোটার আধখানা—ডোঙার মতো একটা ফালি। রহমতুল্লা তারই ওপর উঠে বসলো। তার সঙ্গীও তাকে অনুসরণ করলে। হাঁপাতে লাগলো দু'জনে।

আকাশের উন্মত্ত ঝড়ো ক্রোধ তখন প্রবল বর্ষণের রূপ নিয়েছে।

'আবার জল এলো।' কর্কশ চাপা গলায় রহমতুল্লা আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা গালাগালি দিলে। লম্বা চুল দাড়ি থেকে জলের ধারা ঝেড়ে ফেলে বললে, 'এবার ঝড়টা কমবে বোধ হয়।'

'আশা হচ্ছে।' তার সঙ্গীটি দম চেপে চেপে বললে।

'আশা!' রহমতুল্লা কটমট করে তাকালো তার দিকে—দাঁতে দাঁত চেপে পরম আক্রোশে বলে উঠলো, 'তোর কোনো আশা নেই! তোকে আমি বেঁচে থাকতে দেবো না।'

'কেন ? আমার দোষ কী ?'

'তুই বোটে ছিলি—তুই সব দেখেছিস। তুই বেঁচে ফিরে গেলে সব খবর আবার জানাজানি হয়ে যাবে ! আবার তারা আমার পেছনে ধাওয়া করবে। আবার সেই দশ বছর—কি বিশ বছর, দ্বীপান্তর অথবা ফাঁসি। উঃ আল্লা ! ভাবতে পারি না।' দাঁতে দাঁত চেপে ডান হাতের অসহ্য যন্ত্রণাটাকে চেপে রহমতুল্লা বলে উঠলো, 'তোকে এখুনি শেষ করে দেবো।'

রহমতুল্লার হাতে হাত ঘষা ও অস্ফুট একটু কাতরানি শুনে লোকটি বললে ধীর গলায়, 'হাতটা কি ভেঙে গেছে ?'

রহমতুল্লা একটা ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মতো হলদে হলদে দাঁতগুলো বের করে খ্যাঁক করে উঠলো, 'বটে ! বুঝতে পেরেছিস ? খুব ধড়িবাজ তুই।' গলা চেপে ধরার মতো মুদ্রা করে অন্ধকারে সে তার পেশল বলিষ্ঠ বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলে লোকটির দিকে। বললে, 'এই একটা হাতই তোর জন্যে যথেষ্ট—মনে রাখিস।'

তবু ওই হিংস্র জানোয়ারের দেহটা কাঁপছে ঠিক মানুষের মতই—কাঁপছে তার সঙ্গীও। অঝোর ধারায় নেমেছে বৃষ্টি—ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছে সারা দেহ। ওদের দু'জনকে ঘিরে গাঢ় অন্ধকারের ওপরে প্রবল বর্ষণধারার একটা পুরু আবরণ ঢেকে দিয়েছে যেন। ঝড় থেমে গেছে। থেমে গেছে বিক্ষুব্ধ জলরাশির তরঙ্গিত আলোড়ন। তবু তরঙ্গ আছে—মোহানার নদী, কিছু দূরে উপসাগরের মুখ। বড় বড় ঢেউগুলো এসে দুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ওদের। শুধু তার রুদ্র তাণ্ডব কিছুটা স্তিমিত। ওরা দুজনই কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে।

ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক সেই লোকটি ভারী গলায় বললে, 'তোমাকে আমি অনেক অনেক টাকা দেব বলেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে রহমতুল্লা বলে উঠলো, 'চাইনে টাকা।'

'তবে ? কী চাও তুমি বল।'

'আমি বাঁচতে চাই !' কোন অতল অন্ধকারের গভীর থেকে গভীরতর গলায় বলে উঠলো রহমতুল্লা—গলা তার ওই কথাগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে কেঁপে উঠলো। হয়ত শীতে—অথবা আবেগে। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'আর তার জন্যেই তোকে শেষ করে যাব।'

লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'তাতেই কি তোমার বাঁচবার পথ পরিষ্কার হবে ?'

'কেন হবে না ! আর তো কেউ জানবে না।'

'জানবে বৈ কি।' লোকটি খুব বুদ্ধিমানের মতই আস্তে আস্তে বললে, 'আজ যদি বেঁচে তুমি কোনো চরে কি কোনো গাঁয়ে গিয়ে ওঠই—সেখানকার লোক তোমাকে চিনে ফেলবে। গাঁয়ের কুকুরগুলো পর্যন্ত তোমার পেছনে লাগবে। তারপর বেখাপ্‌পা তোমার ওই চুল দাড়ি, পরণে তোমার খাটো জাঙিয়া, গলায় আসামীর নম্বর দাগা চাকতি—'

'বটে বটে! সব বুঝে ফেলেছিস দেখছি। তুই আমাকে ঘাবড়ে দিতে চাচ্ছিস্—খুব ধড়িবাজ তুই। আর একটু সবুর কর—একটু সামলে উঠি। তারপর'··· রহমতুল্লা থেমে গেল।

'ভেবে দেখ—অনেক টাকা'—

'তারপর?' রহমতুল্লা বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, 'তারপর সারা জীবন ভয়ে ভয়ে আমি তোর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকি—কখন তুই সব কথা চাউর করে দিস। যেমন করে চারবার ধরে এনেছে আমাকে—তেমনি আবার'—একটু থেমে সে মাথা ঝাঁকি দিয়ে চাপা গলায় বললে, 'আমি বাঁচতে চাই—নিশ্চিন্তে শুধু বাঁচতে চাই এবার। কোনো গাঁয়ে গিয়ে—মাটি চষে। কতদিন কেটে গেছে—ধরে রেখেছে ওরা!' রহমতুল্লা তার মোটা মোটা আঙুলগুলো গুণতে লাগলো, 'প্রথম সেই বারো বছর, তারপর চারবার পালানোর শাস্তি—এই হলো বিশ বছর—শেষ দ্বীপান্তর।···এবার আমার শেষ সুযোগ।' বিড বিড করে আত্মনিমগ্ন কণ্ঠে বললে, 'শেষ সুযোগ। সেই অনেক দিনের কোনো গাঁয়ের কথা—যার কথা আমি কতদিন ভেবেছি, সেখানে সেই একটা সামান্য কুঁড়ে ঘর—ধর তোর বৌ বাচ্চা বেটি—আল্লা!'···কর্কশ গলা কেঁপে উঠল রহমতুল্লার।

'সেই বৌ বাচ্চা বেটি তোমার কোথায়! তাদের তুমি খুন করেই বারো বছরের জন্যে জেলে গিয়েছিলে না? তারপর চারবার পালাবার চেষ্টা করেছ। এবার তোমাকে চিনেছি···রহমন—না রহমতুল্লা।'

এই অপরিচিত লোকটার মুখে তার নাম শুনে চম্‌কে উঠলো রহমতুল্লা। বললে, 'কে—কে তুই!'

'তুমি চিনবে না রহমতুল্লা। তোমার বুড়ো মা চিনতো।'

'এ্যাঁ, কে তুই?'

'আমি? যে তোমার বুড়ো মায়ের কান্নাকাটিতে একদিন ফাঁসির বদলে শুধু জেলের ব্যবস্থা করেছিল।'

'মন্ত্রী! তুমি সেই মন্ত্রী!'—

রহমতুল্লার চম্‌কানো প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না। আস্তে আস্তে সে বললে,

'শুনেছিলাম বটে তু…তু…তুমিও এই জাহাজে কোথায় কি দেখতে যাচ্ছ। নতুন কারখানা না জাহাজঘাট না হাসপাতাল।'

তার সঙ্গীর কাছ থেকে তখনও কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

রহমতুল্লা গুম্ হয়ে বসে রইলো। ভাঙা নৌকোর ফালিটা তাদের ঢেউয়ের মাথায় দুলে দুলে কোথায় চলেছে তার ঠিক ঠিকানা নেই। প্রবল বর্ষণধারার মধ্যে বসে বসে কাঁপছে দুটো মূর্তি। ডান বাহুর ওপরে বাঁ হাতটা চেপে রহমতুল্লা একটা তীব্র যন্ত্রণা চাপবার চেষ্টা করল—যাতে তার সঙ্গী কিছু জানতে না পারে। তবু একটা অস্ফুট আর্তনাদ ঝরে পড়লো। হাতটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে।

তার সঙ্গী বললে, 'হাতটা বোধহয় তোমার ভেঙেই গেছে রহমতুল্লা। দেখি—কোথায় ভাঙলো।'

রহমতুল্লা বললে মাথা ঝাঁকিয়ে, 'চাইনে তোমার দয়া। আজ তোমারও যে হাল—আমারও সেই হাল।' রহমতুল্লা হেসে উঠল।

'তবু তো একদিন আমি ডাক্তার ছিলাম'—

'জানি। জেল থেকে অনেক কথা, অনেক কীর্তি শুনেছি তোমার। তোমার হাতে অনেক লোক মরেছে—কতদিন ধরে তুমি কত মড়াও কেটেছ। কিন্তু একটা জ্যান্ত মানুষের যন্ত্রণার তুমি কী বোঝ? তুমি আমার চেয়েও পাথর হয়ে গেছ। তুমি আমার চেয়েও খারাপ—ঢের ঢের খারাপ, একটা খুনী।'

সকৌতুকে রহমতুল্লার সঙ্গী একটু হাসল। বললে, 'তবু আমি আমার নিজের ছেলেমেয়ে বৌয়ের গলা টিপে মেরে ফেলিনি।'

'তাই বুঝি অন্যের ছেলেমেয়ে বৌয়ের ওপর দেশজুড়ে গুলি চালিয়ে গেছ?' রহমতুল্লা কর্কশ গলায় হেসে উঠল। বললে, 'হিসেব করেছ কখনো, কত জন আজ পর্যন্ত মরেছে তোমার রাজ্যে? জেল থেকে সে-সব শুনতে পেতাম। হাঃ, হাঃ হাঃ—তুমি আমি আজ সমান।' উৎকট এক খ্যাপামিতে রহমতুল্লা হাসতে লাগলো।

'তোমার মতো নিজের হাতে খুন করিনি আমি—তাই আমার মনে তোমার মত পাপের যন্ত্রণা নেই। শান্তি আছে।'

রহমতুল্লা বাধা দিয়ে বললে, 'শান্তি নয়—পাপ, তুমি আরও পাপী। তুমি তো ডাক্তার, জানো না তুমি খিদের জ্বালায় নাড়ি-ভুঁড়ি কেমন করে পাক দিয়ে ওঠে! আমি তাই খুন করেছি—মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বাঁচবার জন্যেই আজ আমি তোমার সঙ্গীদের খুন করেছি—যাতে কেউ না জানতে পারে আমার কথা।—আর তুমি? একটা পাকা খুনীর মন আর মতলব নিয়ে সে পাপ তুমি করিয়েছ অন্যকে

দিয়ে—তোমার গরীব পুলিসকে দিয়ে। মাস মাস কটা টাকার বদলে তাদেরও তুমি হন্যে খুনী বানিয়েছ।' রহমতুল্লা দম নিয়ে বললে, 'একটা হাত আমার এখনও ঠিক আছে খেয়াল রেখ। তোমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে সেইটেই যথেষ্ট।'

'তাতে তোমার লাভ?'

'লাভ?—আমার শান্তি—আমার নিশ্চিন্তে বাঁচার শান্তি।'

'সে শান্তি তুমি কোন দিন পাবে না রহমতুল্লা।'

'কেন পাবো না? চলে যাবো সেই অনেক দূরের গাঁয়ে—একেবারে নতুন মানুষ হয়ে কাটিয়ে দেবো জীবন। নাম বদলাবো—কাম বদলাবো'—

'তবু পুরাতন রহমতুল্লা মরবে না।' লোকটি জোর দিয়ে বললে, 'আমি ডাক্তার, আমি জানি। সে ধাওয়া করবে তোমাকে, সঙ্গে সঙ্গে ধাওয়া করবে তারা—যাদের তুমি খুন করেছ। তাদের কথা মনে করে তুমি চম্‌কে চম্‌কে উঠবে। তুমি যদি আবার সাদিও করো—তার মুখে, তার ছেলে-মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চম্‌কে উঠবে তুমি। তোমার ঘুমের মধ্যে তোমার সেই গলা টিপে মেরে ফেলা ছেলেমেয়ের মুখ দেখে পাগল হয়ে যাবে তুমি।'

'তুমি এমনি স্বপ্ন দেখ না? তোমার হুকুমে মরে যাওয়া সেই কাচ্চাবাচ্চা মেয়ে মদ্দর বিকট চেহারা দেখে তোমার কী ঘুম ভেঙে যায় না?'

'আমি খুন করি না—রাজ্য শাসন করি।'

'তুমি জ্ঞানপাপী—ওই সব কথা বলে তুমি মানুষ খুন চাপা দিতে চাও। তুমি আরও খারাপ।' একটু থেমে রহমতুল্লা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি কখনও কেঁদেছ?'

'না। কাঁদে ভীরু আর স্ত্রীলোক।'

'জান, আমি কাঁদি—তোমার গারদে ষোল বছর ধরে কেঁদে কেঁদে উঠেছি আমি—চম্‌কে উঠেছি ঘুমের মধ্যে—ওই যাদের কথা বললে তাদের মুখ দেখে। তারপর দিনে দিনে আমাকে পাষাণ করে দিয়েছে।—'

চুপ করে যায় রহমতুল্লা। নীরব বর্ষণের মধ্যে শোনা যায় সামান্য একটু ফোঁপানী।

তার সঙ্গী জিজ্ঞেস করলে, 'কাঁদছ রহমতুল্লা!'

'হ্যাঁ, কাঁদছি। তুমি কাঁদতেও পারো না। এত বড় খুনী তুমি।'

এই সময়ে ওদের নৌকোর ফালিটা একটা প্রচণ্ড পাকে ঘুরে গেল। কানের

কাছে গর্জন করে উঠলো তীব্র জলকলোচ্ছ্বাস। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরছে মনে হলো।

'ঘূর্ণি! আল্লা!'

'রহমতুল্লা! ধ—রো, রহমৎ…' একটা আর্তনাদ ফেটে পড়লো সেই বৃষ্টিভেজা অন্ধকারে।

'জাহান্নমে যাও। তুমি মরতেও ভয় পাও।'

'রহ—মৎ'…

প্রবল জলোচ্ছ্বাসের শব্দে ডুবে গেল সে কণ্ঠ! জমাট অন্ধকারের বোবা ভাষার মতো বিরাট একটা আবর্তের মধ্যে অশ্রান্ত গর্জনে ভেঙে পড়ছে প্রবল স্রোত-ধারা! পাক খেতে খেতে নির্মম বিদ্রূপের মতো ছল্‌ছল্‌ করে হেসে ছুটে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউয়ে। এই ঢেউয়ের ধারা হারিয়ে যাওয়া দুটো দেহকে আগামী কাল কোথায় কোন গাঁ বা চরের প্রান্তে টেনে নিয়ে যাবে কে জানে! ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে যাবে হয়তো—কাল আর কেউ তাদের চিনতেও পারবে না। শুধু তাদের অন্ধকারের নাটকটা অন্ধকারেই দাগা হয়ে থেকে যাবে।

কল্পনা ও পরিকল্পনা

আশ্চর্য মানুষের স্মৃতি আর বিস্মৃতি। কত ঘনিষ্ঠতম আলাপের পর এক একটা মানুষ মন থেকে একেবারে নিঃশেষে মুছে যায়। আর এমন মানুষও থাকে— যার দূর থেকে ভেসে আসা গলার একটুখানি স্বরই যথেষ্ট। সেই স্বরটুকু তোমার জীবনের স্মৃতি বিস্মৃতি সব তোলপাড় করে তুলতে পারে—একটি পলকে যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ তাজা একটা জীবনখণ্ডকে তোমার সামনে এনে হাজির করে দেয়।

সুব্রত তেমনি।

জেনানা কামরা নয়—খাস মর্দানা। তারই এক পাশের এক বেঞ্চিতে বসেছিলুম। অনেকগুলি পুরুষের মনস্ক ও অন্যমনস্ক দৃষ্টির সামনে একটি মেয়ের যেমন গাম্ভীর্যে বসা উচিৎ। বলা বাহুল্য, কামরার ভেতরে কোনো দিকে তাকাবার যো ছিল না। এদিকে ওদিকে আরও দু'চারটি মেয়ে বৌ যে ছিল না— তা নয়। আমার প্রায় সামনেই একটি বৌ বসেছিল তার দুটি ছেলে নিয়ে। কামরা জুড়ে এলোমেলো গাদাগাদি ভিড়।

এমন সময় সেই গলা:

'মেয়েরা একটা বেঞ্চিতে বসুন না, তা হলেই বসবার জায়গা হয়ে যাবে। শুনছেন—ও মশায়, আপনারা জনা তিনেক একটু উঠুন দেখি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ: 'এখানে আর জায়গা কোথায় মশাই।'

'হয়ে যাবে—দেখুন না ম্যানেজ করে দিচ্ছি।'

কবে যেন—কত দিন আগে আমি শুনেছিলুম এই গলা!

তাকিয়ে দেখি. ওমা—তাইত, সুব্রতই বটে। কোথা থেকে কতদিন পরে উদয় হলো ও! কামরাতে ঢুকতে না ঢুকতেই দেখি ওর স্বভাবসিদ্ধ 'ম্যানেজারি' সুরু করে দিয়েছে। 'উনি উঠে দাঁড়ান, উনি ওখানে বসুন, তিনি একটু সরে যান' ইত্যাদি।

ও আমাকে দেখেনি, দেখলেও চিনতে পারে নি, নইলে আমার ওপরও এমনি করে ম্যানেজারি করবার আগে একটু থমকাতো না কি! ও আমার কাছে এসে বললে, 'এ স্যুটকেশটা কার?'

মুচকে হেসে বললুম, 'আমার।'

'যদি কিছু মনে না করেন তো ওপরে তুলে দি।'

'আপনার অতো মাথা ব্যথা থাকে তো তুলে দিন যেখানে খুশি ; নামবার সময় কুলির মাথায় আবার তুলে দেবেন দয়া করে।'

'আরে ! মানে তু···তুমি'···সুব্রত এবার চিনতে পারলে। বললে, 'নইলে এমন কাটা কাটা কথা বলবে কে ? ভেতরে আত্মারাম ফোঁস করে উঠেছিল প্রায়।'

বললুম, 'আপাতত অন্যের ব্যবস্থা ছেড়ে দিয়ে নিজের বসবার জোগাড় করো।'

'তোমার পাশে বসবার চেষ্টা করলে—এত কাণ্ডের পর সারা কামরা বোধ করি আমার দিকে তেড়ে আসবে।' সুব্রত মাথা চুলকে সভয়ে কামরার কৌতূহলী মুখ-গুলোর দিকে একবার তাকালো।

আমি একটু সরে বসে জায়গা করে দিলুম। সুব্রত যেন খানিকটা সঙ্কোচেই বসল। মনে হলো আমাদের পুরোনো দিনগুলো একেবারেই পুরোনো হয়ে গেছে। আজকে পাশে বসতে বললেও সুব্রত সসঙ্কোচে বসে। কিন্তু সেই একযুগ আগে হলে ? সুব্রত কি ধন্য হয়ে যেত না ?

খানিক পরেই গাড়ি ছাড়ল। প্লাটফর্মের হৈ-হল্লা আর কামরার ভেতরের গোলমাল ও গুমোট কিছুটা কমল। দেখতে দেখতে গাড়ি হাওড়া স্টেশনের চাপা জটলা থেকে এসে পড়লো আলো আর মাঠের অজস্রতার মধ্যে।

সুব্রত চুপ করে ছিল। কি জানি, নীরবে মনের গহনে ডুব দিয়েছিল কি না। আমার মতো অনেক দিনের অনেক কথা ওর যদি মনে পড়ে যায়, সে আর আশ্চর্য কিছু না। আর এক পলকে অনেক কথা ভিড় করে এলে বোধ করি কোন কথাই বলা যায় না। তাছাড়া এমনি ভাবে যুগখানেক পরে প্রায় হঠাৎ দেখা হওয়া—তাও তো অপ্রত্যাশিত, আর এই জনতা এক্‌সপ্রেসের পাঁচ মিশেলি জনতার মাঝখানে !

মন আর অতীতের অতলতলা থেকে এক সময়ে ও বোধহয় ভেসে উঠলো। বললে, 'আশ্চর্য, কত দিন পরে দেখা অমলা, ভালো আছ ?'

ও যেন কতদূর থেকে কথা বলছে মনে হলো। ওর কথার ভঙ্গীতে এক দূরচারী আচ্ছন্নতা। সংক্রামক ব্যাধির মত তা আমাকেও আড়ষ্ট করে তুলল। ভেবেছিলাম সহজ ভাবে নেবো—যেমন সহজে ওকে প্রথমে দেখেই মন আজ সাড়া দিয়েছিল।

বললুম, 'আমি তো আছি এক রকম—এখন তোমার কথা বলো।' আর পোড়া অসংযত মুখ আমার, যে কথাটা প্রথম থেকেই জিজ্ঞেস করবো না ভেবেছিলুম—একান্ত মেয়েলি কৌতুহলে সেই কথাটাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'বিয়ে থা করেছ তো ?'

'তোমার কি মনে হয়'—বলে ও আমাকে এক ঝলক আপাদমস্তক দেখে নিলে। অর্থাৎ আমার কোথাও বিয়ের কোনো চিহ্ন আছে কিনা।

বিব্রত বোধ করলুম। একদিন ওর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু তাই বলে ও আমার জন্যে আজও একক ও অনন্য হয়ে থাকবে—শুনতে মন্দ লাগে না বটে কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই নভেলি। তবু আমাদের এই প্রেমের ক্ষেত্রে আমি উত্তমর্ণ—কারণ ও প্রত্যাখ্যাত। বলা বাহুল্য, তেমন প্রেমিককে বহুদিন পরে দেখলে কোন্ মেয়ের না কৌতুক বোধ হয়! আজও তেমনি উত্তমর্ণার জোরে আমার জিভের জোর বেড়ে গেল। বললুম, 'না করে থাকলে আর করবে কবে?' ওকে একবার চোখে বুলিয়ে নিলুম। সেই একযুগ অন্তে বয়েসটা বেশ বেড়েই গেছে—তার চিহ্ন তো মাথার চুল থেকে কোমরের উর্ধ্বভাগ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট।

সুব্রত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। মনে হলো কিছু ভাবছে। আমার ভারি মজা লাগছিল। ওর করুণ গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই একদিনের কথা মনে পড়ছিল—যেদিন ও পুরো একটি যুগের জন্যে আমার সেই পড়ার ঘর থেকে বিরস মুখে জোর করে একটু হাসি টেনে বিদায় নিয়েছিল—এমনি করুণ, গম্ভীর, পরাজিত। সেদিন চোখে ছিল বিরাট এক মহিমার নেশা আমার --তার কাছে ওর প্রেমের আবেদন ছিল একান্তই ক্ষুদ্র ও ব্যক্তিগত। আজ মায়া হলো। বললুম, 'না বললে থাক। শুনতে চাইনে ও কথা। এখন বলো কোথায় কি করছো।'

ওর ওই করুণ গম্ভীর মুখের আড়ালে সুব্রত বোধহয় ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল। হঠাৎ একটু ভারিক্কি হাসি হেসে ও বললে, 'বলছি বলছি – সবই বলছি একে একে। চেপে যাওয়ার মতো কোনো অপরাধ জ্ঞানবুদ্ধি মতো করিনি। এখন শোনো তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর।'

'বলো।'

'বিয়ে করেছি—সেও তো পুরানো হতে চললো।'

'বৌ কোথায়?'

'আপাতত কলকাতায় তাঁর বাপের বাড়িতে রেখে চলেছি।'

'ছেলেপুলে হবে বুঝি?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলুম।

'না। ওখানে পরিবার পরিকল্পনা সজোরে মানি।' সুব্রত জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললে, 'আমার একটি ছেলে, একটি মেয়ে। একটি দশ, একটি আট। ওরা দার্জিলিঙে কনভেন্টে পড়ছে।'

চমকে বললুম, 'সে যে এক কাঁড়ি টাকার ব্যাপার!'

'তা কিঞ্চিৎ।' বলে এমনভাবে হাসলে যেন ব্যাপারটা এমন কিছু না। তারপর যেন পরোক্ষে আমাকেই আক্রমণ করে বললে, 'বৌয়ের কথা আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

বললুম, 'সে তো তুমি বলবে।'

ও বললে, 'টাকার কথা বলছিলে—তা আমার স্ত্রীও বসে নেই। এলাহাবাদে অধ্যাপনা করে। ওর মা অসুস্থ, তাই ওকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে গেলুম।'

বললুম, 'যাই হোক, সংসার দিব্যি গুছিয়ে বসেছ বলো।'

'এক রকম।'

চুপ করে তাকিয়েছিলুম বাইরের দিকে—আর কি জিজ্ঞেস করবো! বারো বছর পরে শুনলুম—সুব্রত বেশ ভালো আছে। অথচ মাঝখানে কোন এক পুরাতন বন্ধুব মুখে শুনেছিলুম—ও বিয়ে থা করেনি হতাশায়, অভিমানে। মেয়েদের ওপর বিশ্বাস নাকি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছে। পরিজন-বহুল একটা পরিবারও নাকি ওকে একেবারে ছন্নছাড়া করে দিয়েছে। আজ শুনছি—ঠিক উলটো। চাক্ষুষ দেখলুম: সেই ওর ম্যানেজারি চেহারা, লম্বায় প্রায় ছ ফুট। বয়স মুখটাকে কিছুটা হয়তো রুক্ষ করে দিয়েছে—বুড়ো করেনি। গায়ে বুশ সার্ট, পরনে ট্রাউজার, যা ছাত্রজীবন থেকেই দেখছি।

কি জানি কেন—মেয়ে-মন আমার ওর কথা আর শুনতে চাইছিল না। হয়তো এই জন্যে যে, সুব্যবস্থিত ওর জীবনের কথা শুনে আমার উত্তমর্ণা মন মজা করার মতো আর কিছু পাচ্ছিল না। দূরের দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম, 'ওই যে কি একটা মিনারের মতো দেখা যাচ্ছে—ওটা কী!'

ও বললে, 'নতুন পাওয়ার স্টেশন। এ পথে কত দিন আসনি?'

সেও তো এক যুগ। বললুম, 'অনেক দিন।'

'তা হলে কিছুই জান না—কত বদল হয়ে গেছে দেশ। দেখছ না—কত বাড়ি-ঘর, কোয়ার্টার···ফ্যাক্টরির পর ফ্যাক্টরি!'

'দেখছি তো! ওমা ওটা কী? ওই যে'—

'ব্লাস্ট ফারনেস। নতুন ইস্পাত পরিকল্পনা···'

'সত্যি, এসব তো কিছুই জানতুম না। এত বদলে গেছে সব—মনে হচ্ছে নতুন কোন দেশ দিয়ে যাচ্ছি।'

সুব্রত এতক্ষণে জিজ্ঞেস করলে—(তবু ভালো যে জিজ্ঞেস করার কথাও তার মনে এলো) বললে, 'তুমি আছ কোথায়?'

ঠোঁট উলটে বললুম, 'লক্ষ্মীকান্তপুর—ষষ্ঠীতলার ইস্কুল। আমার কথা বাদ দাও।'

'তা মা ষষ্ঠীর কৃপায় ছাত্র কতগুলি?'

'তা হবে—শ' দুই।'

'মো-টে!' একটু থেমে প্রায় ফুৎকার দিয়ে বলে উঠল, 'ওয়েস্টেজ—ওয়েস্টেজ—কি বলে, একেবারে অপচয়। তোমার মতো মেয়ে! তা ওখানে আছ কত দিন?'

'তোমার অদৃশ্য হওয়ার পর।' পুরানো ব্যথায় একটু খোঁচা দিয়ে সকৌতুকে বললুম, 'সে-ও তো এগার-বার বছর হয়ে গেল।'

'ইস্—কী ভয়ানক।' ও যেন আঘাত সুদে আসলে ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'এই এ-গা-র বা-র বচ্ছর সেই কোন ধ্যাদ্ধেড়ে ষষ্ঠীতলায় পচে মরছ? আমি ভাবতে পারছিনে অমলা।'

কী আর বলবো—চুপ করে রইলুম।

সুব্রত পাল্টা সকৌতুকে হেসে বললে, 'আমার কথা তো আব কিছুই জিজ্ঞেস করলে না?'

আবার বললুম, 'সে তো তোমার বলার কথা।'

সুব্রত যেন চড়াও হয়ে বললে, 'সামান্য ডেভেলপমেণ্ট অফিসার। কর্মস্থল এখন দিল্লী—মানে বর্তমান রাজধানী। বৌকে রেখে ফিরে চলেছি। আসছে ডিসেম্বরেই আবার পৃথিবী পরিক্রমার ঘোড়দৌড়।'

'মানে?'

সুব্রত তার অফিসারী গাম্ভীর্য আর কৃত্রিম বিরক্তিতে বললে, 'আর বলো কেন—গুরু দায়িত্বের ঠেলা। লোকে ভাবে অতবড় অফিসার—কি সুখেই না আছে। বৌ ছেলেমেয়ে ছেড়ে এখন ছোটো—দেশদেশান্তর, কোথায় ইংল্যাণ্ড আর কোথায় আমেরিকা, কে কী ভাবে কতখানি উন্নতি করলে গ্যাখো, শেগো, প্রয়োগ কর।'

বললুম, 'তবু তো এ আনন্দের কথা সুব্রত—দেশ গড়ার কিছু ভার তোমার ওপর।'

ও চোখ কুঁচকে বললে, 'তা বটে। তবে কি জান, 'মাঝে মাঝে ভালো লাগে না। কোথায় রইল ছেলেমেয়ে বৌ পড়ে, আর আমি ছুটছি—ছুটছি—ছুটছি। ভালই হোলো তোমার দেখা পেয়ে। এবার স্ত্রীও বায়না ধরেছেন আকাশ পাড়ি দেবেন। ভাবনাই হয়েছিল ছেলেমেয়ের জন্যে। এখন নিশ্চিন্তে তোমার ওই যে

কি, ষষ্ঠিতলার ইস্কুল, নিশ্চিন্তে ওইখানে রেখে যেতে পারা যাবে।' বলে ও অট্টহাস করে উঠল।

হায়রে সামান্য ষষ্ঠিতলা ইস্কুলের মাস্টারনী! কি মোহে যে ছুটেছিলে একদিন এমন লোককে প্রত্যাখ্যান করে, দেশের ছেলে গড়বে, মেয়ে গড়বে! সে গড়ার ছিরি আর ছাঁদ যে কী—তা ঈশ্বরকেই মালুম। আপাতত সুব্রতর পাশে বসে রেল লাইনের দুপাশে সুব্রতদেরই জয় ঘোষণা দেখছি এবং শুনছি। গগনস্পর্শী চিমনির মিনার, ফারনেস, ফ্যাক্টরি, কোয়ার্টার, কলোনি। এ ছিল পরিচিত পুরাতন পথ—আজ মনে হচ্ছে নতুন। কত পরিবর্তন যে হয়েছে! এতদিন পরে ফিরছি সেই পথে—চিনতে কষ্টই হচ্ছে।

এক্সপ্রেস ছুটছে। তার সঙ্গে ছুটেছে কত কথা কত পুরাতন দিনের। আমার শিক্ষক পিতা···সেই এক মফঃস্বল শহর···সুব্রত···সুব্রতর ভালোবাসা। এতদিন পরে সুব্রতর সঙ্গে দেখা—সুরু করেছিলুম বিজয়িনীর কৌতুক দিয়ে। স্বীকার করতে লজ্জা নেই—এখন মনে চেপে বসছে পরাজিতার বিষণ্ণতা। বাইরের দিকে তাকিয়েছিলুম।

সুব্রত যেন সকৌতুকে বললে, 'কি দেখছ অত বাইরে? জায়গাটা চিনতে পার?'

'কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে।'

'সেই পদ্মবিলের কথা মনে পড়ে?'

'ওমা, তাই তো! সেই যেখান থেকে একবার তুমি আমার জন্যে পদ্ম তুলে নিয়ে গিয়েছিলে!'

'হ্যাঁ।'

এই পথে যেতে যেতে একবার বলেছিলুম, 'আহা, কি সুন্দর পদ্মগুলো সুব্রত, ইচ্ছে হচ্ছে আঁচল ভরে তুলে নিয়ে যাই।' তখন কলেজে পড়ি আর সুব্রত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। সত্যি সত্যি তারপর একদিন দূরের কোন স্টেশনে নেমে ট্রাউজার গুটিয়ে মাটি কাদা মেখে পদ্ম তুলে নিয়ে গিয়ে হাজির সুব্রত। সে একদিন গেছে। বললুম, 'কিন্তু পদ্ম কই - বিল কই সুব্রত?'

'আপাতত রেলওয়ে ওয়ার্কসপ—আর কোয়ার্টার। বিরাট সেই পদ্মবিলের জলা জুড়ে আজ প্রায় চার হাজার মানুষ বাস করছে—কাজ করছে।'

কৌতুক করে বললুম, 'কিন্তু আমার পদ্ম?'

অট্টহাস করে সুব্রত বললে, 'বাস্তবিক কী উল্লুকই ছিলুম অমলা। আজ তুমি কোথায় তোমার ষষ্ঠিতলায়, আর আমিই বা কোথায়?'

মনে মনে বললুম – তুমি যথাস্থানে, রাজধানীতে সুব্রত। পাছ-দরজায় সামান্যা এই মাস্টারনীকে সে কথা বলে লজ্জা দিও না আর। কবে ওর প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলুম—সেই জোরে অতবড় এক অফিসারকে নিয়ে আজ ঘাঁটাঘাঁটি করা আর নিরাপদ নয়। জীবন যুদ্ধে ওর জয় ওকে সোচ্চার করে তুলেছে।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য এক প্রসঙ্গ পাড়লুম। সে ওর ডেভেলপমেণ্ট। গড় গড করে ও যে কত কী বলে গেল। কোথায় জলবিদ্যুতের প্রকাণ্ডকায় বাঁধ, কোথায় রাক্ষুসে ইস্পাতের কারখানা, কোথায় ব্রিজ, কোথায় টাওয়ার – কী উন্নতি, কী অসামান্য পরিবর্তন। মনে হলো – কোথায় পড়ে আছি কচ্ছপের খোলের মধ্যে সেই ষষ্ঠিতলা ইস্কুলে !

সুব্রত ঠাট্টা করে বললে, 'অন্ধকারে চিত্তরঞ্জন দেখে আর তার নানা রঙের আলোর রোশনাই দেখে ভেবে বসো না যেন কালিপুজো হচ্ছে।' বলে আবার অট্টহাস।

ওর আজ হাসিতে তীর, কথায় তীর, ওর ভঙ্গীতে তীর সমুদ্যত। তখন মনে হচ্ছিল – যা হয় হবে, পরের স্টেশনেই নেমে যাব। বাণবিদ্ধ হরিণ কেমন ছটফট করে জানিনে – আমার বোধ করি সেই অবস্থা। এমন সময় এক ঝলক দক্ষিণা হাওয়ার মতো একটা দোতারা টুং টাং করে বেজে উঠলো কামরার ভেতরে। আশ্বাসে চোখ ফেরালুম এবং চমকে উঠলাম।

এক্সপ্রেস গাড়ি। ক্যানভাসারের বড় ঝালাপালা নেই, তবে ভিক্ষুক বৈরাগীর আক্রমণ আছে। অদূরে বেঞ্চিতে বসে গেরুয়াপরা এক বৈরাগী দোতারায় দিয়েছে ঝংকার। অঙ্গে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি। বাস্তবিক – জীবনে এমন এক-একটা দিন আসে, এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে যা বানানো গল্প উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর। নইলে প্রায় বার বছর পরে এই পথে যেতে যেতে সুব্রতর সঙ্গেই বা দেখা হবে কি করে—আর ওই দোতারা হাতে বৈরাগী !

সুব্রত লক্ষ্য করেছিল আমার চমকানি, আমার সাগ্রহ বিস্ময়। বললে, 'কি ব্যাপার – বৈরাগীকে অত দেখছ কী ?'

প্রায় দম চেপে বললাম, 'আমি যে ওকে চিনি।'

সামান্য কে একটা বৈরাগী, তাকে চেনে সামান্য একজন মাস্টারনী – সে আর এমন কী একটা ব্যাপার ! তাই বোধ করি সুব্রত একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসির টান দিলে। কিন্তু সুব্রত যদি জানতো – ও কে, যদি জানতো – তাকে একদিন প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে ওই বৈরাগীদের পরোক্ষ প্রভাব ছিল কতখানি !

আমার বৈরাগী তখন দোতারার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুরের চাপা একটা গুঞ্জন

তুলেছে—আর সুব্রত পাশ থেকে সুরু করেছে ভিক্ষুক সমস্যার ওপরে লম্বা বক্তৃতা। অসহ্য।

'চুপ!'

মুখ দিয়ে চাপা ধমকের মতো বেরিয়ে এল আমার। সুব্রত অবাক হয়ে তাকাল আমার দিকে।

লজ্জিত সপ্রতিভ হয়ে বললাম, 'জানো ও কে?'

সুব্রত তাচ্ছিল্যভরে বললে, 'দেখছি তো ভিখিরি বৈরাগী।'

দীপ্ত কণ্ঠে বললাম, 'না। ওকে অত সামান্য ভেবো না। মুকুন্দ দাসের নাম শোনোনি? সেই যে স্বদেশী যাত্রা গেয়ে গেয়ে ফিরতেন সারা দেশে?'

'উনিই বুঝি তিনি?'

'কী যে বলো!' বললুম, 'তিনি তো কতদিন মারা গেছেন। উনি তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন।'

'তুমি চিনলে কি করে?'

সে এক পুরাতন কথা। বাবার ছাত্ররা একদিন সোৎসাহে পাকড়াও করে এনেছিল কোথা থেকে। ওঁদের যাত্রার দল তখন ভেঙে গেছে। বাবার আনন্দের সীমা ছিল না ওঁকে পেয়ে। আমাকে ডাক দিয়েছিলেন, 'দেখবি আয় খুকি—কে এসেছে।'

বাবার মুখেই শুনেছিলাম ওঁর পরিচয়। মুকুন্দ দাসের পাশে দাঁড়িয়ে যে সব কিশোর একদিন গলায় নানা জনের দেওয়া মেডেলের মালা পরে গেয়েছে রক্ত-উদ্বেল করা গান, অজ গাঁ থেকে শহর পর্যন্ত চঞ্চল করেছে পরাধীন মানুষকে—সে তখন যুবক। রোগাটে তীক্ষ্ণ চেহারা—ভরাট দরাজ গলা। সেদিনও গায়ে ছিল এমনি গেরুয়া, এমনি পাগড়ি। দীপ্ত ওর পেছনের ইতিহাস, ওর তামাটে গায়ের রং আর গেরুয়ায় মিলে কী এক অপূর্বতা সৃষ্টি হয়েছিল কে জানে—আমার মনে তার রং আজও স্পষ্ট। তখন আমার বয়সই বা কত—পনেরো কি ষোল। সুব্রত জানে না—আজও জানে না, ওই বৈরাগী চারণরাই আমার কাঁচা যৌবনের প্রথম পুরুষ, আমার বীর, আমার কল্পলোকের নায়ক।

সুব্রতকে বললুম, 'বাবার মুখেই শুনেছিলুম—অল্প বয়স থেকে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে উনিও অনেক জেল হাজত ঘুরেছেন।'

সুব্রত বললে, 'এখন বুঝি ওই গান গেয়ে ভিক্ষে করে খায়?'

সুব্রতর কথা বড় তীব্র। আর আমারও তো লজ্জার অবধি নেই। কী উত্তর দেবো? বাবার মুখে শুনেছিলাম—যাত্রার দল ভেঙে যাওয়ার পর চারণের মত

গান গেয়ে বেড়ানই ওদের ব্রত। নিঃস্বতার, শূন্যতারও এক-একটা মহিমা আছে—ডেভলপমেণ্ট অফিসার সুব্রত তা বুঝবে কী! বোঝাতেও চেষ্টা করলুম না। দোতারার সঙ্গে মেলানো গলার গুঞ্জরণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললুম, 'চুপ কর। শোনো—গান গাইছেন।'

আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইলুম। সেই সব গান! আমার জীবনের নিঃস্ব শূন্য দিগন্ত ভরা গান। সে যে আমার কাছে কী—ওই গেরুয়াপরা বৈরাগী চারণও হয়ত তা জানে না।

দরাজ গলায় গানের প্রথম কলি সারা কামরাটাকে মুখরিত করে তুললে।

কিন্তু কই সে গান!

সুব্রত বললে, 'এঃ—এ যে রামপ্রসাদী।'

বানিয়ে মুখ রক্ষা করলুম, 'ভেবেছেন হয়তো সে গান আজ চলবে কিনা। দেশ আজ স্বাধীন—চারিদিকে তোমার উন্নয়ন।'

মূর্খ সুব্রত আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলে।

কিন্তু তখনও বোধ করি আমার দুর্দশার শেষ হয়নি। কতবার চোখাচোখি হল।—আশ্চর্য! পাহাড়িপুরের সেই পুরা এক স্বদেশী মাস্টারের মুগ্ধ বিহ্বল স্বদেশাবেগপ্লুত মেয়েটিকে বৈরাগী চিনতেও পারল না। ও কী জানে, আমার শিক্ষক বাপ জীবনে ত্যাগের প্রেরণা যতটা দিয়েছে, তার চেয়ে, পথে টেনে বের করে নিঃস্বতার মহিমা বুঝিয়েছে ওই চারণ বৈরাগীরা ঢের বেশী। আমি শূন্য চোখে আজ শুধু তাকিয়ে দেখছি।

গান শেষ হলো।

সামনে একটি বুড়ি দুটি হাত জোড় করে কপালে ঠেকালো। তারপর আঁচল থেকে দুটো পয়সা খুলে বৈরাগীর হাতে দিতে গেল।

বৈরাগী বললে, 'ভিক্ষা আমি নিই না মা।'

শুনে বুকের রক্ত আমার চল্‌কে উঠলো। হায় রে, এতদিনেও আমার ভেতরে কী সেই পনেরো ষোলো বছরের খুকিটা মরেনি?

আমি দীপ্ত চোখে তাকালুম সুব্রতর দিকে—অর্থাৎ শোনো সুব্রত আমার চারণের কথা—সে ভিখারী নয়!

ওদিকে বুড়ি ছাড়বে না কিছুতে—পয়সা দেবেই। পবিত্র ঠাকুর দেবতার নাম শুনেছে যে।

আমার বৈরাগী শেষ পর্যন্ত পয়সা কটা নিয়ে বললে, 'দিন, কিন্তু প্রতিদানে কিছু আপনাকে নিতে হবে মা। খরচায় অবশ্য আমার পোষাবে না। তা হোক।'

—বলে একটা শিশি বের করে তা থেকে কয়েকটা বড়ির মতো কি বুড়ির হাতে তুলে দিলে। বললে, ‘আমলকির বড়ি—হজমিকারক।’

আমি স্তব্ধ।

তারপর দেখি বৈরাগী আমার শিশি হাতে উঠে দাঁড়িয়েছে। বললে, ‘আমি গান গেয়ে আপনাদের কাছে ভিক্ষে করতে আসিনি। এই যে দেখছেন হাতে আমার শিশি—এতে আছে আমলকির বড়ি। আপনারা জানেন নিশ্চয়ই—’

ফ্যাকাসে মুখ করে বাইরে তাকিয়ে দেখলুম।—হে ভগবান, আমার স্টেশন আর কতদূর! আর যে পারি না। ট্রেনের গতি যেন কমে আসছে না! তাই তো। ওই তো সিগনেল পোস্ট পার হলো। ওই তো প্ল্যাটফর্মের প্রান্ত!

‘ভালো হজম হয় না। খাওয়ার পর ঢেঁকুর ওঠে। প্রাণ আই-ঢাই করে। রাত্রে ঘুম হয়না। পেটে বায়ু’…

গাড়ি থামল। নেমে পড়লাম। জিনিসপত্র নামিয়ে দিতে সুব্রত সাহায্য করলে।

কামরার ভেতরের বক্তৃতা তখনও কানে তীরের মত বিঁধছে:

‘…পেট ভুটভাট্ করে…ভ্যাপ্‌সা ঢেঁকুর ওঠে…কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না…’

কুলিকে মালগুলো দেখিয়ে বললুম, ‘তাড়াতাড়ি চলো।’

বিদায় নিয়ে সুব্রত বললে, ‘স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনো ডেভেলপমেণ্ট প্রোজেক্ট যদি কখনো দেখতে যেতে চাও’—

ওঃ, সেই ফ্যাক্টরি, টাওয়ার, ব্রিজ, বাঁধ…

মুখ ঘুরিয়ে বললাম, ‘কিন্তু মানুষগুলো কতটা বদলাতে পেরেছ সুব্রত?’

প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে এলুম বাইরে সুব্রতর জবাব শোনার আগেই।

জোরু গোরু গারদ

খালের এপার ধানেশ্বরী—নির্ভেজাল চাষীর গ্রাম।

খালের উঁচু পাড়ের ওপর দাঁড়ালে আদিগন্ত প্রায় সবটুকু দেখা যায়। একটানা আবাদের আশে পাশে এখানে ওখানে ছড়ানো ছন্নছাড়া মাথা নীচু ছোট ছোট কুঁড়ে—ছিরিছাঁদের বালাই নেই। সজীব সবুজ ধেনো আবাদের মাঝখানে পচা খড়ের বিবর্ণ চালাগুলো—যেন হুমড়ি খেয়েপড়া মানুষের মতো কোনো রকমে বুক ঘেঁষটে মাথা ঠেলে উঠতে চাইছে।

খাল পাড়ের প্রায় গা ঘেঁষে প্রথম ঘর নন্দলালের। ভদ্র আধাভদ্র করে প্রায় জনা দশ পনেরোর একটা দল এসে দাঁড়ালো নন্দলালের কুঁড়ের সামনে। একজনের হাতে নিশান বাতাসে উড়ছে পৎ পৎ করে।

'নন্দ আছিস—নন্দ!'

চেনা চেনা গলার জলদগম্ভীর ডাক। তটস্থ নন্দ বেরিয়ে এলো কুঁড়ে থেকে এবং এক সঙ্গে অতগুলো লোকের ভিড় দেখে প্রায় দিশেহারা হয়ে গেল। তার ওপরে একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে সদানন্দ রায়—বড় বড় চোখ দুটো চেয়ে আছে তার দিকে, গোছা গোছা পাকা গোঁফের ভেতরে ঠোঁট দুটি একেবারেই আড়াল; মুখের ভাব কিছুই বোঝার উপায় নেই। নন্দের মনে হলো—যেন বড় রায়মশায় আদালতের নাজির পেয়াদা নিয়ে বাঁশগাড়ি করতে এসেছে। নন্দ বিচলিত। টিপ করে পায়ের কাছে একটা গড় করলে।

মোলায়েম গলায় রায়মশায় বললে, 'হয়েছে—হয়েছে। তা সব ভালো তো রে?'

নন্দর গলা দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ বার হলো যেটা ভালো কি মন্দ, বোঝা গেল না। ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে তার বিহ্বল ভাব কিছুটা কেটে গেছে। সবটা পরিষ্কার বোঝা না গেলেও অনুমান তীক্ষ্ণ।

রায়মশায় পরিষ্কার করেই বললেন, 'কাল তো ভোট—জানিস। সকাল সকাল গিয়ে ভোটটি দিয়ে আসবি। তা এবারও আমার বড় জামাই দাঁড়িয়েছে—এতদিন তো তার জয়ধ্বনি শুনলি, কাল গিয়ে ঝামেলাটা চুকিয়ে আসবি। এই আমাদের নিশান দেখে রাখ—ওতে ওই যে চিহ্ন।...আহা, নিশানটা একটু ভালো করে মেলে ধরো না হে।'—রায়মশায় ঘুরে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিলে।

নন্দ তার ধোঁয়াটে বুড়ো চোখ মেলে দেখতে লাগল।

রায়মশায় উৎসাহ দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ, ভালো করে চিনে নে—দেখে নে। নিজেই এসেছি—জামাই চেনে কি না-চেনে। দেখিস ধানেশ্বরীর একটি ভোটও আমার এপাশ ওপাশ হলে চলবে না। এতদিনের রাজা-প্রজার সম্পর্ক'—

ভিড়ের ভেতর হতে কে একজন মুখর ছোকরা বলে উঠলো, 'বাপ-বেটার সম্পর্ক বলুন।'

'তাই তো, বাপ-বেটার সম্পর্কই তো। এতদিনের সুখ-দুঃখের সম্পর্ক। ভাঙে কে! না কি বলিস?'

জহুরীর তীক্ষ্ণ চোখে সদানন্দ তাকাল নন্দর নানা টোলে ভরা বোকা বোকা মুখটার দিকে। কিছু বোঝা গেল না। গলা নামিয়ে বললে, 'তা হ্যাঁরে শোন—একটু ইদিকে আয়।' ভিড়ের দিকে চেয়ে সদানন্দ হেসে বললে, 'এ আমার বাপ-বেটার ঘরের কথা, তোমাদের ভোট-ভাট নয় বাপু, তোমাদের শোনার নয়।' বলে নন্দকে ঠেলে নিয়ে দু পা সরে গেল। গলা নামিয়ে বললে, 'চাষ যা করেছিস নিজের চোখেই দেখে এলাম। ওতে ধান হবে—না ঘাসের বিচি? আগাছা মার—নিড়েন-টিড়েন দে।'

ভয় আর বিপদের সংকেত ছাড়া যে সব ফ্যাকাসে চোখে জীবনের লক্ষণ জাগে না—সে চোখ দুটো এবার তোবড়ানো মুখের কোটর থেকে ঝিকিয়ে উঠলো পলকে অবোধ পশুর মতো। গলা শুকিয়ে উঠলো নন্দর। আমতা আমতা করে বললে কোনো রকমে, 'আজই যাব বড় কত্তা। একলা পড়ে গেছি কি না—'

'একলা তুই সাধ করে। খাটিয়ে জোয়ান ব্যাটাকে পাঠালি শহরে কারখানায়—কাঁচা টাকার লোভে।'

'পাঠাইনি কত্তা, সে ঝগড়া করে চলে গেল একদিন বৌ নিয়ে।'

'আর এদিকে তুই জমি আটকে রাখলি তিন-তিন বিঘে একলা। ভেবে দেখ কথাটা। চাষের জমি পাচ্ছে না বলে এদিকে কত চাষী পালাচ্ছে গাঁ ছেড়ে বনে-বাদায়। ভেবে দেখ।' কথা শেষ করে নন্দকে ভাববার যেন অফুরন্ত সুযোগ দিয়ে সদানন্দ দলবলের দিকে ফিরে বললে, 'চলো হে—ধানেশ্বরী এ বেলা শেষ করতেই হবে।'

ভিড় এগোলো। জয়ধ্বনি উঠলো রায় মশায়ের জামায়ের নামে: ভোট দাও—ভোট দাও—বংশী চৌধুরীকে—

চোখের সামনে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দলটা—সরে যাচ্ছে বড় রায় সদানন্দের বুড়ো কিন্তু দীর্ঘ ঋজু দেহটা।

আপাতত আপদ বিদেয়! একটা সাময়িক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নন্দ ঘরে ঢুকবে বলে ঘুরে দাঁড়াল! সেখানে দরোজা আগলে তখন সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে তার প্রথম পক্ষের কাচ্চাবাচ্চা, বড মেয়ে পাঁচি, দ্বিতীয় পক্ষের বৌ সুমতি। চোখ ভরে কৌতূহল।

সুমতি বললে, 'কি বললে—ভোট না দিলে জমি কেড়ে নেবে?' সুমতির চিকন মসৃণ মুখে কেমন যেন চাপা হাসি।

নন্দ ধমকে উঠলো, 'মেয়েমানুষ, তোর ইসব কথায় কাজ কি?'

'ওমা গো—মোর ভোট আছে না? গতবারে দিলম যে! কতলোক কত সাধলে, হাতে ধরলে'—বলে সে খিল খিল করে হেসে উঠলো। আঁটো শরীর সুমতির দুলে দুলে উঠতে লাগল।

'তাই তোর বড্ড ভাল নেগেছিল। ও গতরে তোর পোকা পড়বে।' দাঁত খিঁচিয়ে নন্দ অভিসম্পাত দিলে, 'তুই মরবি কবে—হে ভগবান—মরবি কবে!'

'মোর সতীনের এণ্ডিগেণ্ডিগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে তুই যবে মরবি রে বুড়ো। মোর ছেলে না মেয়ে? শুধু দুই হাত পা।' বলে ঝটকা মেরে ঘরে ঢুকলো। বলতে বলতে গেল, 'জমি গেলে অতোগুলো রাক্ষসে পেট ভরাবি কিসে। আমার কি—আমার যেদিকে দুচোখ যায়—'

এমন সময় খাল পাড়ের দিকে আবার একটা সগর্জন জয়ধ্বনি উঠলো: 'মহানন্দ রায়কি জয়। ভোট দাও—ভোট দাও।'

দলটা খালের সাঁকো পেরোতে পেরোতেই গজরাচ্ছে।

'সেরেছে!' বিড় বিড় করে বললে নন্দ। মুখ তার ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দূর থেকেও চেনা যায়—দলের আগে আগে সেই ভরাট সুদীর্ঘ দেহ, কুচ্‌কুচে কালো ইয়া পাকানো গোঁপজোড়া, গলায় আবার রক্তজবার মালা। পেছনে বেশ বড় দল। এদের নিশানের সংখ্যাও ঢের বেশী—ইয়া মোটা মোটা লাঠিতে উড়ছে পৎ পৎ করে।

ফুলের মালাপরা লোকটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল পাঁচি—শুধালো, 'কে বাবা!'

নন্দ ঢোক গিলে বললে, 'হাঙ্গামানন্দ···মেজ রায়মশায় রে পাঁচি!—আজ ধানেশ্বরীতে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড না ঘটে যায়।' বলে সুড়ুৎ করে কুঁড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ধানেশ্বরীর চাষীরা মহানন্দের নাম রেখেছে হাঙ্গামানন্দ। যত হাঙ্গামা হুজ্জুতের সেই গোঁসাই মহানন্দ—নন্দলালের দোরগোড়ায়। এসে হাঁক পাড়ল ভরাট গলায়: 'নন্দলাল! —'

পাঁচি বললে, 'ডাকছে যে বাবা!'

ফাঁসির আসামীব মতো নিরুপায় নন্দ বেরিয়ে এল কুঁড়ের ভেতর থেকে।

নন্দলালের ভয় পাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে এক চোট খুব হা-হা করে হেসে উঠল মহানন্দ। তারপর বললে, 'খুব ভয় পেয়েছিস—না? ভোট না দিলে বড় কত্তা জমি কেড়ে নেবে—না?'

এরই মধ্যে কে চুকলি করলে মেজকর্তার কানে! আপাতত সে বিস্ময় চাপা দিয়ে নন্দ মিনমিনে গলায় বললে, 'না না—তা না, তবে ইয়ে—'

'চাপতে পারবিনে নন্দ—আমি সব জানি।' মহানন্দ বললে, 'কোনো ভয় নাই—আমি আছি। এবার আমি নিজেই দাঁড়িয়েছি—তা জানিস। ধানেশ্বরীর সব কটা ভোট আমার চাই। জামায়ের সঙ্গে যোগ দিযে বড় কর্তার এতদিনের নাচনকুঁদন এবার আমি খতম করবো।'

শক্তিমান দুই শরিকের মাঝখানে নন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

'ওর ওই ডাক্তার জামাই—ডাক্তার না গো-বদ্যি, হাসপাতালের ডাক্তার, মানুষগুলোকে কেটে ফুঁড়ে মেরে দেশটাকে শ্মশান বানিয়ে দিলে গা।' গলা নামিয়ে বললে মহানন্দ, 'তার সঙ্গে বড় কর্তার ওষুধের ব্যবসা। বুঝলি না, হাসপাতালের ডাক্তার যে!' রহস্যময় হাসি হেসে মহানন্দ বললে, 'আরও আছে। মইনুদ্দির সঙ্গে কিসের ব্যবসা জানিস?'

নন্দ ভয়ে ভয়ে ঘাড় নেড়ে জানালে, 'না।'

মহানন্দ বললে, 'গোরুব চালানি ব্যবসা, বেনামে মইনুদ্দিন ব্যাটা চালান দিচ্ছে গাঁ থেকে কলকাতায়—আর ওদিকে কসাইখানায় কাটছে কচাকচ্। এই ঘোর অধর্ম নন্দলাল—মহাপাপ! বল, চাস তুই—বল?'

অদূরে নিজের বাঁধা বলদটার দিকে এক পলক সভয়ে তাকিয়ে নিয়ে নন্দ কাতর গলায় বললে, 'আমি তো জানিনি মেজ কত্তা।'

'আমি জানি।' মহানন্দ চোখ পাকিয়ে বললে, 'চাষীদের টানে টুনে মইনুদ্দি টাকা দেয়—আর বেনামে তা জোগায় বড়কত্তা। যদি এবার দাঁড়াতে পারি নন্দ, এই তোকে বলছি, একটা গোরু বেরুবে না গাঁ থেকে। খেত-খামার নিয়ে, পূজাপার্বণ নিয়ে, ধর্মকর্ম নিয়ে চাষী যেমন শান্তিতে ছিল, সব বজায় থাকবে। গাঁয়ের শান্তি—দেশের শান্তি।'...

নন্দ সকাতরে ঘাড় নাড়লে।

মহানন্দ বললে, 'আর ভেবে দেখ তুই—ধানেশ্বরী কিছু বড়বাবুর একলার নয়, আমারও বাপকেলে অংশ আছে পাঁচ আনা তিন পয়সা তিন পাই। যাবে কোথায় ? কড়ায় গণ্ডায় ভোটের ভাগ আদায় করে নেবো বাবা, হুঁ—হুঁ।'

নন্দ নীরবে আবার ঘাড় কাৎ করলে।

'তবে ?' সদাপটে মহানন্দ বললে, 'কাল সকাল সকাল গিয়ে তা হলে তুই আর তোর বৌ ভোটটা দিয়ে আসিস। দাও হে—ওকে রিক্সা ভাড়া তিনটে টাকা।'

ঝোলা হাতে একজন তৈরীই ছিল। চটপট নন্দর বিহ্বল অবশ হাতে তিনখানা এক টাকার নোট গুঁজে দিলে।

জয়ধ্বনি দিয়ে মহানন্দের দল এগিয়ে চললো।

'ভোট দাও—ভোট দাও।'—

লাঠালাঠিটা কোথায় কিভাবে লাগতে পারে—অনুমান করতে করতে নন্দ কুঁড়ের ভেতর ঢুকে পড়লো আবার।

মহানন্দের হাঁকডাক দূরে মিলোতে না মিলোতে এসে হাজির হলো আবার এক দল। নন্দর কুঁড়ের সামনে তাদের জয়ধ্বনি গর্জন ক'রে উঠলো।

পাঁচি দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ছিল—সেখান থেকেই ডেকে বললে, 'আবার কারা এসেছে বাবা।'

'সেরেছে।' নন্দ খেঁকরে উঠলো, 'তো তুই দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছিস কেনে ?'

বাইরে থেকে ডাক এল, 'নন্দ !'

'মরেছে। এ যে ছোটবাবু মনে হচ্ছে রে।' যেন তেতো-খাওয়া মুখে নন্দ আবার কুঁড়ের বাইরে এল।

সামনে দাঁড়িয়ে রায় বংশের ছোট শরিক উদয়ানন্দ। লম্বা রোগা মানুষটি—আর দুই শরিকের মতো চেহারায় না আছে দাপট, না আছে চতুর তীক্ষ্ণতা। বরং তুলনায় কিছুটা মলিন এবং বিষণ্ণ। দুই শরিকের সঙ্গে মামলা-মোকদ্দমায় বিষয়-আসয় প্রায় শেষ হওয়ার পথে।

উদয়ানন্দ একেবারে নন্দের কাঁধে হাত রেখে বললে, 'আজ তুই আর আমি সমান নন্দ—ভোটের জন্য তুইও দাঁড়াসনি, আমিও দাঁড়াইনি। এসেছি আমাদের উকীলবাবু নিবারণ দাসের জন্যে। এই যে নিবারণবাবু।'

নন্দ পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, নিবারণ হাঁ-হাঁ করে তাকে তুলে ধরলে।

বেঁটে খাটো চোস্ত মানুষ, সামান্য একটু ভুঁড়ি সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আছে। তাহলেও খুব চটপটে। ঝপ্ ক'রে নন্দর হাতটা ধরে বললে, 'ওই যে উদয়বাবু বললেন—আমরা সব সমান। ভগবানের রাজ্যে কে ছোট—কে বড় ভাই! বল?'

একজন ধরে আছে হাত—একজন কাঁধ। তার মাঝখানে শরতের এই মধ্যাহ্নে নন্দ প্রায় ঘেমে উঠতে লাগল।

উদয়ানন্দ বললে, 'আমাদের এমন টাকা নেই যে জোর করে তোর হাতে গুঁজে দেবো। জমিও নেই যে কেড়ে নেওয়ার হুমকি দেবো। সব প্রায় খুইয়ে এইটুকু বুঝেছি নন্দ—দুনিয়ায় মানুষ চেনা বড় কঠিন। তাই ভেবেচিন্তে ভোট দিবি, সুযোগ্য লোককে ভোট দিবি—যে কি-না দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারে। তেমন লোক আমাদের নিবারণবাবু ছাড়া এ মহকুমায় আর আছে কে? ওঁর মুখের সামনে বলে জজ মুনসেফ পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়।'

নিবারণ দাসকে জীবনে কখনো দেখেনি নন্দ—উদয়ের কথা শুনতে শুনতে সে এই দুর্লভ মানুষটাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

উদয়ানন্দ বললে, 'এবার তবে চলি নন্দ। নিবারণবাবুকে ভুলিসনি—লণ্ঠনের মার্কা মনে রাখিস। উনি আমাদের আলো।'

'আর নেমন্তন্নটা?' নিবারণ উকীল মনে করিয়ে দিলে।

উদয় মোলায়েম হাসি হেসে বললে, 'নিবারণবাবুর বড় সাধ—সবাইকে একটু মিষ্টিমুখ করান, মানে জোর খ্যাঁট আছে নন্দ। ইয়া বড় বড় মাছ দিয়েছে সব মক্কেলরা, দই সন্দেশ মিষ্টির তো কথাই নেই। আজ থেকে বাজারে সে প্রায় হোটেল বসে গেছে রে। কি আর বলবো। কাল সকাল সকাল তুই আর তোর বৌ একেবারে চানটান সেরে চলে যাবি সিধে।'

'যাবে ভাই—কেমন?' পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে নিবারণ উকীল।

দল এগোলো।

'ভোট দাও—ভোট দাও। লণ্ঠন মার্কা—নিবারণ দাস।'

নন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। মাথার মধ্যে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যভাবে কেমন একটা টান পড়ছে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ির মধ্যে কোথায়। ফোঁস করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নন্দ ফের কুঁড়েতে ঢুকলো।

কাকে আজ ঠেকাবে নন্দ! ভোটের শেষ মহড়ার দিন। নানা রঙের সব নিশান আর চিহ্ন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ছোট-বড় দল। ধানেশ্বরীর খালের এপার ওপার নানা ধ্বনিতে মুখরিত। যত বেলা পড়ে আসছে—ততো যেন

চিৎকার বাড়ছে। দরজার সামনে বসে পাঁচি হাঁ করে দেখছে তো দেখছেই : কোন দলটা কোন দিকে গেল। এই ফের একটা আসছে এই দিকে।

'ভোট দাও—ভোট দাও। জগন্নাথ হাইৎ'—

পাঁচি ডাক দিলে, 'আবার কারা এসেছে বাবা।'

'আবার কারা এসেছে বাবা।' নন্দ ভেঙিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'তুই হারামজাদি হোথা থেকে উঠবি, না তোর ঠ্যাঙ ভেঙে দেবো।'

দ্বিধান্বিত নন্দ বেরোবে কি বেরোবে না ভাবছিল, ততক্ষণে যার দরকার সেই এসে হাজির—একেবারে ঘরের ভেতরে, সম্পর্ক ধরে ডেকে :

'কোথায় গেলে—ও নন্দ মামা!'

রোগা রোগা ঢ্যাঙা পানা-জলেভেজা, রোদে পোড়া ছোকরা, কামানো মাথায় একটা পট্টি বাঁধা। ভেতরের কোথা থেকে রক্তের ধারা এসে শুকিয়ে ফিকে আলকাৎরার মতো কালো হয়ে গেছে। তাকে দেখে নন্দের বুকটা ধড়াস্ করে উঠলো। মুখ শুকনো ক'রে বললে, 'ইদিকে এস ভবানী। তোমার সেই বারোগণ্ডি পয়সা কিন্তু আজ তো দিতে পারবনি বাপ্। হাত একদম খালি ভবানী—বিশ্বাস কর।'

'পয়সার জন্যে আজ আসিনি মামা!' ভবানী হেসে বললে, 'তা হাতখালি কেন? লক্ষ্মণ টাকা পাঠায়নি?'

'কোথায় টাকা—কোথায় কী!' নন্দ বললে, 'আজ তিন-তিন মাস কোনো খবর নাই। এখানে এতগুলো পেট'—

ভবানী বললে, 'এই তো মোদের কপাল মামা। এখন চল দেখি মোর সাথে।'

'কোথায়!'

'ভোট। জগন্নাথ মোদের লোক। ধানেশ্বরীর ভোট মোদের ভোট। চলো।' হাত ধরে টান মারলে ভবানী। বেশ বলিয়ে কইয়ে ছোকরা। বললে, 'মোদের ভোট—মোদের লোক, মোরা না গেলে চলবে কেন! তুমি লক্ষ্মণের কটা টাকার জন্যে ককাচ্ছ বসে বসে, এদিকে যে রাজ্য যায় যায়।'

'কাদের রাজ্য গো?'

'যারা মোদের বুকে চেপে বসে আছে!'

ভবানী ফের হাত ধরে টানাটানি সুরু ক'রে দিলে, 'চলো মামা—যেতেই হবে সঙ্গে।'

এমন বিপদে আর কখনো পড়েনি নন্দ। হাত টানাটানি ক'রে বললে, 'আমার

বড্ড কাজ আছে বাবা। একজনের জন্যে ঘরে সেই সকাল থেকে খুঁটে বসে আছি—বড্ড দরকার। না হলে আজ ঘরে থাকি!'

'ঠিক আছে। তোমার আর মামীর ভোটটি যেন জগন্নাথ পায়—কথা দাও।'

'দিচ্ছি।'

'বাস্। তবে সঙ্গে গেলে না মামা,' ভবানী বললে, 'তুমি কিন্তু পিছিয়ে পড়লে। জেনে রাখ—রাজ্য এবার আমাদের।'

'জয় হোক।'

'তখন তোমার অতো জ্বালা যন্ত্রণা আর অভাব—কিছুই থাকবে না।' বলতে বলতে ভবানী কুঁড়ের নীচু দরজা দিয়ে ঝুঁকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে চলন্ত গর্জন শোনা গেল: ভোট দাও—ভোট দাও।

সুমতি এতক্ষণ হাসি চেপে ছিল—এবার নন্দর বিহ্বল, হতাশ, দিশেহারা মুখের দিকে চেয়ে খিল্ খিল্ ক'রে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে।

'তুই মর—তুই মর বাঁজা শাঁখচুন্নি।' তারপর হাঁক পড়লো নন্দ, 'পাঁচি!'

পাঁচি ভয়ে ভয়ে তাকালে বাপের দিকে।

'ফের যদি ওই দরজার মুখ থেকে আমাকে ডাকবি।' নন্দ গজ্ গজ্ করতে করতে বললে, 'এবার কেউ এলে সিধে বলে দিবি—নেই। বুঝলি?'

পাঁচি ঘাড় কাৎ ক'রে বললে, 'বুঝেছি।'

তবু নন্দ উৎকর্ণ হয়ে রইলো।

সন্ধ্যের পরে একটি মুসলমান এসে দাঁড়াল নন্দর কুঁড়ের সামনে—পরণে চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, হাতে পাঁচনবাড়ির মতো একটা ছোট কঞ্চি।

ডাকলে নামানো গলায়, 'নন্দদা।'

পাঁচি বললে, 'বাবা নাই—বেরিয়েছে।'

'খবরদার পাঁচি—মেরে ফেলাব, মেরে ফেলাব একেবারে।' নন্দ তড়াং করে লাফ দিয়ে বাইরের দিকে ছুটলো। আগন্তুকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'এতক্ষণে এলে মইনুদ্দি মিঞা। সেই সকাল থেকে তোমার জন্যে ঘরে বসে রইছি।'

মইনুদ্দি বললে, 'চটপট কাজ মিটিয়ে ফেল নন্দ—ছুটতে হবে মোকে আর এক জায়গায়।'

নন্দ হাঁক পাড়লে, 'পাঁচি, একটা লম্প দে।'

পাঁচি কেরোসিনের একটা লম্প বসিয়ে দিয়ে গেল দাওয়ার ওপরে।

সেই ম্লান ধোঁয়াটে আলোয় হিসেব করতে বসলো মইনুদ্দি আর নন্দ।

মইনুদ্দি বললে, 'গত সন তোমার ব্যাটার কাজের জন্যে দফায় নিলে পঞ্চাশ টাকা।'

নন্দ বললে, 'হুঁ। ফোরম্যান না কাকে, ঘুষ দেওয়ার জন্যে নিতে হয়েছিল, তাই। তা ব্যাটার তো আজ তিন মাস কোনো খবরই নাই।'

মইনুদ্দি বললে, 'এখন হিসাব কর। গত সন টানের সময় ফের দফায় নিলে পঞ্চাশ। কত হলো?'

'এক শ।'

'সুদ দশ।'

'এক শ দশ।'

'বাস।' মইনুদ্দি পুরানো হিসেব চুকিয়ে একখানা দশ টাকার নোট নন্দর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নাও আর দশ। বাস। এবার বলদ খুলে দাও। নাও—ধরো। কি হলো গো!' সেই ম্লান আলোয় নন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল মইনুদ্দি।

নন্দ হাতে দশ টাকার নোটটা মুচড়ে ধরে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মইনুদ্দির কেমন সন্দেহ হলো। বললে, 'গোরু দেবে না?'

'দোব মইনুদ্দি—দোব। ভেবেছিলাম—ওকে দিতে হবে না—টাকা তোমার শোধ ক'রে দোব।' চোখের জল মুছে নন্দ বললে, 'আর দশটা টাকা আমাকে দাও। চেয়ে নিচ্ছি মিঞা—হাত পেতে চেয়ে নিচ্ছি। আর মোর কিছুই বেচার নাই। রইলো শুধু কটা কাচ্চা-বাচ্চা আর বৌ। ওদের কেনার লোক জোগাড় ক'রে দিতে পার মইনুদ্দি ভাই?'

মইনুদ্দি মুখ গোমড়া ক'রে বসে রইল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দ বললে, 'চলো—ওকে খুলে দি। নিয়ে যাও। একটা কথা বলো সত্যি ক'রে, তোমার আল্লার কিরে—ওকে কি কলকাতায় কসাইখানায় পাঠাবে?'

'তোবা—তোবা।' মইনুদ্দি বললে, 'তোমার মাথা খারাপ নন্দদা। চাষের অমন বাঁয়া বলদ—ও যে দামে বিকাবে গো!'

গায়ে মাথায় শিঙে হাত বুলিয়ে নন্দ তার বলদটা খুলে দিলে মইনুদ্দিকে। দিয়ে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি সর্বস্বান্ত মানুষের।

অন্ধকারে আর একটা কে লোক, গায়ে ছেঁড়া জামা, পরনে ময়লা ছেঁড়া পাজামা—নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল তার পাশে, এ যেন সে জানতেই পারল না।

লোকটি কথা বললে বিষণ্ণ গলায়, 'বলদটা বেচে দিলে বাবা ?'

'কে !' চমকে উঠলো নন্দ। এ কার গলা শুনছে সে !

'আমি লক্ষ্মণ।'

'লক্ষ্মণ !' নন্দ অবাক হলো প্রথমে—তারপর অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ঘোর কেটে তার যতো ক্ষোভ যতো আক্রোশ যতো হতাশা ছিল—মুহূর্তে প্রচণ্ড বেগে ফেটে পড়লো। চিৎকার ক'রে উঠলো, 'আবার জিজ্ঞেস করচিস—ওকে বেচলম কেনে ? আজ তিন মাস টাকা দিয়েচিস ? তোর কারখানার কাজের জন্যে ঘুষের টাকা দিইনি কর্জ করে ? শোধ করব কিসে ?'

হাতের টিনের সুটকেশটা দাওয়ায় রেখে সেইখানেই বসে পড়লো লক্ষ্মণ। ক্লান্ত গলায় বললে, 'আমার কারখানা বন্ধ—দু-মাস কাজ ছিল না।'

'কাজ নাই !' আবার অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ধাক্কায় হতবাক হয়ে গেল। 'কি বললি ?'

'কাজ নাই—ছাঁটাই। লক আউট।'

চেঁচামেচিতে সুমতি, পাঁচি, এণ্ডিগেণ্ডি সব কটা বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

সুমতি জিজ্ঞেস করল, 'বৌ কোথায় ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে লক্ষ্মণ বললে নীরস গলায়, 'সে মরে গেছে।'

'মরে গেছে কি রে ! কিসে মরলো ? কবে মরলো—কোনো খবর নাই—কিছু না।' উত্তেজিত নন্দ জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা করতে লাগল। বললে, 'এখন কি বলবো তোর শ্বশুরকে ?'

শুধু সুমতি এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল লক্ষ্মণের দিকে। তার রোগা রোগা রক্তহীন ফ্যাকাসে মুখটায় কিসের একটা ছাপ—যা বেদনা নয়, দুঃখ নয়, অন্য কিছু। যা হয়তো মেয়েরাই বোঝে। চোখাচোখি হতে লক্ষ্মণ মুখ নীচু করলে।

সুমতি বললে, 'সত্যি বলো—বৌ মরেছে ?'

লক্ষ্মণ মুখ নিচু করে রইল অনেকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'কাজকর্ম নাই। দু-দুটো মাস খেতে পরতে দিতে পারিনি। সে কার সঙ্গে পালিয়েছে।'

'এ্যাঁ, পালিয়েছে !' নন্দ আবার চিৎকার ক'রে দাপাতে লাগল, 'আমি তখনি জানি—তখনি জানি, মোদের সঙ্গে ঝগড়া করে চলে গেল। ও সুখের পায়রা।'

'তুমি অতো চেঁচিয়ো না—দোহাই তোমার।' ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় লক্ষ্মণ

বললে, 'আমার নামে হুলিয়া আছে পুলিসের। তোমাদের বেশীদিন জ্বালাব না
—শরীরটা ভাল নাই, দু-চারদিন থেকে আবার চলে যাব।'

নন্দ চেঁচিয়ে আবার কি বলতে যাচ্ছিল—সুমতি ধমকে উঠল, 'চুপ' !

তার ভরাট দেহের প্রদীপ্ত ভঙ্গী, তার বড় বড় দুটো চোখের নীরব তিরস্কার
ও ঘৃণার সামনে সহসা নন্দ যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল।

টিনের সুটকেশটা একহাতে তুলে নিয়ে আর এক হাতে লক্ষ্মণের হাত ধরে
টান দিলে সুমতি, চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললে, 'চলো—ভেতরে চলো।',

দূরে রাজার হাটে তখন নির্বাচনের শেষ মহড়া জমে উঠেছে নানা সমাবেশে.
নিশানে আর ধ্বনিতে।

নন্দ বক্সির গল্প

বদলেছে—অনেক কিছুই। জমানা বদলেছে।

নইলে এমন জায়গায় একটা চায়ের দোকানই বা পেতুম কি করে। জেলা বোর্ডের সড়কের ধারে হপ্তায় দুদিনের পুরোনো হাট এখনও বসে দেখছি—আজও বসেছে বট অশথের ছায়ায়। আবার পাশাপাশি স্থায়ী বাজারের দু' চারটে টিনের চালাও গজিয়ে উঠেছে। ঘেঁষাঘেঁষি চা-জলখাবার পানবিড়ি গোলদারী—মায় ওষুধ আবগারী দোকান পর্যন্ত। ছোট্ট সাইনবোর্ড ঝোলানো একটা পাকা কোঠার ঘরে ডাকঘর। হাঁটুভর ধুলোর সড়ক হয়েছে পিচমোড়া—গোঁ গোঁ করে বাস ছুটছে নরঘাট টু কালিনগর—কাঁথি—দীঘা। আরও দেখ—ছোটখাট একটা মিছিলও গজরাচ্ছে হাটের মাঝখানে।

দেখছিলুম।

এমন সময় সামনের আবগারী দোকান থেকে একটি লোক বেরিয়ে এসে সুড়ুৎ করে চায়ের দোকানে ঢুকলো। চা নয়—সকাতরে এক গেলাস জল চাইলে।

তাকিয়ে দেখছিলাম—এত পরিবর্তনের মাঝখানে মূর্তিমান এক অপরিবর্তন। সেই মাথা ভরা টাক, বেঁটে খাটো নাদুসনুদুস মানুষটি। চোখের কোল দুটো ফুলে আছে থলির মতো—চোখে নেশাড়ির ঘোলাটে দৃষ্টি। গায়ে ফতুয়া, বগলে ছাতা। নন্দ বক্সি বয়সে যা একটু থস্‌থসে হয়ে গেছে।

বললুম, 'বক্সিবাবু না?'

আমার দিকে ফিরে নন্দ বক্সি তার কুতকুতে ঘোলাটে চোখ দুটো তুলে তাকাল। চিনতে পেরে বলে উঠল, 'আরে—আপনি! কবে এলেন? ক'দিন থাকবেন? সব কুশল?' একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন এবং জবাবের কোন ফুরসুৎ না দিয়েই সক্ষোভে বক্সি বললে, 'আর মশয়, গ্রাম-ছাড়া মানুষ আপনারা—চাকরি-বাকরি করেন, আছেন শহরে। দিব্যি আছেন। এখানে মরছি আমরা জ্বলে পুড়ে।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

নন্দ বক্সি অবাক হয়ে বললে, 'কেন!' তারপর হাটের দিকে চোখ উস্‌কে বললে, 'ওই দেখছেন না—শিবের চেলাচামুণ্ডা নন্দী ভৃঙ্গী সব চেঁচিয়ে কি রকম মশান জাগাচ্ছে!···গ্রাম নয় মশয়—এ এখন শ্মশান, শ্মশান!'—

মিছিলের মানুষগুলো গজরাচ্ছে।

'শুনছেন তো ?' বক্সি বললে মনের দুঃখে, 'আমার পাঁচ পাঁচ বিঘের জমির ধান জবরদস্তি কেটে তুলে নিলে মশয়। সারা জীবনে রায় বাবুদের সেরেস্তায় খেটেখুটে ওই পাঁচ বিঘে খয়রাৎ পেয়েছিলাম মশয় শেষ পর্যন্ত। খাড়া দানপত্র।'

বললুম, 'তা পাঁচ বিঘা — কম নয়।'

'নয়ই তো। বাবুরা বললে — যা নন্দ, মামলা মোকদ্দমায় ঢের করেছিস, ও পাঁচ বিঘে তুই সম্পূর্ণ ভোগ দখল কর। তা আর শেষ পর্যন্ত ভোগে দিল না মশয়।'

জানতুম নন্দ বক্সি জাত বক্সি। ছোটবেলা থেকে বড়দের মুখে শুনে এসেছি — মামলা মোকদ্দমায় ফন্দি ফিকিরে এ তল্লাটে ওর নাকি জুড়ি নেই। মামলা মোকদ্দমায় আসল কথা হল তদ্বির — আর সে তদ্বিরে তার সোনার হাত। হয়কে নয় — আর দিনকে রাত করতে তার জুড়ি নেই। এখানে জোতদারে জোতদারে ঝগড়া-বিবাদ প্রায় লেগেই আছে। তাই মামলা-মোকদ্দমারও অভাব নেই। এবং নন্দ বক্সির মতো লোকের ঢালাও বাজার।

বললাম, 'আদালত তো তোমার রাজত্ব বক্সি। দাওনা মামলা ঠুকে।'

লোকটা সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমাকে দেখল। যেন আমার মতো কাঠ নির্বোধ আর সে দেখেনি। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'সেদিন গেছে মশয়।' বলে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করে দূরে হাটের মিছিলের দিকে চেয়ে রইল।

বক্সির নিষ্প্রভ মুখের দিকে চেয়ে বললাম, 'বক্সিবাবু, চা চলবে ?'

মন-মরা বক্সি বললে, 'দেন খাই।' আপন মনে বললে, 'আপনাদেরও ঢের খেয়েছি।'

চা এল।

চায়ে চুমুক দিয়ে বক্সি একটা পরিতৃপ্ত শব্দ করলে। তার ঘোলাটে চোখ দুটো যেন কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, 'মামলার কথা বলছিলেন বাবু — সেকাল হলে কি চুপ করে বসে থাকতাম। ব্যাটাদের ছপ্‌পর টেনে নামাতাম না ? সিধে চলো আদালতে — হেঁ হেঁ, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। ···গুরুর বিদ্যে আমার নিষ্ফল হতো না। তদ্বির কাকে বলে দেখিয়ে দিতাম।'

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমারও আবার গুরু ছিল নাকি বক্সিবাবু ?'

'বাঃ, ছিল না !' বক্সি সশ্রদ্ধ ভরাট গলায় বললে, 'অন্নদা চৌধুরী — খাঁটি ব্রাহ্মণ, স্বর্গে গেছেন। মিথ্যে বলবো না। তাঁর পায়ের কাছে বসে ঢের শিখেছি।

কোর্ট-কাছারি, উকিল, হাকিম, পেসকার—সব চিনিয়ে দিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর নাম শোনেন নি!'

বললুম, 'শুনেছি বটে—সেই ছেলেবেলায়…'

'তা বটে।' বক্সি বললে, 'তাঁর বোলবোলাও ছিল আপনাদের জন্মাবার আগে। গায়ে শুধু তাঁর উকিলের শামলাটা ছিল না মশয়—নইলে আইন কাকে বলে, মামলার প্যাঁচ কাকে বলে—তদ্বির কাকে বলে…'

জিজ্ঞেস করলুম, 'কি রকম?'

'তবে শুনুন—একটা হাঁড়ির খবরই বলি।' নন্দ বক্সি পুরানো কথায় যেন প্রাণ ফিরে পেলে। বললে, 'রায়বাবুদের তো চেনেন—যাঁদের সেরেস্তায় কাজ করতাম।—'

বললাম, 'চিনি। ঢের জোতজমির মালিক।'

'ওই অতো জোত-জমির আরম্ভ কোথায় জানেন?'

বললাম, 'বলো—'

'বাদাবেড়ের চর থেকে।' বক্সি বললে, 'সেই চর থেকে ঘরে ওদের লক্ষ্মী উছলে উঠল। কিন্তু আজ সাচা কথাটা বলি—সে চর ওদের নয়।'

'তবে! জুলুমবাজি!'

'তা হয়েছিল ঢের জুলুমবাজি—কিন্তু তাতে হয়নি মশয়।' নন্দ বললে, 'ছিল কোম্পানীর আমলের নিমক মহল। নিমক মহল উঠে গেল—ইংরেজ সরকার চাষীদের সঙ্গে ওই সব জমি গোচর বলে বন্দোবস্ত করলে। খাজনা মবলগে দশ সিক্কা, মানে বছরে মোট দশ টাকা মাত্র। তার দখল নিয়ে আমার জমিদার রায়বাবুদের সঙ্গে লেগে গেল চাষীদের দাঙ্গা—মামলা, ফৌজদারী দেওয়ানী দুই-ই। চাষীরা জোট বেঁধে কোর্টে নালিশ করলে। জমি যে তাদেরি—তার সাচ্চা কাগজপত্র কোর্টে দাখিল করলে। রায়বাবুরা ঘাবড়ে গেলেন।'

আমি উৎকর্ণ হয়েই শুনছিলাম—বড় ঘরের রহস্য। বললুম, 'তারপর?'

বক্সি বললে, 'অবস্থা যখন জটিল তখন ডাক পড়ল আমার গুরুদেব অন্নদা চৌধুরীর। বড় কর্তা আমাকে ভেজিয়ে দিলেন অন্নদাবাবুর কাছে—বললেন, এ বিষয়ে নন্দই সব জানে—সব বুঝিয়ে দেবে। ঠিক মতো তদ্বির করে জেতা চাই অন্নদা। মন খুশি করে পুরস্কার দেবো দুজনকেই।'

গুরু হেসে বললেন, 'ভয় নেই, জিতবেন।' তারপর আমাকে ডেকে সলা পরামর্শ করতে বসলেন। বললেন, 'চাষীদের দখলি স্বত্বের কোন প্রমাণ পত্র আছে?'

বললাম, 'আছে—গোচর জমার সরকারী কাগজ।'

গুরুদেব খেঁকরে উঠে বললেন, 'নষ্ট করতে পারিসনি! কিসের গোমস্তাগিরি করছিস এতদিন।'

বললাম, 'ব্যাটাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে চেষ্টা করা হয়েছিল। সব ছারখার—কিন্তু বিধি বৈরী, দু'চারজনের ঘর থেকে কাগজপত্র বেঁচে গেছে। আদালতে দাখিল করেছে।'

গুরু একটা হুম্ শব্দ করে বললেন, 'চলো কোর্টে, তদ্বিরে দেখা যাবে। কর্তার কাছ থেকে ভাল মত টাকা পয়সা বুঝে রাখ। কাল সকালে রওয়ানা হব।'

কোর্টে গিয়ে হাকিমের ঘরের সামনে বসে আছি তো আছি। অন্নদাবাবু এদিক ওদিক করছেন, মুহুরী ধরে মতলব ভাঁজছেন। এই করতে করতে বেলা একটা। হাকিম টিফিনে উঠে গেল।

গুরুদেব বললেন, 'এবার মওকা। দে পাঁচটা টাকা। উদো চাষা ব্যাটাদের কাগজপত্র দেখতে হবে ঘুষ দিয়ে।' দিলাম পাঁচটা টাকা। গুরুদেব পেসকারের কাছে এগিয়ে গেলেন। তারপর গুজগুজ ফুসফুস করে কি সব কথা হলো মশয়—অত শুনতে পাইনি। পাঁচটা টাকা দিতেও দেখলাম। কিন্তু দেন তো হলো—লেন কই! কোথায় কাগজপত্রের নথি দেখা আর কোথায় কী! অন্নদাবাবু ফিরে এসে বললেন, 'চল নন্দ, কম্ম ফতে! এখন হোটেলে টেনে ঘুমাবি চ।'

আমি বললাম, 'কাগজ! কাগজপত্র দেখলেন না তো? টাকা আগে দিয়ে দিলেন!'

অন্নদাবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'গোড়ায় জল ঢাললে আগা বাড়ে—জানিস না? চল এখন—হবে সন্ধ্যের পরে। নথিপত্র সব পেসকারবাবু বাসায় নিয়ে যাবে।'

'ওঁর বাসায়! একেবারে কোর্টের বাইরে কাগজ!'

উনি বললেন, 'তবে! তদ্বির শিখতে হয় নন্দ। এখন যা করি শুধু দেখে যা। যা বলি মুখ বুজে শুধু করে যা।'

হোটেলে ঘর নেওয়া ছিল—বাকি বেলাটুকু পড়ে পড়ে ঘুমোলাম।

সন্ধ্যের পরে অন্নদাবাবু বললেন, 'চল নন্দ—বেরিয়ে পড়ি।'

যেতে যেতে আমাকে তালিম দিলেন, 'দেখ নন্দ—আমি গিয়ে পেসকারবাবুর বাড়িতে ঢুকবো, তুই দু'টাকার মিষ্টি কিনে সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবি। ডাকলে যাবি। বুঝলি?'

বললাম, 'তা তো বুঝলাম—কিন্তু আবার মিষ্টি ? কোর্টে পাঁচ টাকা তো দিলেন।'

অন্নদাবাবু ধমকে বললেন, 'আবার কথার ওপর কথা।'

বললাম, 'আমাকে হিসাব দিতে হবে তো।'

অন্নদাবাবু বললেন, 'সঙ্গে কত টাকা এনেছিলি ?'

কিছু কমিয়ে বললাম, 'আজ্ঞে দশ।'

'মাত্র।' চটে বললেন, 'এতে তদ্বির হয়। দে, বাকি যা আছে—দে আমার হাতে।' বলে টাকা পয়সা প্রায় জোর করে সব কেড়ে নিলেন আমার কাছ থেকে। বললেন আবার, 'এখন যা বলি ভালো করে শোন। মিষ্টি নিয়ে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবি। আমি ডাকলে তবে যাবি। বুঝলি। খবর্দার তার আগে দেখা দিবিনি।'

ওঁর কথা শুনে আমি তো মশয় ঘাবড়েই গেলাম। যাই হোক, ওনার কথা মত মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সামনের রাস্তায়—পেসকারবাবুর বৈঠক-খানায় ঢুকলেন গুরুদেব। পেসকারবাবু আদর করে বসালেন। রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, পেসকারবাবু আবার অন্দরে ঢুকলেন, আমাদের মামলার নথি-পত্র এনে তুলে দিলেন অন্নদাবাবুর হাতে। লণ্ঠনের সামনে গভীর মনোযোগে কাগজপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়লেন অন্নদাবাবু। পেসকারবাবু খাড়া পাশে দাঁড়িয়ে। এক-পাও নড়ে না—যেন খাড়া পাহারা। যতই হোক চালু মামলার মূল্যবান কাগজ পত্র তো!

আমি দাঁড়িয়ে আছি তো আছি। দেখতে পাচ্ছি—ওদিকে অন্নদাবাবু বারে বারে রাস্তার দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর হঠাৎ নথিপত্র ফেলে চটে-মটে বকতে বকতে বেরিয়ে এলেন বাইরের দাওয়ায়, 'হারামজাদা, পাজি, নচ্ছার ব্যাটা গেল তো গেল। হেই দেখ দাঁড়িয়ে আছে ভূতের মত। এ্যাঁ, বাড়ি চিনতে পারিসনি বুঝি। চলে আয়—চলে আয়।'

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় ঢুকলাম মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে। এগিয়ে দিলাম পেসকারবাবুর দিকে।

পেসকারবাবু সবিনয়ে সসংকোচে বললে, 'এ আবার কেন। না না—ছি ছি।'

কিন্তু আমার হাত থেকে হাঁড়িটি ধরেছেন ঠিক।

অন্নদাবাবু বললেন, 'ওটুকু আপনার জন্যে না। ও ছেলে মেয়েদের জন্য সামান্য কিছু মিষ্টি।' তারপর আমাকে হেঁকে বললেন, 'ভালো করে পেসকার

বাবুকে চিনে রাখ হরিপদ। মামলা যখন লেগেছে—পাঁচবার আসতে যেতে হবে। চিনে রাখুন পেসকারবাবু—এ হলো হরিপদ সিংহ।'

মনে মনে ঘাবড়ে গেলাম।

কস্মিনকালে আমার নাম হরিপদ নয়। কী আছে অন্নদাবাবুর মনে কি জানি। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলাম।

পেসকারবাবু মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে অন্দরে ঢুকলেন। সেই সুযোগে চোখের পলকে মামলার নথি থেকে দু'খানা অতি দরকারী সেই কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন চাপা গলায়, 'দলা পাকিয়ে ট্যাঁকে গোঁজ চটপট। দরজার বাইরে যেয়ে দাঁড়া।'

অন্দরে মিষ্টির হাঁড়ি পৌঁছে দিয়ে পেসকারবাবু ফিরে এলেন। অন্নদাবাবু তখন গভীর মনোযোগে আর্জি জবাব পড়ছেন। পড়া শেষ হলো। এক গাল হেসে পেসকারবাবুর হাতে নথির ফাইল তুলে দিয়ে বললেন, 'আপনার অশেষ দয়া। সব ধীরে সুস্থে দেখার সুযোগ হলো। এ কি আর কোর্টে দেখার সুবিধে হয় মশয়। আচ্ছা—নমস্কার!'

রাস্তায় নেমেই অন্নদাবাবু বললেন, 'পালাতে হবে মহকুমা শহর ছেড়ে। রাত্রেই।'

বললাম, 'এখন তো মোটর বাস বন্ধ!'

অন্নদাবাবু খেঁকরে উঠে বললেন, 'রাখো তোমার বাস। হেঁটে মেরে দেবো। এই তো বারো মাইল রাস্তা। চলো।'

বললাম, 'হোটেলে যে ও-বেলার পয়সা বাকি আছে।'

অন্নদাবাবু আবার খেঁকরে বললেন, 'রাখো তোমার হোটেল। সে পয়সা পরে দিয়ে যেয়ো। কত্তা তোমার হাড়কেপ্পন—দিয়েছে তো ওই কটা টাকা। সব খরচ করবে তো আমার হাতে থাকবে কি?'

কিন্তু লণ্ঠন! বললাম, 'হোটেলওয়ালার লণ্ঠন তো আপনার হাতে! ওটা তো ফেরৎ দিতে হবে!'

অন্নদাবাবু মুখ ভেংচে বললেন, 'তবে অতটা রাস্তা যাবে কি করে?—অন্ধকারে? সাপকাটিতে মরবে?'

সুরু হ'ল হণ্টন। মহকুমা শহর পার হয়ে সড়ক ফাঁকা। সড়কের দু'ধারে গাঁ বসত—দূরে দূরে। হাঁটছি তো হাঁটছি মশয়। সব নিঃসাড়। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। বারো মাইল এসে খেয়া। সেখানে যখন এসে পৌঁছলাম—রাত তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। সামনে ভরা জোয়ারের নদী। সাঁ সাঁ করছে অন্ধকার রাত।

দাঁড়ি নেই—মাঝি নেই। সন্ধ্যের পর খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে যায়।

বললাম, 'এপারে থেকে যাই রাতটা।'

'আর সকালবেলায় হাতকড়ার গয়না পরে গারদে ঢোকো!' অন্নদাবাবু বললেন ধমক দিয়ে, 'একেবারে ওপারে গিয়ে থামব।'

বললাম, 'কিন্তু খেয়া পার হবেন কি করে?'

অন্নদাবাবু বললেন, 'ঘাবড়াস কেন বাপু—দেখ না। মাঝি এপারেই থাকে। ওকে ডেকে তুললেই হলো।'

ঘাটের পাশেই মাঝির কুঁড়ে। ঢের হাঁক ডাকের পর মাঝি উঠল। লোকটা চোখ ঘষতে ঘষতে বাইরে বেরিয়ে আসতেই অন্নদাবাবু ধপ করে বসে পড়লেন তার সামনে। মাথায় হাত। কাঁদ কাঁদ গলায় বললেন, 'আজ বাঁচাও বাপ্।'

মাঝি ভ্যাবা চ্যাকা খেয়ে বললে, 'কি হল বাবু।'

অন্নদাবাবু বললেন, 'স্ত্রীর কলেরা।' তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'সন্ধ্যের মোটরে এই ভাইপো গিয়ে খবর দিল বাবা। আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল। এখন তুমি যদি একটু দয়া করো—এ জীবনে হয়ত তার সঙ্গে শেষ দেখাটা হয়।'

দাঁও বুঝে মাঝি বললে, 'যেতে পারি কিন্তু পাঁচটি টাকা লাগবে মশয়। এই ঘোর রাত, জোয়ারের টান। দাঁড়ি পর্যন্ত নাই।'

অন্নদাবাবু করুণ গলায় বললেন, 'টাকাটাই কি বড় হল বাপ্!'

মাঝি বলল, 'তবে ভোর হোক।' বলে পেছন ফিরলে।

অন্নদাবাবু তার কাপড় চেপে ধরলেন—বললেন, 'আচ্ছা তাই দেবো—এখন পার করো বাবা। স্ত্রীর প্রাণ যায় যায়—এখন কিসের টাকা, কিসের কি। চলো।'

নৌকোয় উঠে আমার তো বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল মশয়। জানি—ওনার হাতে আছে তো মাত্র তিনটি টাকা। আর ওই লোক যে নিজের গাঁট থেকে টাকা খসাবে—এমন মনে হয় না। এদিকে সাক্ষাৎ যমদূতের মত ওই মাঝি।

নৌকোয় উঠে অন্নদাবাবু ফিস ফিস করে বললেন, 'নৌকো থেকে নেমে তুই আগে উঠে চলে যাবি। আমি পরে যাবো।' বলে লণ্ঠনটা আমার হাতে গছিয়ে দিলেন।

পাড়ে নৌকা ভিড়তেই আমি অন্নদাবাবুর কথা মত সোজা খাড়ি বেয়ে ওপরে।

মাঝি হেঁকে বললে, 'হেই—ওর টাকা।'

অন্নদাবাবু বললেন, 'আমি দিচ্ছি বাবা—আমার ভাইপো। ঢের উপকার করলে তুমি। জীবনে ভুলব না।' বলে একবার এ পকেট খোঁজেন, একবার ও পকেট খোঁজেন। আমি দেখছি পাড়ের ওপর থেকে। তারপর আমাকে হেঁকে বললেন, 'ও মনি (আবার নাম বদল), টাকার থলি তো তোর কাছে হে। সেই তখন তোকে রাখতে দিলাম। দাঁড়াও—দাঁড়াও।' মাঝিকে বললেন, 'তুমি একটু লগি ঠেকো দিয়ে দাঁড়াও বাবা—টাকা এনে দিচ্ছি। কী উপকার যে আজ করলে বাপ্।'

তারপর নৌকো থেকে নেমে খাড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বলতে লাগলেন, 'দাও—তবিল থেকে পাঁচটা টাকা বের করো। আহা স্বর্গের দেবদূত—বৈতরণীর সাক্ষাৎ পাটনী, চিরদিন মনে থাকবে বাপ্। আশীর্বাদ করি—ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হোক।'

আমি তো কাঠ মশয়। লণ্ঠন তুলে ধরে ওনাকে আলো দেখাচ্ছি। কাছে এসে অন্নদাবাবু দাঁতে দাঁত চেপে চাপা গলায় গর্জে উঠলেন, 'লণ্ঠন তুলে ঠাকুর দেখছ—আহাম্মক কোথাকার! লণ্ঠন নেভা।' বলে নিজে ফস্ করে বাতি নিভিয়ে দিলেন। ঘিরে এল ঘুটঘুটি অন্ধকার। ফিস ফিস করে বললেন, 'চল, জোর পা চালিয়ে—জলদি।'

লোকাল বোর্ডের বাঁধের দুধারে ধানক্ষেত। সময়টা হবে ভাদ্রের শেষাশেষি। ধান গাছ কোমর সমান বেড়ে উঠেছে মাঠে। বাঁধ ছেড়ে আমাকে টানতে টানতে সেই ধান খেতে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, 'ঘাপটি মেরে বসে থাক চুপ করে, খবর্দার—নড়বিনি। ব্যাটা জোচ্চোর বলে কিনা পাঁচ টা-কা! দিচ্ছি ওকে টাকা।'

মাঝি তো নয়—ইয়া দশাসই পালোয়ান মশয়। ব্যাটা সাক্ষাৎ যমদূত। খানিক বাদে হেই বিরাট বাঁশের লগি হাতে উঠে এল নৌকো থেকে। প্রথমে হাঁকাহাঁকি, তারপর চোদ্দপুরুষ ধরে গালাগালি অশ্রাব্য ভাষায়। তারপর কী সন্দেহ হলো তার কে জানে! বাঁধের দু'পাশের ধান ক্ষেতে সেই বিরাট বাঁশের লগির কি দাবড়ানি আর খোঁচানি। হাত বিশেক তফাতে না থাকলে সেদিন আর প্রাণ নিয়ে ঘরে ফিরতে হতনি। ব্যাটা বেশ কিছুক্ষণ ধানক্ষেত ভুণ্ডুল করে শাসানি দিয়ে গেল, 'আজ গেলি কিন্তু এই গাঙে একদিন তোদের লিব।'

আপদ বিদায় হল।

অন্নদাবাবু আরও খানিক ঘাপটি মেরে বসে থেকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'চল এবার—ব্যাটা গেছে।'

আবার হণ্টন। হাঁটতে হাঁটতে ওই হাটে—ওই যে ঝুরি বাঁধা বটগাছটা, ওর তলায় চেপে বসলেন। পকেট থেকে বার করলেন গুলির সাজ-সরঞ্জাম। বললেন, 'ঢের মেহনৎ গেছে বাবা। এবার দু-এক টান নেশা না হলে আর এক পাও নড়তে পারবনি। নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। লণ্ঠনটা জ্বালা।'

লণ্ঠন জ্বালালাম।

খুদে কলকেয় গুলির ছিটে টিপতে টিপতে গুরুদেব বললেন, 'বার কর দেখি উঁদো চাষা ব্যাটাদের গোচর জমার কাগজ।'

আমি ডলা মলা কাগজ দু'খানা ধরে দিলাম ওনার হাতে।

গুরু বললেন, 'দেশলাই জ্বালা।'

আমি দেশলাই জ্বালালাম।

কাগজ দু'খানা পলতের মত পাকিয়ে আগুন ধরালেন। সেই আগুনে গুলির ছিটে ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তদ্বির কেমন দেখলি নন্দ।'

পায়ে হাত দিয়ে বলেছিলাম সেদিন, 'আপনি গুরুদেব।'

উনি বললেন, 'বাবুকে বলিস—মামলা উনি জিতবেন, কাঁটা সাফ।'

গুরুদেবের গল্প শেষ করে বক্সি কিছুক্ষণ তদ্গত হয়ে চুপচাপ বসে রইল। তারপর চায়ের কাপে শেষ চুমুক একটা দিয়ে বললে, 'গুরুদেব বলতেন—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য...'

বললাম, 'ওদের প্রমাণপত্র নষ্ট করে মামলায় জিত হলো?'

'হলো বৈকি।' বক্সি বললে, 'তারই বাবদ পেয়েছিলাম ওই পাঁচ বিঘে জমির দান-দখল।' তারপর হাটের সেই মিছিলের দিকে চোখ উস্‌কে বললে, 'সেই জমির সব ধানটুকু কেটে নিয়ে গেছে ওই ভূত পিশাচের দল মশয়। বলছে—দানপত্র ফালতু।'

উৎসাহ দিয়ে বলি, 'ঠুকে দাও মামলা। গুরু তো তোমায় বলেই গেছেন—বুদ্ধির্যস্য...'

উঠে দাঁড়িয়ে বক্সি বললে, 'সেদিন গেছে মশয়—তবে আর বলছি কী। এখন—বলং বলং বাহুবলং...যাই মশাই, ওই ব্যাটারা আবার ইদিকে চেঁচাতে চেঁচাতে আসছে! দেখতে পেলে ঘাড় মট্‌কে দেবে।'

বলতে বলতে বক্সি দোকান থেকে বেরিয়ে ফট্ করে ছাতা খুলে হন্ হন্ করে চলে গেল।

প্র শং সা প ত্র

এবার শেষ দলিলের ডাক। এইটে শেষ হলে হাফ ছেড়ে বাঁচি। ঘড়ি দেখলাম—প্রায় পাঁচটা বাজে। সুলতাব কথা মনে কেমন যেন কাঁটার মতো বেঁধে: ঘরে বেচারী একলা···বড় একলাই পড়ে গেছে এখানে এসে। বেয়ারাকে বললাম, 'ডাকো—কেশব সামন্ত, বেচারাম দলুই।'

বেয়ারা নন্দলাল সামনের দরজার কাছে গিয়ে হাঁক পাড়লে, 'কেশব সামন্ত··· বেচারাম দলু···ই।'

একজন আর একজনকে ঠ্যালা দিতে দিতে এগিয়ে এল আমার লাল শালুমোড়া এজলাসের দিকে। আমার ডাইনে বাঁয়ে কেরাণী কপিস্টদের চেয়ার-টেবিল—তাদের মাঝখানে আমার আসন উঁচু করে পাতা। নগণ্য একজন সাব-রেজিস্ট্রার—তা হোক, এই গ্রামে গাঁথা মফঃস্বলে মান্যগণ্য একটা হাকিম তো বটে।

অভ্যাস মতো জিজ্ঞেস করলাম, 'কেশব সামন্ত কে?'

গাঁট্টাগোট্টা মতো মধ্যবয়সী একটি লোক স্পষ্ট গলায় বললে, 'আজ্ঞে আমি।'

দলিলের ভাষায় লোকটি গ্রহীতা—অর্থাৎ ক্রেতা।

এবার বিক্রেতার দিকে তাকালাম—জীর্ণ শীর্ণ, খেউরীবিহীন মুখ, বয়স ৫২ কি ৭২, বোঝবার উপায় নেই। এই চেয়ারে বসে অমন মুখ হাজারটা দেখেছি। গায়ে ছেঁড়া সেলাই-করা একটা ফতুয়া। ইনিই যে মূর্তিমান বিক্রেতা বেচারাম—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দলিলের ভাষায় ইনিই 'দাতা'। দাতাদের এ-চেহারা এখানে এসে ক' বছরে মুখস্ত হয়ে গেছে। তবু আইনমাফিক জিজ্ঞেস করতে হয়, 'নাম?'

'বেচারাম দলুই আজ্ঞা।' লোকটি প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় বললে।

'এই জমি তুমি বিক্রি করছ?'

উত্তরে লোকটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। জড়ান গলায় বললে, 'সাধে কি বেচি হুজুর। আমার আর··'

অত কথা শোনার দরকার নেই, ধৈর্যও নেই। এটা শেষ করতে পারলে বাঁচি। সুলতা একা।···ওকে ধমক দিয়ে বললাম, 'বলি জমিটা বেচছ কিনা?'

'আজ্ঞা।'

'টাকা সব পেয়েছ?' আমার আইন মোতাবেক প্রশ্ন।

লোকটা কান্নায় ভেঙে পড়ে বললে, 'সে গত বছর—এই শেষ দশ কাঠা বাঁধা দিয়ে…'

এ-ও এক অতি পরিচিত ঝামেলা। জানি, দুর্দিনের ঋণ—সে তো শুধু টাকার অংক নয়, তার সঙ্গে জীবনের অনেক সুখ দুঃখ মেশানো। ক'বছরে এখানে ও সব মুখস্ত হয়ে গেছে।

এদিকে দিন শেষ হয়ে এল। কর্মক্লান্ত অফিস। বর্ষার আগে জমি বিক্রির প্রচণ্ড চাপ। বর্ষা নামলেই চাষের কাজে নামবে—ক্রেতারা তার আগে স্বত্ব কায়েম করে নিতে চায়।

বেচারাম তখনো ফোঁপাচ্ছে।…

…কিন্তু সুলতা!…

হেড ক্লার্ক উদ্ধার করল। হুংকার ছাড়লে এক প্রান্ত থেকে, 'কাঁদবে পরে বাছাধন! এখন টাকাটা সব বুঝে পেয়েছ কিনা হাকিমকে বলে আমাদের উদ্ধার করো। পাঁচটা বাজে।'

'হুঁ—হুঁ—হুঁ—' লোকটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে শেষ পর্যন্ত।

আমার কাজ সারা। তারপর সীলমোহর, দস্তখৎ।

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। এবার সুলতা।

বেচারাম শূন্য চোখে চেয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। চুলোয় যাক। এই ক' বছরে কারা শেষ হয়ে গেল—কারা গজিয়ে উঠল, সে হিসাব রাখা আমার কাজ নয়।

বাইরে বেরিয়ে রিক্সা-স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলাম। আমার কোয়ার্টার একটু দূরে।

কিন্তু স্ট্যাণ্ডের দিকে এগুতে এগুতে কেমন একটু খটকা লাগল। আমাকে অফিস থেকে বেরুতে দেখলেই যে লোকটা তার বাহারী সাইকেল রিক্সাটি নিয়ে সাহস করে হাতায় ঢুকে পড়ে আমাকে তুলে নেওয়ার জন্যে—সে আজ নেই। আমি জানি—এ সময় অন্য সওয়ারী তার রিক্সায় উঠে বসলেও সে ধমক মেরে নামিয়ে দেয়, 'নামোঃ। হাকিম যাবেন—দেখতে পাচ্ছ না। নামো বলছি।'

সে নেই। নিশ্চয় সুলতা তাকে নিয়ে বেরিয়েছে।

সে আমার বাঁধা রিক্সাওয়ালা নয়—তবু, সে প্রায় নিত্যদিনের বাহক। অফিসে আসার ঠিক আগে সে আমার বাসার সামনে হাজির হয়ে থাকে। আশ্চর্য, অন্য কোন রিক্সাকেও তখন আমি দেখিনে। হয়তো ঝুটমুট কিছু বলে সকলকে ভাগিয়ে দেয়। অফিস-ফেরতাও আগবাড়িয়ে সে এগিয়ে আসে। যেন আমাকে

নিয়ে আসার গুরুদায়িত্ব আমি একমাত্র তাকেই দিয়েছি। অদ্ভুত কৌশলী ছোক্‌রা।

এই সূত্রে সুলতার সঙ্গে তার আলাপ। কিন্তু সে আলাপ ধীরে ধীরে আমাকে ডিঙিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেল।

সে বোধ করি বছর খানেকেরও আগেকার কথা। হঠাৎ একদিন বাসায় ফিরে দেখি—সুলতা নেই। ঝি চা এগিয়ে দিলে।

ওকে জিজ্ঞেস করলুম, 'দিদিমণি কোথায় ?'

জবাব পেলাম, 'আপনার রিক্সাওয়ালা এসে তাঁকে যে কোথায় বেড়াতে নিয়ে গেল।'

'এই দুপুরে ! পোড়া রোদ্দুরে !'

অজানা অচেনা জায়গা, কে একটা রিক্সাওয়ালা, জোয়ান ছোকরা—কোথায় গেল !—বলা নেই, কওয়া নেই।…মনে অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ও নেই। একমাত্র ভরসা—চালাকচতুর কলকাতার মেয়ে, কলেজে পড়েছে। রুচি আছে। কিন্তু তার উন্নত রুচি থাকলেও রিক্সাওয়ালার থাকবে কী ?

সন্ধ্যার মুখোমুখি ফিরে এল সুলতা।

অবাক চোখে ওকে দেখছিলুম। যেন পিকনিকের হুল্লোড় করে ফিরে এলো। অবিন্যস্ত বেশবাস—আলুথালু চুল, মাথাময় ধুলোবালি। আনন্দে ডগমগ করছে।

ঝিকে ডেকে বললে, 'গোকুলকে চা-রুটি দে।'

রিক্‌সাওয়ালার নাম যে গোকুল, সে-ও আমি প্রথম জেনেছিলুম সুলতার মুখে। এতদিন আমার জানার প্রয়োজন হয়নি—কারণ আমি তার হাকিম সওয়ারী, দু' জনের মধ্যে অথৈ ব্যবধান এবং সে ব্যবধানটুকু আমার অবিচল গাম্ভীর্য দিয়ে ভরা।

গোকুল সরে পড়েছিল চোরের মতো। কিন্তু সুলতার চোখে কৌতুক। বললে, 'রাগ করেছো।'…

আমার দুশ্চিন্তিত গোমড়া মুখে নিশ্চয় সেইরকম কিছু একটা ছিল। আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান, আমার পিতা ত্রিসন্ধ্যা জপ করতেন। সুলতার সেদিনকার চেহারা দেখে তুলসীর দোঁহা স্বতঃই মনে আসছিল : দিন কা মোহিনী রাত কা বাঘিনী…কিন্তু কাল বদলাচ্ছে, সুলতার সামনে আমি অসহায়। আমতা আমতা করে বলেছিলুম, 'না—মানে অচেনা অজানা জায়গা…'

'সে যে কী জায়গা—তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না।' সুলতা সহস্রখানা হয়ে বলেছিল, 'এখানে এত দেখার জিনিস আছে—তা কী তুমি কখনো বলেছ ?

কাউখালির বাতিঘর—ইংরেজ আমলের প্রথম বাতিঘর। জানো? প্রথম টেলিগ্রাফ অফিস কোথায়? বলো দেখি, রামমোহন বিলেত যাওয়ার সময় কোথা থেকে জাহাজে উঠেছিলেন? তারপর সেই বগার বাংলো···আরও কি বললে··· মসনদ-ই আলা।···আর কী বাতাস—কী বাতাস···সামনেই গঙ্গার মোহানা··· বে অফ বেঙ্গল। যেন ঝড় বইছে। কাপড়চোপড় ঠিক রাখা যায় না।' বলে নিজের আলুথালু চুলের রাশি ঠিক করেছিল।

ওর অবিন্যস্ত বেশবাসের একটা কৈফিয়ৎ পেয়েছিলুম। আর বুঝেছিলাম··· কোম্পানীর আমলের ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা সেই ব্যাটা গোকুল। ইতিহাসের ছাত্রী সুলতা নেচে উঠেছে।

সেই মুহূর্তে এই ইতিহাস বস্তুটার ওপরে ক্ষেপে উঠেছিলাম—পারলে মহা-কালের মত দু'হাত দিয়ে সব মুছে দিই। বিদ্রূপ করে বলেছিলাম, 'গোকুল বুঝি কোম্পানীর আমলের ইতিহাসবিদ্।'

'ওমা! ও যে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছে গো!' সুলতা বলেছিল, 'তাছাড়া এ ওর নিজের দেশ। তার গর্ব থাকবে না? উনিশ শ' বিয়াল্লিশের বিদ্রোহে বগার বাংলো দখল করতে গিয়ে ওর কাকা যেখানে ব্রিটিশ সোলজারের গুলী খেয়ে মরেছিল—তাও ও সগর্বে দেখালে।'

শুধু ইতিহাস নয়—দেশপ্রেমও। সুলতা মোহিত। মনে মনে ঠিক করেছিলাম—ছোকরাকে কায়দা করে ধমকে দিতে হবে।

নিজের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য বজায় রেখে ধমকেও দিয়েছিলাম। কিন্তু ফল হলো উলটো। যা ছিল প্রকাশ্য—তা হলো গোপন। সুলতা দুপুরে বেরিয়ে গেলেও, ফিরে আসতো আমার অফিস থেকে ফেরবার আগেই।

একদিন ধরা পড়ে গেল।

কাচুমাচু মুখ করে সুলতা বলেছিল, 'একা একা ঘরের কোণে বসে থাকতে ভালো লাগে না। তুমি সেই কখন ফিরে আস অফিস থেকে। কী করে আমার সময় কাটে বল তো?'

ছেলেপুলে নেই—ইতিমধ্যে সুলতা মা-পিসীমার কাছ থেকে বাঁজা-সন্দেহের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছে। ঢের তাবিজ মাদুলিও উঠেছে ওর অঙ্গে। ওর ম্রিয়মান অপরাধী মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখ পাই। আস্তে আস্তে বললাম:

'বই পড়ে সময় কাটাতে পার। আমাদের অফিস লাইব্রেরীতে কত বই আছে।'

সুলতা হেসে বলেছিল, 'সে তো সব যাত্রা থিয়েটারের বই···শিশরকুমারী,

অগ্নিপরীক্ষা অথবা অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড কি উদ্‌ভট্টি মহারাজের কৈলাস যাত্রা।'

যৌবনের রং বড় তরল, ছল ছল করে সব ভাসিয়ে নেয়। জানি। বেচারী আমি গাঁউলি সাব-রেজিষ্ট্রার! চোখ কান বুজে সেদিন বলেই ফেলেছিলাম, 'ওই গোকুল ছোকরাটার খুব বদনাম কিনা। একা একা ওর রিক্‌সায় ঘুরে বেড়াও - অফিসের সবাই কেমন বাঁকা চোখে দেখে, বাঁকা ঠোঁটে হাসে।'

সুলতা থমকানো চোখে চেয়ে বলেছিল 'কেন গো, ও কী করেছে?'

'হয়তো নেশাভাঙ করে—আনুষঙ্গিক দোষ যে নেই, কে বলবে।' বলেছিলাম, 'এই কিছুদিন আগে নাকি সাইকেল রিক্‌সার হ্যাণ্ডেলে ফর্ ফর্ করে লাল নিশান উড়িয়ে ঘুরেছে—এখন দেখি সেখানে একটা কাগজের ফুল গোঁজা। বোধ করি ডাণ্ডা-বেড়ির ভয়ে এখন ঠাণ্ডা হয়েছে। ওসব বোগাস লোক—যখন যেমন তখন তেমন।'

খানিক থম্‌থমে মুখে চুপ করে থেকে হঠাৎ সে ফেটে পড়েছিল, 'তাতে আমার কি যায় আসে! ওর রিক্‌সাতে আমি সেই বনের ধারে আবার যাবো—যে যাই বলুক।'

আমি কিছুই আর বলিনি। গোপনে শুধু একটা বদলির দরখাস্ত করেছিলাম। ও আর যায় কি না যায়—ইচ্ছে করে তারও খোঁজ রাখতুম না। তবু দু'জনের মাঝখানে কেমন একটা নীরব অস্বস্তিকর অবস্থা ঝুলে রইল। লজ্জাকর প্রকাশ্য বিস্ফোরণকে এড়িয়ে চলতাম।

হঠাৎ ও নিজেই একদিন আবার দেরি করে ফিরে এসে বলেছিল, 'তার চেয়ে পালাই আমি। রেখে আসবে কলকাতায়?'

আমি নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওর মুখে, চোখে, চুলে বেশেবাসে মোহানার সেই ঝড়ো বাতাসের চিহ্ন দেখছিলুম।

ও গোঁ ভরে আবার বললে, 'এখানে থাকলে না গিয়েও আমি পারবো না।'

দৃঢ় ঋজু ভঙ্গী, সুস্পষ্ট কণ্ঠ—চোখে কেমন একটা চাপা পাগলামী।

...আজও হয়তো তেমনি গেছে।

তবে এখন সুলতা আর ঠিক একলা নয়—দোকলা। অলক্ষ্যে আজ সাত আট মাস ধরে অন্য আর একজন ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে তার মধ্যে।

বহুদিনের বহু কথা ভিড় করে আসছিল মনে। হঠাৎ নজরে পড়ল—আমার কোয়ার্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গোকুলের রিক্‌সা।

যা ভেবেছিলাম তাহলে তাই। বোধ ক'রি এখুনি ওরা ফিরে এল।

আমাকে দেখতে পেয়ে গোকুল বলে উঠল, 'আপনাকে আজ আনতে যেতে পারিনি স্যার, ডাক্তারবাবুকে আনতে ছুটেছিলাম। উনি ভেতরে আছেন—আপনি যান।'

'ডাক্তার!'

ঘরে ঢুকলাম ভয়ে ভয়ে। নির্ঘাৎ কোনো বিপদ ঘটিয়ে ফিরেছে আজ সুলতা।

দেখি সুলতা শুয়ে আছে। এখানকার একমাত্র প্রবীণ ডাক্তারবাবুটি তাকে পরীক্ষা করলেন। দেখে শুনে ডাক্তার বললেন, 'নাঃ—বিপদের কিছু দেখছিনে। ভয় পাবেন না।'

সুলতা বললে, 'কিন্তু ঠিক বুকের পাঁজরের নীচে পেটের এইখানটায় কেমন একটা ব্যথা—ওপরে ঠেলে ওঠে যেন।'

'ও কিছু না। ধকল-টকল লাগাবেন না।'

বাইরে এসে ডাক্তার আমায় বললে, 'রিক্‌সা-টিক্‌সায় এখন বেশী না চড়াই ভালো। সন্দেহ হচ্ছে—বাচ্চাটা উল্টে গেছে। ওপরে ঠেলে উঠেছে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'এরকম হলো কেন?'

ডাক্তার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তা অনেক কারণেই হতে পারে।'

লজ্জা সংকোচে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলুম না।

মনে হলো—স্থানীয় ডাক্তারটিও জেনে গেছে সুলতার রিক্‌সা-বিহারের কথা। ফিরে এসে সুলতাকে বললাম, 'ডাক্তার কী বলে গেল জানো? রিক্‌সায় একদম ওঠা বারণ। খারাপ হতে পারে।'

ও-বিষয়ে সুলতা একটি কথাও বললে না—শুধু চোখে পড়ল আমার, মুহূর্তে যেন চোখদুটো ওর ধক্‌ করে জ্বলে উঠল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তার বুঝি গোকুল ডেকে এনেছে?'

'আর কে।'

চুপ করে গেলাম।

মনে মনে সেইদিনই ঠিক করলাম, এবার সময়-সুযোগ করে কলকাতায় গিয়ে কোনো মেটারনিটি হোমে সুলতাকে ভর্তি করে দিয়ে আসব। ওর বাবা-মাও কাছাকাছি আছে। অবিশ্যি এখনও সময় আছে ঢের।

কিন্তু হিসেব আমার ভুল হয়ে গেল। যাই যাই করেও কোন দিক দিয়ে কেটে গেল আরও মাস দেড়েক। পুরানো ব্যথাটাকে টেনে সয়ে চলছিল সুলতা—

বাড়াবাড়ি ঝামেলা কিছু ছিল না। হঠাৎ একদিন কি হলো কি জানি, মাথা ঘুরে পড়ে গেল। ছট্‌ফট্‌ করতে করতে একেবারে অজ্ঞান।

প্রবীণ সেই ডাক্তারবাবুটিকে ডেকে পাঠালাম।

তিনি ভালো করে দেখেশুনে বললেন, 'আরও আগে ওঁকে শহরের কোনো হাসপাতালে নিয়ে গেলে ভাল করতেন। কেসটা একটু জটিল তো—কখন কি হয়। যাই হোক, দু-একদিনের মধ্যেই নিয়ে চলে যান। এ আমাদের অজ গ্রাম দেশ, আপনাদের মত লোক এখানে থেকে ঝুঁকি নেবেন কেন।'

বিবর্ণ মুখে চুপ করে ভাবছিলাম।

ডাক্তার বললে, 'দেখবেন—নিয়ে যাওয়ার সময় যেন একটুও ধকল না লাগে। একটুও হাঁটানো চলবে না। কিন্তু নেবেন ওঁকে কী করে! চারদিকে তো বানের জল এসে গেছে।'

কথায় বলে—বিপদ একা আসে না।

এদেশ দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলাব নিম্নাঞ্চল। হঠাৎ বর্ষা নেমেছে অঝোর ধারায়। মৌসুমী তো আছেই—তার ওপর দক্ষিণের উপসাগর অঞ্চলে নিম্নচাপ একটার পর একটা লেগেই আছে। তাই ঝড় আর বন্যা এখানকার নিত্য সঙ্গী। আজকের ডাঙা কাল এক কোমর জলের তলায়।

হেড ক্লার্ক পুরানো লোক—এখানে বহুদিন আছেন। তাঁকে বললাম আমার সমস্যার কথা।

তিনি বললেন, 'সর্বনাশ, আপনি বোধ করি জানেন না স্যার বানের জল আমাদের ঘিরে ফেলেছে। দেখছেন না—কদিন অফিস একেবারে খালি, রিক্‌সা-গুলো পর্যন্ত কে কোথায় সরে পড়েছে।'

তাই তো!

আমি লক্ষ্য করিনি। রিক্‌সা-স্ট্যাণ্ড খাঁ খাঁ করছে। এমন যে গোকুল—সে-ও নেই।

হেড ক্লার্ক বললেন, 'আমাদের অফিস অবশ্য ইংরেজদের পুরানো কুঠি বাড়ি—এ খুবই উঁচু জায়গায় তৈরী। এখান থেকে বোঝার উপায় নেই—আশপাশের গ্রামদেশে কি হচ্ছে।'

'সাইকেল-রিক্‌সা যাবে না?'

'শুনলাম—বানের জল বার করবার জন্যে চাষারা লোকাল বোর্ডের রাস্তা কোথায় কোথায় যেন কেটে দিয়েছে। সাইকেল-রিক্‌সা যাবে কী করে?'

সুলতাকে সবই বললাম।

ও বললে আস্তে আস্তে, 'কদিনই আমার মনে হচ্ছিল—আমি আর বাঁচবো না। আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমার শাস্তি তোলা আছে।…'

শাস্তি! কিসের শাস্তি? ও কি সন্দেহ করছে—ইচ্ছাকৃত অবহেলায় ধীরে ধীরে ওকে ঠেলে দিয়েছি অনিবার্য সংকটের দিকে, মৃত্যুর দিকে। অথবা ওর কোনো অজ্ঞাত অপরাধ-বোধ? ওর ফ্যাকাসে মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। ছুটে পালালাম।

বেয়ারা নন্দলাল বললে, 'বেহারা পাড়ায় পাল্কীর একটা খোঁজ করব স্যার?'

যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। বললাম, 'এক্ষুণি ছুটে যা—না হয় চল, আমিও যাই তোর সঙ্গে।'

'আপনার নামেই কাজ হবে স্যার—যদি পাল্কী থাকে। আপনাকে আর যেতে হবে না।' বলে নন্দলাল চলে গেল।

ফিরে এল ঘণ্টাখানেক বাদে। সঙ্গে একটি লোক—বোধকরি বেহারা পাড়ার কেউ হবে। কেমন যেন চেনাচেনা মনে হয় লোকটাকে—কবে কোথায় যেন দেখেছি।

লোকটি মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে বললে, 'দণ্ডবৎ হুজুর। মোকে চিনতে পারেন? বেচারাম দলুই। পিতার নাম মহেশ্বর দলুই। মাস দেড়েক আগে মোর শেষ জমিটুকু রেজিস্ট্রি করতে এসেছিলাম।'

চিনেছি। মনে পড়ছে সেই ওর কান্না। সাগ্রহে বললাম, 'একটা পাল্কীর ব্যবস্থা করতে পার? বড় বিপদে পড়েছি।'

'পাল্কী কোথায় হুজুর।' নন্দলালকে দেখিয়ে বললে, 'ও নিজের চোখে দেখে এসেছে মোর ঠাকুর্দার কালের পাল্কী—ওকে জিজ্ঞাসা করুন।'

নন্দলাল বললে, 'সে ছপ্‌পর ভেঙে, ডাণ্ডি ভেঙে পড়ে আছে স্যার। ওর নাতিরা এখন রিক্সা চালায়।'

'কাল বদলে গেছে হুজুর।' বেচারাম বলল, 'ছোকরারা কাঁধ থেকে পাল্কী ফেলে দিয়েছে। নিম্‌কী সাহেবের পাল্কী ছিল হুজুর—সারা বচ্ছর বইতাম। মোর ঠাকুর্দা পেয়েছিল পঁচিশ বিঘা চাকরান জমি।'

ওর সে দুঃখের কথা শুনে আমার দুঃখ ঘুচবে না। বুড়োকে বিদেয় করে সুলতাকে গিয়ে বললাম, 'কোন ব্যবস্থাই করা গেল না। রিক্সা চলবে না, পাল্কী নেই। যাওয়ার কোনো উপায়ই দেখি না।'

সুলতা বালিসে মুখ গুঁজে আছে—শরীরটা একটু একটু করে যেন কেঁপে উঠছে। হয়তো ব্যথা চাপছে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তারবাবুকে খবর দেবো ?'

'নাঃ।' একটু থেমে সুলতা বললে, 'গোকুলকে একটা খবর দিতে পারো ?'

হতাশ কণ্ঠে বললাম, 'সে আর কী করবে। দেখি চেষ্টা করে কোথায় খোঁজ পাই তার।'

নন্দলালকে বললাম, 'গোকুলকে খোঁজ করে দেখ। পেলে তাকে পাঠিয়ে দিস আমার স্ত্রীর কাছে।'

চারদিকে শুধু জলের বেড়াজাল নয়—দুর্ভাবনার অথৈ সমুদ্রে তখন হাবুডুবু খাচ্ছি। অফিসে কাজ নেই। দু'জন কেরাণী বানের খবরে ছুটি নিয়ে গ্রামে চলে গেছে, নন্দলালও যাই যাই করছে। কপিস্টবাবুরা কেউ-ই নেই। আমি তাকিয়ে আছি নিরুপায় হতাশায়।

খানিকবাদে গোকুলকে কোথা থেকে পাকড়াও করে আনলে নন্দলাল। সুলতার সঙ্গে তার কী কথা হলো জানিনে—ওদের মাঝখানে আমি ইচ্ছে করে যাইনি। শুধু দেখলাম—বাঁই বাঁই করে সে রিক্সা ছুটিয়ে কোথায় চলে গেল।

যাক্। সাইকেল রিক্সা নিয়ে ওর আর কিছুই করার নেই। কারণ আগেই জেনেছি—বর্তমান দুর্দিনে ও অচল।

কিন্তু ঘণ্টা কয়েক বাদে ও কোথা থেকে ঘুরে ঘুরে এসে বললে, 'এখনো যেতে পারা যাবে স্যার। তৈরী হোন তাড়াতাড়ি।'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী বলছ। কোথায় কোথায় নাকি সড়ক কেটে দিয়েছে। সাইকেল রিক্সা যাবে ?'

'সড়ক ছেড়ে একটু ঘুর-রাস্তায় যেতে হবে স্যার—সে রাস্তা আমি খুঁজে বের করেছি।' গোকুল বললে, 'হয়তো একটু দেরি হবে। তবু সন্ধ্যের মুখে আপনাদের মহকুমার মোটরে তুলে দিতে পারবো।'

সুলতা চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। বললাম, 'পারবে ?'

'পারবো।' ছোট্ট স্পষ্ট একটু কথা।

কি জানি কেন, মনে হলো—ও পারবে। সুলতাকে ও ইচ্ছে করে বিপদে ফেলবে না।

হেডক্লার্কের হাতে এখানকার সব ভার দিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘুরে ঘুরে চলেছি। কখনো সড়কে, কখনো গাঁউলি রাস্তায়। কখনো সুলতাকে

ধরে রিক্সায় বসি, কখনো হাঁটি রিক্সার পেছনে পেছনে। অত্যন্ত সন্তর্পণে গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে গোকুল। সঙ্গী নিয়েছে আর একজন ছোকরাকে। পথঘাট আমার কিছুই জানা নেই—অন্ধভাবে অনুসরণ করে চলেছি ওকে। দু' পাশের মাঠ জল প্লাবিত—খেত ডুবে গেছে। যতদূর চোখ যায়—শুধু জল আর জল। মাঝে মাঝে সবুজ গাছ-গাছালি নিয়ে মাথা তুলে আছে গ্রামগুলি। কে জানে—যে পথে ঘুরে ঘুরে চলেছি সে পথ হয়তো রুদ্ধ হয়ে যাবে নতুন কোনো জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে।

আকাশে সূর্য নেই। কেবল একটা মেঘলা আলো। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটা। কখনো টিপি টিপি বৃষ্টি। দেখতে দেখতে একসময় মেঘলা আলোটুকুও অন্ধকারে ম্লান হয়ে এলো। বুঝলাম সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। গোকুলকে জিজ্ঞাসা করি, 'আর কতদূর হে!'

ও শুধু বললে, 'চলুন—ভয় নেই। একটু ঘুরে যাচ্ছি বানের জল এড়িয়ে, তাই দেরি হচ্ছে।'

ও নীরবে রাস্তার উঁচু নীচু গাড়াগর্ত এড়িয়ে সন্তর্পণে ঠেলে নিয়ে চলেছে রিক্সা। মনে হলো—মমতার হাত, মানুষের গায়ে নয়—যেন পড়েছে ওই বোবা রিক্সার হাতলের ওপরে।

সন্ধ্যে হয়ে গেল। অন্ধকারে এসে দাঁড়ালাম আমরা ছম্‌ছমে্‌ জলরাশির সামনে। আর পথ নেই।

এই ভয়টাই করছিলাম। আঁৎকে উঠলাম। লোকটা এ কোন বিপদের সামনে এনে ফেলে দিলে! সন্দিগ্ধ চোখে তাকালাম ওর দিকে—কী ওর মতলব! বিশ্বাস তো ওকে কোনদিন করিনি।

গোকুল বললে, 'এই জলটুকু পার হতে হবে।'

'সর্বনাশ!' সভয়ে বললাম, 'কতটা জল হবে কে জানে।'

'আমি তখন এসে নেমে, দেখে গেছি।' গোকুল নির্ভয়ে বললে, 'জল বড়জোর হবে হাঁটুর ওপরে।'

'জলের টানও তো আছে?'

'তা হবে একটু।'

'উপায়?'

'পার হতেই হবে। আর পথ নেই।' গোকুলের কণ্ঠ স্পষ্ট, দৃঢ়, সঙ্কল্পিত। বললে, 'ভয় নেই স্যার—আমার পেছনে পেছনে আসবেন।' তারপর ঘুরে সঙ্গের ছোকরাটিকে বললে, 'জগা, নেমে দেখে আয় একবার।'

জগা নেমে গেল। জলে অন্ধকারে হঠাৎ যেন সে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে তার গলা শোনা গেল, 'জল কোমর পর্যন্ত।'

গোকুল বললে, 'বেড়ে গেছে এই ক' ঘণ্টায়। আর দেরি নয় স্যার।'

সুলতা নেমে দাঁড়িয়েছে রিক্সা থেকে। কাপড়চোপড় সাপ্টে নিজে তৈরী হলাম। কিন্তু সুলতার কী হবে!

বিপদের মুখে সূক্ষ্ম সম্ভ্রমবোধ থাকে না। বুঝতে পারছি—সব ভোঁতা হয়ে গেছে।

গোকুল তার খাঁকি হাফ সার্টটা খুলে মাথায় জড়িয়ে নিলে। ছেঁড়া পাজামা গুটিয়ে গামছা এঁটে পরল। সেই অন্ধকারে পাশে দাঁড়িয়ে ওর জোয়ান দেহটার দিকে চোখ পড়ল। হঠাৎ মনে হলো—ও এত বিশালকায়! এত বলিষ্ঠ—পেশল! আমি আর সুলতা ওর কাছে খুদে দুটো মানুষ বৈ আর কিছুই নয়।

সুলতার দিকে ও ঘুরে দাঁড়াল। বললে, 'দিদিমণি, এখন লজ্জার সময় নয়। আমার গলা শক্ত করে ধরে থাকবে।'

এক লহমায় ও সুলতাকে কোলপাঁজা করে তুলে নিলে। তারপর জলে ওর ছপ্ ছপ্ পায়ের শব্দ। আমি চলেছি ওর পাশে পাশে। ধরে রেখেছি সুলতার মাথাটা।

সুলতা বললে, 'ছেড়ে দাও তুমি।'

বুকের গভীরে ধক্ করে কোথায় লাগল যেন। ছেড়ে দিলাম। সম্পূর্ণ গোকুলের হাতে। গোকুল চলছে বোঝা নিয়ে। থম্‌কে থম্‌কে। অতি সন্তর্পণে।

কি বিশ্রী জলের টান। পা রাখা যায় না। অন্ধকারে অগ্রসরমান শুধু একটা কালো মূর্তিকে অনুসরণ করে চলেছি—ভয়ে ভয়ে। যদি সুলতা পড়ে যায় খসে।

মনে জানি—সুলতাকে ও ফেলে দেবে না। দিতে পারবে না।

গোকুল চেঁচিয়ে বললে, 'জগা—টর্চ মার।'

জলের ওপারে টর্চ জ্বলে উঠল। আর বেশীদূর নয়।

এক সময় জল পার হলাম।

জিজ্ঞেস করলাম, 'এমন জল আর কটা আছে?'

'আর নেই।' গোকুল দম নিতে নিতে বললে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচলাম।

ওরা দু'জন আবার জলে নেমে মাথায় করে রিক্সা পার করে আনল। আমার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গোকুল বললে, 'এবার রাস্তা ভালো। রিক্সায় দু'জনেই

উঠুন। বেশী দূরও আর নয়—প্রায় এসে পড়েছি। এবার মোটরে চলে যেতে পারবেন মহকুমা শহরে।'

কলকাতায় আর যাওয়া হয়নি। মহকুমা হাসপাতালেই সুলতাকে ভর্তি করতে হয়েছিল। সেখানে দু'মাস কাটিয়ে ফিরে এল সুলতা। কোলে ছেলে।

হঠাৎ যেন জীবন থেকে মুছে গেল সব ঝড় ঝাপটা। এখন প্রশান্ত শরতের আকাশ কী গভীর নীলে দিগন্ত থেকে দিগন্তে প্রসারিত। আসন্ন শুভ দিনের সম্ভাষণ নিয়ে যেন আকাশে উড়ছে শঙ্খচিল আর নীলকণ্ঠ পাখি। ও ঘর থেকে ভেসে আসছে খোকার কান্না আর তার মায়ের আদর।

পিঠে পিঠে এতদিনের প্রত্যাশিত বদলির হুকুমও এসে গেল। আনন্দে তোড়জোড় সুরু করে দিই এখানকার পাততাড়ি গুটোবার।

যাওয়ার দিন সকালে গোকুল এসে দাঁড়াল সামনে। মুখ নীচু করে বললে, 'আপনার সঙ্গে আমার ঠাকুর্দা একটু দেখা করতে চায় স্যার।'

বললুম, 'ডাকো।'

বেহারা পাড়ার সেই বুড়ো বেচারামের হাত ধরে এসে দাঁড়াল গোকুল।

একটু অবাক হয়ে বললাম, 'এই তোমার ঠাকুর্দা!'

মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করে বেচারাম বললে, 'দণ্ডবৎ হুজুর।'

গোকুল চলে গেলো।

বুড়োকে বলি, 'ভালো আছ বেচারাম।'

'আপনার দয়া।' বলে বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ হাতজোড় করে বললে, 'গোকুলকে একটা সাটীফিটি দিয়ে যান হুজুর।'

'সাটীফিটি!' বুঝতে পারলাম না।

'হ্যাঁ বাবু—এই যে—' বলতে বলতে বুড়ো ফতুয়ার পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত এক গোছা কাগজ বের করে আমার হাতে গুঁজে দিলে। বললে। 'দেখুন, এইরকম একটা—ভালো করে—সে আর আপনাকে কি বলবো হুজুর…'

দেখছিলাম কাগজগুলো। সার্টিফিকেট—প্রশংসাপত্র। সেই কোন্ কালের কোন্ নিমকী সাহেবের দস্তখৎ করা জরাজীর্ণ কাগজ, ঘোড়া থেকে পড়ে পা ভাঙা কোন ইংরেজ কালেকটারের দেওয়া কয়েক ছত্রের প্রশংসাবাণী, কোন জমিদারের প্রশংসাপত্র, কোন দারোগার দু'চার ছত্র লেখা।

বুড়ো বলে যাচ্ছিল: 'তখন পাল্কী ছিল হুজুর—এই সব ভারি ভারি লোকের কাগজ পেয়েছে মোর তিনপুরুষ। এখন—' বুড়ো একটু থেমে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে বললে, 'দিন বদলে গেল। পাল্কী নাই—সাইকেল রিক্‌সা। তবু দেন যদি গোকুলকে দু'কলম লিখে।—'

'নিশ্চয় দেবো। সে-ও কী কম করেছে!' কী লিখবো—মনে মনে ভাবছিলাম। বংশ পরম্পরায় অত্যন্ত সুযোগ্য বাহক! ওর পূর্বপুরুষের পঁচিশ বিঘে চাকরাণ জমি গেছে, পাল্কী গেছে, ইংরেজ গেছে, জমিদার গেছে—দিন নাকি বদলেছে। বদলাক, তবু আমরা আছি না? বংশানুক্রমে এমনি আমাদের সুখে বহন করো। সেবাই পরম ধর্ম।

বললাম, 'দেবো—খুব ভালো করে লিখে দেবো গোকুলকে।'

কিন্তু গোকুলের দেখা আর পাইনি। যাওয়ার সময়েও না।

কোয়ার্টারের সামনে গোটা চারেক রিক্‌সা প্রস্তুত। আমার এখানকার গেরস্থালিতে ঠাসা। সামনের রিক্‌সায় সুলতা বসেছে তার ছেলেকে নিয়ে। ওটি সেই গোকুলের রিক্‌সা—হ্যাণ্ডেলে ফুল গোঁজা। কিন্তু সে নেই—অন্য আর একজন। পেছনের রিক্‌সায় আমি।

সুলতা জিজ্ঞেস করেছিল লোকটিকে, 'গোকুল কই? সে যাবে না!'

লোকটি জবাব দিলে, 'কে জানে কী হলো আজ তার—বললে—তুই যা, আমি আজ আর পারব না!'

পেছন থেকে তাড়া দিয়ে বললাম, 'চলোহে—এগোও!'…

ভাঙন

১

নারান বাঁড়ুয্যে না আবেদন করেছে সরকারী অর্থ সাহায্যের – না নিতে গেল তামার মানপত্র।

চোখে পড়েছে পুরানো বিপ্লবী বন্ধুদের। শুধু চোখে পড়া নয় – ঢের বেশী লেগেছে তাদের মনে। হোক বিপ্লবী – মানুষ তো।

কথা হচ্ছিল ওদের বিপ্লবী বিহারের বারান্দায় বসে। সামনে সকালের খবরের কাগজ। মানপত্র অনুষ্ঠানের খবর বেরিয়েছে – ছবিও বেরিয়েছে।

মধু আড্ডি বেতো ডান পাটা দু-হাতে ধরে রোদের দিকে সরিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'নারানের কাণ্ডটা দেখলে।'

অতুল দত্ত পাকা দাঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'চিরকাল ও একটা পাগল।'

'পাগল!' মতি মুখুজ্যে হাতের লাঠিটা বিশীর্ণ কম্পিত হাতে মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে উত্তেজিত গলায় বলল, 'পাগল নয় অতুল—ও ওর গরব। বাহাদুরী।'

'বাহাদুরীই।' কানু রায় বলল, 'মনে পড়ে চন্দননগর এ্যাকসনের কথা? নির্দেশ মাফিক আমরা পেছিয়ে গেলাম – উনি পিস্তল বাগিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। কী না – একটা গোরাকে অন্তত নেবো। তেমনি লাগল পায়ে বুলেট। ওকে বাঁচাতে সে কি মুস্কিলের কাণ্ড – মনে আছে নিশ্চয়?'

মধু আড্ডি বাতের ব্যথায় একটু ককিয়ে উঠল। রোদের দিকে একটু সরে বসে বলল, 'এই যে আমরা এতগুলো ওর সঙ্গী-সাথী আছি এখানে, একদিন দেখা করতে এসেছে? মতিই ঠিক বলেছে – ওর গরব।'

নাটু গুপ্ত হাঁপানীর রোগী। চুপচাপ এতক্ষণ হাঁপিয়ে যাচ্ছিল। দম নিয়ে নিয়ে বলতে লাগল, 'কে জানে--আমাদের এই বিহারটাকে···হয়তো ও কৃপার চোখে দেখে। সরকারের তৈরী তো! একালের চ্যাংড়াদের মত হয়তো বলে··· পিঁজরাপোল।'

'পিঁজরাপোল!' মতি মুখুজ্যে রোগা রোগা হাতে লাঠিটাকে বন্দুকের মতো ধরে বলে উঠল, 'সেকাল হলে খতম করে দিতাম।'

নাটু গুপ্ত টেনে টেনে বলল, 'সেকাল আর নেই মতি। যতো হোক এখন সরকারী খয়রাত···'

'না।' মতি মুখুজ্যে জোর দিয়ে বলল, 'দেশের মানুষের দান বলো, ভালবাসা বলো, বলো শ্রদ্ধা। দেশ আজ স্বাধীন। তার জন্য আমরা কম করিনি।'

কানু রায়ের চোখে অতীতের স্বপ্ন। বলল, 'মনে পড়ে মাধবপুরের থানা রেড? আমাদের তিনটে গেল।...'

'আমাদের দল আজ নেই। তা নাই বা থাকল!' মতি মুখুজ্যে কঠিন গলায় বলল, 'আমাদের কাছে ও আজ দলত্যাগী। দাম্ভিক।'

'তোমরা ওকে ত্যাগ করো আর যাই করো—ওর এক মেয়ে আছে, জামাই ফলাও কারবারী।' অতুল দত্ত আস্তে আস্তে বলল, 'একটি নাতিও আছে শুনেছি—সে-ও ভালো চাকরী করে কোথায় যেন।' অতুল দত্ত একটু থেমে আবার বলল, 'তোমাদের কে আছে? বে-থা তো আমরা কেউ কবিনি।...'

কারুর মুখে আর কথা জোগাল না কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত মধু আড্ডি এবার তার বাঁ পা-টাও রোদে টান টান করে দিয়ে ককাতে ককাতে বলল, 'আছি আমরা পুরানো সঙ্গীরা—আছে আমাদের বিপ্লবী-বিহার—যদ্দিন বাঁচি।'

শহরতলির একপ্রান্তে ওদের বিহার। অদূরে মস্ত এক জলা—কচুরিপানায় ঠাসা। সবটা কেমন নিঃসাড় নিঃসীম ঠাণ্ডা একটা গুমোটে ভরা। এই কটা প্রাণীর হঠাৎ থেমে যাওয়ার সঙ্গে কোথায় যেন তার একটা মিল আছে। মিল আছে বোধ করি জীবনেরও—অমনি ঠাণ্ডা, পরিত্যক্ত, অনুর্বর।

সবাই চুপ।

অতীতচারী কানু রায় শুধু চুপ করে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে যেন আপন মনে বলতে লাগল, 'সে ঢের দিন আগের কথা। তা হবে—চব্বিশ পঁচিশ বছর হবে। নারানের নাতির অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম। ওর মেয়ে এসে বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে দিয়ে বলেছিল—আশীর্বাদ করুন কাকাবাবু। আশীর্বাদ করে নাম দিয়েছিলাম বিপ্লব। কে জানে—সে নাম তার আছে কি বদলেছে।'

মতি মুখুজ্যের রাগটাই কি না বেশী। বলে উঠল, 'বদলালে ওই রেনিগেড নারানটাই বদলেছে। এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি।'

ঘুরে ফিরে আবার সেই প্রসঙ্গ।

অতুল দত্ত অভ্যাস মতো তার পাকা দাড়িতে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'চলো না সবাই মিলে যাই একদিন নারানের কাছে—শুনি, ও কি বলে।'

'ওই হামবাগটার কাছে।'

'কখ্খনো না।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে অতুল।'

নানা মন্তব্যে সবাই প্রায় এক সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল।

২

না—বদলায়নি। কানু রায়ের দেওয়া নামটাই বহাল আছে—বিপ্লব। চেহারায় আর পাঁচটা মানুষের মতোই। এ বিপ্লব যে কেউ হতে পারে।

হঠাৎ একদিন সে দিল্লী থেকে এসে হাজির।

বাড়িতে ঢুকতে সামনেই পড়ে দাদুর ঘর। দরোজায় উঁকি মেরে সে বলে গেল, 'এসে গেছি দাদু। বের করে রাখ তোমার তাম্রপত্র। জামাকাপড় বদলে আসছি।'

প্রায় আধ ঘণ্টাটাক পরে হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে বিপ্লব দাদুর ঘরে এসে ঢুকল। বলল, 'কই দেখি।'

নারান বাঁড়ুজ্যে মুখ টিপে একটু হেসে বলল, 'তা হঠাৎ এসে পড়লি যে!'

'তোমার মানপত্র দেখতে।'

'আর ছলনা কেন ভাই। আসল টানটা যদি না জানতুম তা না হয় এক কথা ছিল।'

হঠাৎ বিপ্লবের মুখটা যেন শুকিয়ে গেল। বলল, 'মানে!'

'আজ দু-তিন দিন ধরে দেবযানীর ফোনে খোঁজ পাচ্ছি। ওকি এলো—ও কি এলো—ওকি এলো। তাতেই বুঝেছিলুম—এই সপ্তাহে হয়তো কোনো একদিন এসে পড়ছিস।'

'ওহো···হো···হো।' এক দফা হেসে নিয়ে বিপ্লব বলল, 'ও নিশ্চয় মার কাছ থেকে খবরটা পেয়েছে। মাকে জানিয়ে ছিলাম। মা লেলিয়ে দিয়েছে তার সখী কন্যাটিকে। ও কথা থাক। কেমন মানপত্র পেলে দেখাও।'

পরিহাস চঞ্চল মুখের পেশীগুলোয় এবার গাম্ভীর্য দৃঢ়তর হলো। নারান বাঁড়ুজ্যে বলল, 'আমার কোনো মানপত্র নেই ভাই।'

'মানে? কাগজে দেখলাম যে! ভুল দেখলাম?'

'ভুল হয়তো দেখনি। ভুল বুঝেছ।' নারান বাঁড়ুজ্যে আর এক দিকে তাকিয়ে বিরস গলায় বলল, 'মান সম্ভ্রমের এমন কিছু করেছি বলে আমার মনে হয়নি। না আমার উদ্দেশ্যের—না আমার আদর্শের। তাই ওই তাম্রপত্র না মানপত্র নিতে আমি যাইনি বিপ্লব।'

'দাদু ব্রেভো! হাজার কনগ্রাচুলেসন!' বিপ্লব উঠে দাঁড়িয়ে সামনে নারান বাঁড়ুজ্যের যে হাতটা পেলে সেটাই কষে ঝাঁকানি দিতে লাগল।

'ওরে—ও হাতটায় বাতের ব্যথা—বাতের ব্যথা।' নারান বাঁড়ুজ্যে কাতরাতে লাগল।

'যাক, আমার বন্ধুমহলে কথাটা জাঁকিয়ে বলার মতো।' বিপ্লব বলল, 'সোনা রূপো হলেও বুঝতাম—বাপা এ বাঙ্গা পিতল। এ বাজারে দুদিন ভাঙিয়ে খাওয়ারও সুযোগ নেই।' একটু থেমে হেসে বলল, 'এ আমি হলপ করে বলতে পারি, দাতারা বেশ ভেবেচিন্তে বুঝেসুঝে তামার ব্যবস্থা করেছে হীতারা ভাঙিয়ে খেয়ে ফেলে।'

'দাতা আর গ্রহীতা দু'পক্ষ সম্পর্কেই তোর ধারণাটা বড় নিচু বিপ্লব।'

'কালের অভিজ্ঞতা দাদু বড় নির্মম—জানি তোমার কাছে খুব কঠিন লাগবে, রূঢ় লাগবে।' বিপ্লবের কথায় আর কৌতুকের লেশ নেই।

'তোদের কালে বুঝি সব কিছু বাজার দামে থতিয়ে দেখার রেওয়াজ?'

'না দেখলে—আমরা বোকা।'

'তা হলে তোর শ্রীমতী দেবযানীর ব্যাপারটাকেও কি বাজার দামে চড়াবি—না ওটার বেলায় বলবি, ওটা ব্যক্তিগত বোকামি—হ্যাঁরে সুবিধেবাদী?'

'ওখানেও বাজার-দাম দাদু।'

পরিহাস তরল কণ্ঠে নারান বাঁড়ুজ্যে বলল, 'বলিস কী! এতদিনের অমন জমজমাট প্রণয় কাণ্ডটা! যাকে বলে নিবিড় হৃদয়সম্পর্ক। আত্মীয়স্বজন পাড়া-পড়শী—মায় কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত সবাই সজাগ।'

বিপ্লব ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'দিল্লীতে একটা মানানসই চাকরী না পেলে ও কী এমন করে আমার পিছু ধাওয়া করত—না ওর বাড়ীর সবাই ওকে কষে এমন মদৎ জোগাত?'

'বটে!' নারান আহত কণ্ঠে বললে, 'চুলোয় যাক তোদের চ্যাংড়াচেংড়ির হৃদয়রহস্য। জানিস, তোর মায়ের সঙ্গে ওদের কতদিনের সম্পর্ক?—সখিত্ব?'

বিপ্লব তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সব উবে যেত।'

'তুই দেবীকে বিয়ে করতে যাচ্ছিস এই ধারণা নিয়ে!' বেদনাহত কণ্ঠে নারান বলল, 'বিয়ের দিনকে আর বোধ হয় হপ্তা তিনেক মাত্র বাকি। এদিকে দুই পরিবারের দুই সখী মিলে কষে লিস্টি করছে উৎসবের!' একটু থেমে বিপ্লবের আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নারান গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করল,

'ব্যাপার কি বল দেখি ভাই—হঠাৎ দেবযানী সম্পর্কে তোর এ রকম একটা বাজে ধারণা হলো কেন? কিছু ঘটেছে কী?'

'না—তা না।'

'তবে? এখন রাজধানীর মানুষ তুই—শুনি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের রাজকর্মচারী। বলি—ওখানে দেবযানীর কোনো শর্মিষ্ঠা উদয় হল নাকি?'

'শর্মিষ্ঠারা না থাকলে দেবযানীর অস্তিত্বই অর্থহীন, মহাকাব্যেও।' বিপ্লব হাসতে হাসতে বলল, 'দিল্লীর চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন দেখতে চাই—একালের মহাকাব্যে ওই দেবযানী শর্মিষ্ঠারা কি করে। সেকালের মত একজন ভদ্রলোককে নিয়ে চুলোচুলি করে—না যে-যার ভদ্রলোক, ঘরসংসার আর বছর বছর ছেলে-পুলে নিয়ে দিব্যি জীবনটাকে ভোগ করে।'

হাসতে হাসতে বিপ্লব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বুড়ো নারান বাঁড়ুজ্যে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। মনে হলো—সেই ছোট বিপ্লব বড় হয়ে আর তাকে চেনা যাচ্ছে না। আরও মনে হলো—শুধু এই পরিবার নয়, আরও একটি পরিবারের আসন্ন উৎসবের মুখে না জানি কি একটা অশুভ বিপর্যয় ঘটে যায়। কে জানে, এগুলো শুধু বিপ্লবের একালের মতাদর্শের কচকচি—অথবা তলায় তলায় কিছু একটা হয়তো ঘটেছে। বিপ্লবের মা উমাকে এ সব কথা জানিয়ে রাখা দরকার।

কিন্তু তাকে জানাবার আগে বিকেলে উমা এসে জানাল আরও এক কথা। বিপ্লব নাকি দিল্লীর চাকরীতে ইস্তফা দিয়েই চলে এসেছে।

উমা কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'ওকে তুমি বোঝাও বাবা। সরকারী চাকরী, মর্যাদা ছিল—ভবিষ্যতের আশা ছিল। ইস্তফার চিঠি এখনও তো ফিরিয়ে নিতে পাবে।...'

শুধু পরিহাস নয়—চাকরি ছাড়ার প্রসঙ্গটা তা হলে সত্যি। নারান বাঁড়ুজ্যের মনে পড়ল বিপ্লবের সকালের কথাগুলো। তার সন্দেহ বদ্ধমূল হল—নিশ্চয় কিছু একটা কাণ্ড ঘটেছে। উমাকে জিজ্ঞেস করল, 'দেবযানী আর বিপ্লবের মধ্যে কোনো কারণে কোনো রকম কিছু মন কষা-কষি ঘটেছে বলে মনে হয় তোর?'

উমা আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি তো জানি না।' বলল, 'খোকা তো থাকে দিল্লী—আর দেবযানী এখানে। কবে কী ঘটল!'

'আচ্ছা, দেবযানী মেলামেশা বা ঘোরাফেরা করে কাদের সঙ্গে?'

'সে তো ওর কলেজ-য়ুনিভার্সিটিতে পড়া কত বন্ধু-বান্ধব আছে।'

'না না—আমি বলছি এমন সব লোক, যাদের ধর খোকা তোর পছন্দ করে না ?'

'তারা সবাই তো প্রায় খোকারই বন্ধু। আর অন্য কেউ থাকলে কেমন করে জানব ?'

নারান বলল, 'আমার মনে হচ্ছে—কিছু একটা ঘটেছে।'

উমা প্রায় কেঁদে ফেললে। বলল, 'এখন আমি কী করি। এদিকে বিয়ের দিন ঠিক।'

'কাঁদিস নে। দেখি বিপ্লবের সঙ্গে একটু কথা বলে।' নারান শুধু উমাকে এইটুকু জানাল, 'মনে হচ্ছে, হয় দিল্লীতে—নয় এখানে কিছু একটা ঘটেছে।'

উমা চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'সারা দুপুর ও ঘর বন্ধ করে কী সব কাগজপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল—উঁকি দিয়ে একবার দেখেছিলাম।'

চিঠি-টিঠি নয়, কাগজপত্র।···

এই সময়ে ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল রাঁধুনি বলদেও সিং। নারান বাঁড়ুজ্যে তাকে ডেকে বলল, 'দাদাবাবু ঘরে আছে ?'

'মালুম তো হোয়—আসে।'

'বল গিয়ে—আমি ডাকছি।' মেয়েকে বিদেয় করে দিলে নারান, 'তুই যা এখন—আমি কথা বলি।'

খানিক বাদে বিপ্লব এল তার দাদুর ঘরে। বাইরে বেরোবার সাজ-পোশাক পরা, হাতে একটা এ্যাটাচি।

নারান জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও বেরুচ্ছ ?'

'হ্যাঁ, একটু কাজ আছে।' বিপ্লব বসল একটা চেয়ার টেনে—বলল, 'কিছু বলবে ?'

'দিল্লীর চাকরি ছাড়ার কথাটা কী সত্যি ?'

'সত্যি বৈ কি।'

'ওখানে কোন গোলমাল হয়েছে কী ?'

'কিচ্ছু না।'

'তবে ? সরকারী চাকরী—তোর মুখেই শুনি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এমন চাকরি ছেড়ে···'

'বোম্বে যাব দাদু।' বিপ্লব বলল, 'ওখানে এক বিদেশী ফার্মের কাজ—মাইনে ঢের বেশী।'

'শুধু মাইনে ?'

বিপ্লব বলল, 'বাইরে যাওয়ার সুবিধে আছে—সে ওরাই পাঠাবে একসপার্ট করে আনবার জন্যে। তখন মাইনেও হবে অনেক বেশী।'

শুধু টাকা—টাকা—আরও টাকা।

নারান বাঁড়ুজ্যে বলল, 'তা হলে দেশও ছাড়ার মতলব আছে বল ?'

'তা থাকবে না কেন ?' বিপ্লব যেন একটু অবাক চোখে তাকাল দাদুর মুখের দিকে। বলল, 'সারা জীবনই ধরো বিদেশে কাটাতে হতে পারে।'

নারান বাঁড়ুজ্যে সক্ষোভে বলল, 'দেশ ছেড়ে বিদেশে।'

'কোনো একটা বিশেষ দেশে জন্মানো তো জৈবিক একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র —এ্যাকসিডেণ্ট। প্ল্যানচেট আর জন্মান্তরের গাঁজাখুরী বাদ দিলে তোমার আমার জন্মের ঘটনা যে কোনো দেশেই তো ঘটতে পারতো।'

'শুধু ঘটনা ? কোনো সেণ্টিমেণ্ট বা আবেগ নেই, প্রেম নেই !'

'ও তোমাদের সেকালের কথা।'

নারান বাঁড়ুজ্যে আহত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে বলল, 'ছাড়লুম না হয় ওসব তর্কের কথা। কিন্তু দেশ কী তোদের শিক্ষাদীক্ষার কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে না বিপ্লব ?'

'পারে বৈ কি।' বিপ্লব এবার কৌতুক ভরা কণ্ঠে বলে উঠল, 'দাবী করে বোবা বাধ্যতা আর সস্তা মজুরীর স্বীকৃতি।'

এমন সময়ে পাশের টেবিলে টেলিফোনটা বেজে উঠল। নারান টেলিফোন কানে তুলেই গলা চিনতে পারল। দেবযানী। ফোনটা বিপ্লবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দেখ—এ বাঁধন যদি কাটতে পার !'···

'কে !'

'দেবযানী।'

টেলিফোনের মুখটা হাত চাপা দিয়ে বিপ্লব বলল, 'বলে দাও দাদু—বেরিয়ে গেছে।'

'নারান বাঁড়ুজ্যে মিথ্যে কখনো বলে না ভাই। পারলে তুমিই বলো।'

দাদুর হাত থেকে ফস করে টেলিফোনটা নিয়ে নিজের মুখের কাছে ধরল। এবং অবলীলায় বলদেও সিংয়ের বনামে জানিয়ে দিলে, 'দাদাবাবু বাহার হো গৈল। হাঁ। রাত বহুত হোবে।'

ফোনটা রেখে দিয়ে দাদুর দিকে চেয়ে একটু হাসল। বলল, 'সত্যিই আমার একটু জরুরী কাজ আছে দাদু—ও এসে পড়লে সব পণ্ড হয়ে যেত।'

এ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, 'ফিরতে আমার রাত হতে পারে—মাকে বলে দিয়ো দাদু।'

না, কিছুই এদের আটকে রাখতে পারে না। স্ত্রীলোক না, প্রেম না, দেশ না। আজ সকাল থেকে অনেক কথাই হয়ে গেছে ওর সঙ্গে! সে সবগুলোকে দ্রুত কঠিন পায়ে মাড়িয়ে ও যেন নারান বাঁড়ুজ্যের সামনে দিয়ে চলে গেল গট গট করে অতি সহজে।

খানিক বাদে উমা এসে জিজ্ঞেস করল, 'ও কী বলল বাবা?'

নারান শুধু বললে, 'বলে গেল ফিরতে রাত হবে।'

দিল্লী থেকে কলকাতায় এলে আগেও বন্ধুবান্ধবদের আড্ডায় রাত হয়ে যেত বিপ্লবের। হলেও রাত বারোটার বেশী নয়। কিন্তু সেদিন যেন সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ট্রাম বাস থেমে গেল—একটা থেকে দুটো বাজল। উমা বিছানা ছোঁয়নি। বাপ শংকরপ্রসাদ ঘুম ভেঙে উঠে বসল। জেগে বসে আছে নারান বাঁড়ুজ্যে। কচিৎ এক-একটা প্রাইভেট ট্যাকসি সশব্দে ছুটে আসে রাস্তায়। ওরা চমকে ছুটে যায় জানালার কাছে। গাড়ি চলে যায়—ওরা ফিরে আসে হতাশায়।

শেষ পর্যন্ত উমা কেঁদে ফেলল, 'নিশ্চয় খোকার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। খোঁজ কর হাসপাতালে হাসপাতালে।'

ফোন করা হলো হাসপাতালে—টেলিফোন ডাইরেকটরীর লিস্ট ধরে একটার পর একটায়। আশ্চর্য, এমারজেন্সি থেকে একটা খবরও পাওয়া গেল না।

উমা হাউমাউ করে বললে, 'নিশ্চয় খোকাকে কেউ খুন করেছে। কোথায় কোন রাস্তার ধারে পড়ে আছে কে জানে। যে দিন কাল!...ওকে আনো—এনে দাও আমার কাছে।' উমা মাথা কুটতে সুরু করে দিলে।

শংকরপ্রসাদের সঙ্গে নারান বাঁড়ুজ্যেও বেরুল বগলে ক্রাচ নিয়ে। স্ট্যাণ্ডে গিয়ে ট্যাকসি ধরল।

'চলো থানায় থানায় খোঁজ করি—শেষ করা যাবে লালবাজারে।'

সারা কলকাতার থানা ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত লালবাজারে।

বিপ্লব মুখুজ্যেকে ওইখানে আটকে রাখা হয়েছে। ধরা হয়েছে রাত দশটা নাগাদ এক বড় হোটেলে। সঙ্গে অনেক মূল্যবান কাগজ পাওয়া গেছে। আরও অনুসন্ধান জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

৩

'বিপ্লবী বিহার'। সকালে তেমনি ক'জন বসে আছে দক্ষিণের বারান্দায়। তেমনি বেতো ডান পাটা মধু আড্ডি বাড়িয়ে দিয়েছে রোদের দিকে, নাটু গুপ্ত হাঁপাচ্ছে নীরবে।

কাগজ পড়ছিল জোরে জোরে মতি মুখুজ্যে। খবর কাগজওয়ালারা খবরটা বের করে দিয়েছে গরম গরম। বড় বড় করে ছেপেছে। বিদেশীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ গোপন খবর পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে বিপ্লব মুখার্জি—একেবারে মোটা টাকা আর বমাল সমেত। এ খবরও বেরিয়েছে, আসামী পুরাতন বিপ্লবী নারান বাঁড়ুজ্যের নাতি।

মতি মুখুজ্যে আজ বলল, 'যাবে নাকি অতুল নারানের সঙ্গে একবার দেখা করতে। চলো সবাই যাই আজ।'

এমন সময় কোথায় একটা খট খট শব্দ উঠল। শব্দটা এগিয়ে আসছে। এবার বারান্দার সামনে। ক্রাচ টেনে টেনে এসে দাঁড়াল সকলের সামনে নারান বাঁড়ুজ্যে। ম্লান হেসে বলল, 'শেষ পর্যন্ত চলে এলাম তোমাদের কাছে। বিহারের ভার তো অতুলদার হাতে শুনেছি। আমাকে একটু আশ্রয় দেবে তো অতুল দা।'

'নারান!'…

মতি মুখুজ্যে আর কানু রায় ততক্ষণে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছে নারান বাঁড়ুজ্যেকে।

নারান বাঁড়ুজ্যে বলল, 'বিপ্লবের বাপকে লালবাজার থেকে বিদেয় করে দিয়ে সোজা চলে এসেছি এখানে। সারারাত ঘুম হয়নি—একটু ঘুমাবো।'

দিগ্‌ভ্রান্ত

ট্রেন থেকে নেমেই দে ছুট। বোঁচকাবুঁচকি, হাঁড়ি-কলসী ঝুড়ি, ট্রাঙ্ক-সুটকেশ, ধুতি ট্রাউজার—ইতর-ভদ্র সবাই। সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একমুখো। মেয়েরা ঝামট খাচ্ছে দৌড়-উন্মুখ পুরুষদের, 'গেল—গেল, একটু খরই পা চালাও না।'

ইয়া ইয়া জোয়ান, বালক মায় বুড়ো পর্যন্ত দুদ্দাড় বেরিয়ে চলে গেল পড়িমরি করে।

তাই দেখে দীপচাঁদও বগলে ঝুলন্ত হাওয়াই ব্যাগটাকে সাপটে ধরে বললে, 'ওস্তাদ, লাগাই ছুট?'

'নাঃ, চল—আস্তে চল।' নিতাই বললে, আস্তে আস্তে—গলায় একটু ক্লান্তির রেশ।

দীপচাঁদ ত্রস্ত গলায় বললে, 'উদিকে আবার রেলগাড়ি ছেড়ে দিবে না তো?'

নিতাই ওর কথা শুনে হাসল। বলল, 'বেকুব। আর রেলগাড়ি চড়তে হবে না। এবার বাস! ওরা সব বাসের জন্যে ছুটছে। এ লাইনে এই রকম।'

দক্ষিণ বাংলার দেহাতি এক স্টেশন। কাঁকর বিছানো প্লাটফর্ম পার হয়ে কিছুটা রেল লাইন ধরে এগিয়ে মোটর বাসের ঘাঁটি। দীপচাঁদের কাঁধে প্রায় ভর দিয়েই পথটুকু হেঁটে এল নিতাই।

দীপচাঁদ বললে, 'হাঁটতে কষ্টো হচ্ছে ওস্তাদজী?'

নিতাই বলল, 'কোমরের হাড্‌ডিতে কোথায় যেন একটু দরদ মনে হচ্ছে রে।'

'সব ঠিক হোয়ে যাবে ওস্তাদ।' দীপচাঁদ মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললে, 'তোমার জান্ যখন ফিরে পেয়েছি—তখন দীপচাঁদ আর কিছুর পরোয়া করে না। দরকার হলে তোমাকে কাঁধে চড়িয়ে ঘুরবো গুরু। রামজীর কিরিয়া। দেখে নিয়ো—হ্যাঁ।'

বিশ্বস্ত উত্তেজিত দীপচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিতাই হেসে ফেললে। বললে, 'দীপু, ফের সেই হিন্দুস্থানী কসম।'

দীপচাঁদ জিভ কাটল। একটু যেন লজ্জা পেয়েই বললে, 'সত্যি বলছি—মনে থাকে না দাদা।' একটু থেমে সঙ্কুচিত গলায় বললে, 'ছোটবেলা থেকে ওদের ভাষাই তো বলে এসেছি গুরু—ওদের মধ্যেই থেকেছি, বড় হয়েছি। কুলি, কামিন, মিস্তিরি, রাজ—পাঁচ নম্বর বস্তি থেকে বুন্দেল গেট, তপসিয়া—তাড়-বাগান ইস্তক। ভেসে বেড়িয়েছি আমার দুখিনী বাঙ্গালীন্ মায়ের সঙ্গে। তারপর তুমি টেনে নিলে কাছে—করে দিলে মুখুজ্যে কোম্পানীর ক্লিনার। তার

থেকে আজ গাড়ির অ'াৎ পর্যন্ত সমঝিয়ে দিলে। তোমার ঋণ শোধ করবো কী দিয়ে।'

নিতাই হেসে বললে, 'এই যে তোর নামে ট্যাক্‌সির পারমিট লাইসেন্স বেরোবে।'

'সে তো তোমারই টাকা, তোমারি সব দাদা।' দীপচাঁদ বললে সঙ্কোচে।

কথায় কথায় এসে পড়ল ওরা বাস-গুমটিতে। গোটা দুই বাস বোঝাই হয়ে বেরিয়ে গেছে। গোটা পাঁচেক বাস তখনও দাঁড়িয়ে। পর পর ট্রেনের প্যাসেঞ্জার ধরবে। তার ড্রাইভার, চেকার, ক্লিনারের দল গুমটির পাশে ছোট একটা চায়ের দোকানে জটলা পাকিয়েছে।

নিতাই বললে, 'চল দীপু—একটু চা খেয়ে নিই।'

চায়ের দোকানে ঢুকতেই ড্রাইভারদের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠল, 'আরে—নিতাইবাবু না?'

'নিতাইদা! তাই-ত।'

'মাস্টারমশায়। ইস্—কতদিন পরে গো।'

জটলা সকলরব। নিতাইকে চিনেছে।

দেখেশুনে দীপচাঁদ টিপ করে নিতাইকে একটা গড় করে বললে, 'পেন্নাম তোমাকে দাদা—এখানেও তুমি গুরুজী।'

'আরে, এ লাইনে প্রথম গাড়ি চালিয়ে রাস্তা দেখালে কে?' একটি ড্রাইভার বললে, 'মনে পড়ে নিতাইবাবু, তোমার সেই হুড-ভাঙা ট্যাকসি?'

'আরে বাপরে—আমরা তখন এই এতটুকুন।' হাত মেপে দেখিয়ে একটি ছোকরা ক্লিনার বললে, 'নিতাইদার গাড়ি দেখবার জন্যে গাঁ থেকে এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম।'

সে দশ-বারো বছর আগের কথা—এদিককার আড়ে দীর্ঘে পঞ্চাশ মাইল তখন মোটর দেখেনি। রেলগাড়ীর স্টেশন তো স্টেশন—ছোট একটা হল্ট-স্টেশন মাত্র। নির্ভেজাল চাষাভুষোর গাঁ—একঘেয়ে সেই ধান-চাল মহাজনী। বিশ বছর তক ক্লাস নাইন পর্যন্ত ঘষটে নিতাই বাপকে বললে, 'হাওয়া গাড়ী চালানো শিখবো।'

বাপ চোখ পাকিয়ে বললে, 'আর আমার জোত-জমি—ধানের কারবার?'

'ওই তোমার বলদের পেছনে ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে ভুঁইচষা—আমি পারবো না—ভালো লাগে না।'

'এ্যাদ্দিন ইস্কুলে পড়ে এই বিদ্যে। মা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে উনি হাওয়ায় ছুটবেন!' বাপ তেড়ে বলল, 'তোকে একটা কানা কড়ি দেবো না।'

পরোয়া নেই। নিতাই হাওয়াতেই ছুটলো। এক বুড়ী দিদিমাকে ভজিয়ে জেলায় গিয়ে শিখে এলো গাড়ি চালানো। দিদিমার দেওয়া সামান্য কিছু জমি ছিল ওর নামে—সেটা বেচে কোথা থেকে একটা ভাঙা গাড়ি এনে, দিলে চালিয়ে কালিনগর টু নরঘাট খেয়াঘাট, প্রথমে বিশ মাইল। তারপর ত্রিশ—চল্লিশ।—পথ নেই, পথ-ঘাট খারাপ। থোড়াই কেয়ার। তারই মধ্যে পথ করে ছুটেছে শুকোর দিনে খানা খন্দ চড়াই-ওৎরাই পার হয়ে। একদিন গাড়ি গেল উল্টে।

বিরক্ত নিতাই বললে, 'ধুত্তোর—ই রাস্তায় শালার গাড়ি চালিয়ে সুখ নাই। বলদের ল্যাজের মতো কেবল গীয়ার মোচড়াও আর ব্রেক কষো। গো-গাড়ির হদ্দ। চালাবি গাড়ি তো দে স্টার্ট—চাপ এ্যাক্‌সিলেটার, উড়ে যাবি সোঁ-ও। মরা বাতাসও ঝড় তুলে বলবে—হ্যাঁ।'

চলে গেল মহকুমা শহরে—তারপর জেলা শহর—সেখান থেকে সিধে মহানগর কলকাতা—জি টি রোড। স্পীড—গতি-গতি-গতি। বলদ ঠেলা গাঁয়ের নিতাই দাস গুটি-কাটা প্রজাপতির মতো উড়ে চলে গেল হাওয়ায়। হারিয়ে গেল। দশটি বছর।

এতদিন পরে তার আবার আবির্ভাব। মিনমিনে কালো রং, লম্বা চওড়া জোয়ান—বয়স ত্রিশ পার। কপালে মস্ত কাটা দাগ—চামড়া এখনও কাঁচা—গোলাপী, ফালা হয়ে ঢুকে গেছে চুলের মধ্যে। চওড়া চিবুক—চৌকো বলিষ্ঠ আদলের মুখ। তারি মধ্যে একটা চাপা ক্লান্তি সবটাকে যেন একটু বিসন্ন রোগা রোগা করে তুলছে।

কপালের কাটা দাগটার দিকে তাকিয়ে একটা ক্লিনার ছোকরা শুধোলো, 'কি হয়েছিল নিতাইদা—এ্যাকসিডেণ্ট?'

'তবে?' নিতাই বললে, 'এ লাইনে থাকবি তো এ্যাকসিডেণ্ট হবে না? তায় আবার জি টি রোডের লরী। হাওয়া গাড়ি না উড়ো জাহাজ! একজনের সঙ্গে একটু খটোমটো হয়েছিল—তা একদিন সুযোগ পেয়ে মারলে বগলে ধাক্কা। ব্যস—গাড়ি উল্টে চৌপট।'

তারপর হাসপাতাল। চার মাস। খুলি থেবড়ে গেল। জাংয়ের মোটা হাড়্ডি তিন টুকরো। হিপজয়েণ্ট আলগা।

সে সব কথা মনে করে দীপচাঁদ দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি গুরু, সেই হারামীর বাচ্চা জগ্‌দীশকে জি টি রোডে

একবার পেলে বদলা আমি নেবই।' আফশোষ করে বললে, 'যদি সেদিন আমি তোমার সঙ্গে থাকতাম—'

নিতাই হেসে বললে, 'তা হলে আমার দশা তোরও হতো। তারপর, এই চার মাস হাসপাতালে রেখে সারিয়ে তুলতো কে?'

দীপচাঁদ মুখ নীচু করলে।

জটলা থেকে কে একজন সিদ্ধান্ত বাতলালে, 'এখন গিয়ে তা হলে বাড়িতে থাকবে নিতাইদা?'

'আর টিকিয়ে টিকিয়ে বলদের ল্যাজ মোচড়াবো!' ভেংচি কেটে বললে নিতাই, 'দূ—র, মাথা খারাপ! বাড়ি যাচ্ছি জমিজমা বেচতে। টাকা চাই। কলকাতায় ট্যাক্সি চালাব।'

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল এতদিন পরে, প্রথম দিনটা দিব্যি জম-জমাট। বাপ নেই—মারা গেছে। মা দিদিমা হেসে কেঁদে হাত বুলোতে লাগল নিতাইয়ের গায়ে মাথায়।

'এতদিনে সুমতি হলো তোর। ভগবান আছে।—হে ভগবান! —হে ভগবতি···ওরে তুই যে বংশের একটি মাত্তর বাতি।—'

এমন সময় কে একটা ডাগর ডাগর মেয়ে নিতাইয়ের পায়ে টিপ করে গড় করলে।

নিতাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। আঁটো সাঁটো গড়ন—দুটো শান্ত কালো চোখে খুশি যেন উপচে পড়ছে।

নিতাই বললে, 'এ কে মা!'

'ওমা, চিনলিনি!' মা কপাল চাপড়ে বললে, 'মনে নেই—সেই দশ বছর আগে কোত্থেকে একটা ঠোঁট কাটা দাঁত নড়া টিকটিকির মতো মেয়ে এনে গছিয়ে দিয়ে বললি—মা, এটাকে রাখ। মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তে।'—

'কুড়ানী!' অস্ফুট অবাক কণ্ঠে বললে নিতাই।

নিতাইয়ের দেওয়া নাম।

'তবু ভাল—চিনতে পেরেছ দাদা!' কুড়ানী মুখ টিপে হাসল।

না চেনবারই কথা। দশ বছর আগের সেই হলদে টিকটিকির মতো মেয়েটা—ভিক্ষে করতে ছুটে আসতো বাজারের কাছে মোটর এসে থামলে। একদিন মরতে মরতে বেঁচে গেল—লেগেছিল শুধু মাডগার্ডের ধাক্কা! তার গাড়ির প্রথম বলি। বাপ-মা মরা বাজার-পোষা অনাথ মেয়ে।

মা বলতে লাগল, 'এত বড় হলো—বিয়ে দিতে পারিনি। সবাই বলে—অজানা অচেনা ঘরের মেয়ে—কি না কি।—এনেছিলি কুড়িয়ে—এখন এসেচিস, ছ্যাখ যদি কোথাও দিতে পারিস।'

কুড়ানী পালাল।

এতক্ষণে চোখ পড়লো মায়ের দীপচাঁদের দিকে। বললে, 'তোর পেছনে দাঁড়িয়ে—উটি কে?'

'ভাই—আমার এক ভাই মা।'

'ভাই কে রে! ওমা, ও কুড়ানী—ওই ছ্যাখ, আবার কোথা থেকে একজন ভাই এনেছে সঙ্গে।'

প্রথম মহড়া গেল।

সামনের উঠোন ঘেঁসে বাইরের একখানা ঘর। দুজনের বিছানা পড়ল সেই ঘরে। কুড়ানী একটা লণ্ঠন দিয়ে গেল সন্ধ্যের পরে।

কিন্তু সে আলোয় বাইরের নিথর অন্ধকার কাটে না। শরতের যত ঠাণ্ডা, পৃথিবীর যত নিঃশব্দতা—সব যেন চারদিকের অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেপে ধরেছে এই ঘরটাকে। এমন যে দীপচাঁদের বক্‌বকানী—সে-ও নিঃসাড় হয়ে গেছে। নিতাইয়েরও ভাল লাগছে না।

ডাকল, 'দীপু।'

দীপচাঁদ বললে, 'ওস্তাদ।'

'কি ভাবছিস?'

'মুখুজ্যে সাহেবদের গ্যারেজ—কাজিয়া হাল্লা, নেশা ভাং—চুরির ভাগ। এখন সেখানে নরক গুলজার দাদা।'

'তবে?' নিতাই বললে, 'আলো নেভা। ব্যাগ থেকে বোতলটা বার কর। গলা ভিজাই। গা-হাত ম্যাজ ম্যাজ করছে।'

একান্ত বশংবদ দীপচাঁদ। বোতল বের করে দিলে। নিতাই অন্ধকারে খানিকটা গলায় ঢেলে দীপচাঁদকে বোতল দিয়ে বললে, 'নে খা। সবটা গিলে বসিসনি।'

'খাবো? আমার কেমন ভয় করছে ওস্তাদ।'

বলতে বলতে কুড়ানীর গলার আওয়াজ, 'ও দাদা—ঘর অন্ধকার কেন গো? আমি যে জলখাবার আনলাম।'

দীপচাঁদ টুপ্ করে জানালা গলিয়ে বোতলটা ফেলে দিলে। তারপর আলো জ্বালালে। কুড়ানী থালা সাজিয়ে গুড়-মুড়ি নারকেল দিয়ে গেল।

কুড়ানী যেতেই নিতাই ফোঁস করে উঠলো দীপচাঁদের উপর, 'দিলি—গোটা বোতলটা দিলি ফেলে। মৌতাতটা বিগড়ে দিলি!'

দীপচাঁদ চুপ।

'গাঁজা ক'ভরি এনেচিস?'

'পাঁচ।'

'বার কর। বানা।'

'তুমিই বানাও দাদা—শেষমেস একটু পেসাদ দিও। সত্যি বলছি—আমার কেমন ভয় করছে গুরুজী।'

'ভয়! ভয় কাকে?—দে—'

'ওই মেয়েটাকে।'—

'হ্যাঃ, ওকে সেদিন বাঁচিয়ে ছিলুম—তাই। নইলে যেত মাথাটা ছাতু হয়ে। ওকে আবার ভয়। দে—বানাই।' নিতাই নিজেই গাঁজা টিপতে বসলো। বিছানার ওপর ছোট কলকে।

দীপচাঁদ বললে, 'কাজ শেষ হতে কদিন লাগবে দাদা?'

'এই ধর চার পাঁচ দিন।' নিতাই বললে, 'আমি কলকাতা থেকেই চিঠিপত্র চালিয়ে সব ঠিকঠাক করে রেখেছি। ভুঁইয়াবাবুদের টাকা রেডি। এখন শুধু দলিল লেখা—টাকা গুনে নেওয়া আর রেজেস্ট্রী। বাস্—কাম ফতে। খবর্দার, মা দিদিমা যেন টের না পায়। আর দেখ, আমার এ্যাকসিডেন্টের কথা একদম ফাঁস করবিনি।'

আবার কুড়ানী। বলতে বলতে ঢুকলো, 'কই দাদা—খাচ্ছ?'

এবার নিতাইয়ের পালা। হাতের গাঁজার টিপ, ছোট কলকে—মায় পাঁচ ভরির মোড়ক পর্যন্ত টুপ্‌ করে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলে। মুখ বিকৃত করে বললে, 'দীপু, বিড়ি আছে—দে একটা।'

কুড়ানী বলল, 'আগে খেয়ে নাও দাদা। আমি জল নিয়ে আসি।'

নিতাই চিৎপাত হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললে, 'দীপু—তুই বলেছিলি জি টি রোডে জগ্‌দীশকে একবার পেলে নিবি বদ্‌লা। আর আমি যদি একবার ওই জি টি রোডে কুড়ানীকে পাই—লরীর তলায়—'

'বদ্‌লা।' দীপচাঁদ এক খাবলা গুড়-মুড়ি মুখে পুরে চিবুতে লাগল নিশ্চিন্তে—বললে, 'কটা দিন মা দিদিমা আর ওই ফরফরে মেয়েটা হাতে তুলে যা দেয়—তাই খাও দাদা।'

দ্বিতীয় পর্বে মন বোঝার পালা।

সকালে দাওয়া থেকে নেমে বেরোবার মুখেই নিতাইয়ের মাথায় লাগল ঠকাস করে। তালগাছের বাগলা।

নিতাই বললে, 'বেরুবার মুখে এই তালগাছ লাগিয়ে জঙ্গল করে রেখেছ মা!'

'হায় কপাল আমার!—ভুলে গেলি।' মা মনে করিয়ে দিলে, 'কোথা থেকে তাল এনে আঁটি ফেললি, তার গাছ হলো। তা কতদিন কুড়ানীকে বলেছি—দে কেটে, জঙ্গল-জঙ্গল লাগছে। কাটতে দিলে না—দশ বছর আগলে রেখেছে। বলে থাক না, ফল হবে। দাদা এনেছিল।'—

নিতাই হো হো করে হেসে বললে, 'সেই ফল ও খাবে! তাল গাছ যে এক পুরুষে পোঁতে—আর এক পুরুষে খায় বলে।'

দিদিমা বললে, 'বলেছি দাদা। বললে—থাক না দাদার ছেলেপুলেই খাবে।' একটু থেমে আবার বললে, 'তা হ্যাঁ ভাই, হঠাৎ কী মনে করে এলি?'

নিতাই মুখ গম্ভীর করে বললে, 'ঘর-বাড়ীতে কী এমনি আসতে নেই দিদিমা!'

'ওমা, সে কী কথা!' মা হাউমাউ করে বললে, 'এ যে তোর চোদ্দ পুরুষের ভিটে—আশ্রয়। তোর বাপ গেল—তুই ফিরে তাকালিনি, আমরা মাথা গুঁজে আছি—তোর দিদিমা, আমি—আর ওই কুড়ানী। যদি না থাকতো—কোথায় ভাসতাম!'

দীপচাঁদ চম্‌কে উঠলো—কে জানে তার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল কি না।

কুড়ানী বললে, 'এইবার তোমার জমিজমার হিসেব সব বুঝে নাও দাদা।'

নিতাই চুপ করে রইল। তার মতি-গতি বোঝা গেল না। সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোলে। বিকেলে দীপচাঁদকে চাপা গলায় বললে, 'আজ সন্ধ্যেবেলা ভুঁইয়ারা সব টাকা মিটিয়ে দেবে—কাল দলিল রেজেস্ট্রি। চল বেরিয়ে পড়ি। টাকাকড়ি বুঝে নিই।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ওরা তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়ল।

পাড়ার ভেতর থেকে রাস্তা বেরিয়ে এসে মাঠের গা ঘেঁসে চলে গেছে সোজা পশ্চিম মুখো। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি মূর্তি—শনের মতো মাথাভরা পাকা চুল নিতাইয়ের দিদিমা—মা—আর কুড়ানী। কি দেখছে মাঠের দিকে চেয়ে।

'কী দেখছ তোমরা এখানে?' নিতাই জিজ্ঞেস করলে।

'কী আর—ধান গাছে কেশর এসেছে, কুড়ানী গিয়ে বললে। —তাই দেখতে

এসেছি।' মায়ের মুখটা খুশি খুশি—বললে, 'আর বড় জোর এক মাস—তারপর ঘরে ধান উঠবে।'

দীপচাঁদ আড়চোখে দেখলে—নিতাইয়ের মুখটা এতটুকু হয়ে গেছে। থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল—নিতাই তাড়া লাগালো, 'চল দীপু।'

পেছন থেকে দিদিমা ডাকলে, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা! সন্ধ্যে হয়ে এলো—সামনে অন্ধকার রাত।'

নিতাই বললে, 'এই একটু ঘুরে-টুরে আসি।'

একটানা সবুজ ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। তারই পাশ দিয়ে চলেছে দু'জন—কারুর মুখে কথা নেই। দীপচাঁদ পেছন ফিরে দেখলে একবার—দিদিমা—মা আর কুড়ানী তখনো চেয়ে আছে মাঠের দিকে। আস্তে আস্তে দীপচাঁদ জিজ্ঞেস করলে, 'ধান হতে কদ্দিন লাগে দাদা?'

'এই মাস তিনেক ধর।'

'আর তাল?'

'লোকে বলে দু-পুরুষ। বাপ পুঁতলে ছেলে খায়।'

দীপচাঁদ আপন মনে একটু হাসলে। বললে, 'দিব্যি গ্রাম গুরু—মা দিদিমা কুড়ানী ধানগাছকে হর্ন দিচ্ছে না, ধানগাছ তাল গাছকে হর্ন দিচ্ছে না। ধাক্কা মারছে না—পাশ কাটাচ্ছে না। সবাই চুপ চাপ সময়ের অপেক্ষা করছে। যেমন পাচ্ছে তেমন নিচ্ছে, খাচ্ছে।'

নিতাই বললে, 'হেঁয়ালি রাখ—কি বলতে চাচ্ছিস?'

'কিছু না দাদা।' দীপচাঁদ বললে, 'হয়তো আমার মায়েরও এই রকম একটা গাঁ ছিল, ঘর ছিল কোথাও। আমার নেই। তোমার এখনও আছে। পরে থাকবে না।'

'মানে?'

দীপচাঁদ চুপ। খানিক বাদে বললে, 'একটা কথা বলবো গুরু?'

'বল্‌।'

'থাক—জমিটমি বেচো না।'

'মানে?'

'ঢের ছুটেছ। ফলও তো পেয়েছ।' দীপচাঁদ বললে, 'এই ভাঙা হাতে আর স্টিয়ারিং চেপে ধরতে পারবে? ওই ভাঙা পায়ে—'

নিতাই ধমক দিয়ে বললে, 'বুঝিসনে কিছু—চুপ দে। তুই তো আছিস—নাকি?'

দীপচাঁদ আবার চুপ করে গেল। চুপ করে গেল তো গেল – দলিল সই হলো, সাত হাজার টাকা গোনা হলো, ঘরে ফিরে এল – তখনও তার মুখে কথা নেই। নিতাই দলিলটা এনেছিল সঙ্গে করে – ভালো করে পড়ে দেখবে, কে জানে – কায়দা টায়দা করে ভিটেটা ঢুকিয়ে দিয়েছে কি না। ওটা থাকুক। মা দিদিমা কুড়ানী যতদিন আছে।

সকলে ঘুমুলে নিতাই লণ্ঠনের আলোয় দলিলটা পড়ে দেখলে। ঠিক আছে।

ডাকল, 'দীপু। তুই যে চুপ করে গেলি একেবারে! নে, ব্যাগের মধ্যে দলিলটা রাখ। টাকা কোথায় রাখলি?'

'আমার মাথার বালিশের তলায়।'

হুঁশিয়ার ছোকরা। নিতাই খুশি হয়ে বললে, 'কাল বেলা দশটায় রেজেস্ট্রি অফিস।'

এখানে এসে ঘুম ভাঙতে নিতাইয়ের একটু দেরিই হয়। উঠে ডাকল, 'দীপু!'

সাড়া নেই। আবার ডাকল।

এলো কুড়ানী। সামনে একটা চিরকুট ধরে বললে, 'এই নাও তার চিঠি। সে ভোরে উঠে কলকাতা চলে গেছে।'

'এ্যাঁ – চলে গেছে?' বুকটা ধড়াস করে উঠল নিতাইয়ের। সর্বনাশ হয়ে গেল বুঝি। এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে ছেলেটাকে নিজের ভাইয়ের মতো। চিরকুটে তাড়াতাড়ি চোখ বুলোলে।

ভাঙা ভাঙা অক্ষরে লেখা :

> দাদা দলিলটা দিয়েছিলাম কুড়ানীকে পুড়াতে। সেটা হয়ত খতম। টাকাও রইলো তার কাছে। ভুঁইয়াবাবুদের ফেরত দিতে হবে তো। দু-পুরুষের তাল গাছ থেকে তোমার সব জমিজমার হিসেব যার কাছে – তার কাছে গরমিল কিছু হবার নয়। আমার দোষ ভুলে যেও। —দীপুভাই

নিতাই শূন্যদৃষ্টিতে চিরকুটটার দিকে চেয়ে রইল। বিড় বিড় করে বললে, 'ব্যাটা জমি-হ্যাংলা। বেকুব।'

সুবল

সব সবুজ ঝলসে গেছে। গ্রামের দিকে ধোঁয়া উঠছে তখনো।

একটা বছর আষ্টেকের ছেলে, আদুল গা—পরনে হাফ প্যাণ্ট, বুনো শটি গাছের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল মাটিতে বুক ঘষটে ঘষটে। আশপাশে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলে। না, কেউ কোথাও আর নেই।

যারা এসেছিল তারা চলে গেছে। যাওয়ার সময় মুখে কাপড় বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেছে কতগুলো মেয়েকে। ওসমান আলির নতুন বিবি, কেনারাম দেবনাথের বেটি আর তার দিদি। চলে গেল গঞ্জের ঘাটের দিকে।

গ্রামের দিকে একবার মুখ ফেরাল ছেলেটা—তারপর ঘুরে দাঁড়াল গঞ্জের ঘাটের দিকে। না, গ্রামের দিকে যেতে আর মন সরে না। চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের চেহারাটা—চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে উঠোনে··উলঙ্গ··· ঠেলে বেরিয়ে এসেছে চোখ দুটো, হাঁ করে আছে মুখটা···মরার সময়ে চিৎকার করে উঠেছিল বোধ করি। মায়ের ওই চেহারা দেখতে তার আর ভালো লাগে না।

পা বাড়াল গঞ্জের ঘাটের দিকে। দু'পা হাঁটল খুঁড়িয়ে। বসে পড়ল। বড্ড লাগছে ডান পায়ে।

ঝুঁকে দেখতে লাগল। হাঁটুর নিচে, পেছনের মাংসল জায়গাটা একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড়। মনে পড়ল শেষ রাতের সেই আধা অন্ধকারে চারদিকে ফট্‌ফাট্‌ শব্দ। কি একটা হঠাৎ আগুনের প্রচণ্ড একটা ছ্যাঁকা দিয়ে বিঁধে বেরিয়ে চলে গেল।

জীবনে সে রাইফেল কখনো এর আগে দেখেনি, গুলি, টোটা—এ-সবের কিছুই জানত না। কত দেশের কত গল্প করেছে হরি পণ্ডিতমশায়—কিন্তু পণ্ডিতও জানত না। কোনদিন বলেনি। নিজের এই গুলী খাওয়া পা-টার দিকে তাকিয়ে তার অনভিজ্ঞ ছোট্ট মনে কেমন একটা গর্বের ছোঁয়া লাগল : সে নিজেই এবার সব জানল!

গুলীর ক্ষতের ওপরে এক লাদা থুতু লাগিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল গঞ্জের ঘাটের দিকে। তার দিদিকে নিয়ে গেছে ওই দিকে, ঘাটে আছে তার বাবার নাও।

'যাইবো কই!'

গঞ্জের বাজারে এসে সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

এই কী ইসলামগঞ্জের বাজার! সে ঠিক এসেছে তো!

কত বেলা হয়ে গেছে। কোথায় সেই গম্‌গমে বাজার। একটা জনপ্রাণী নেই। সার সার চালার টিনগুলো জ্বলে-পুড়ে কুঁকড়ে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেছে, চারদিকে কয়লা ছাই পোড়া কাঠ। এ যেন সেই হিজলডাঙার শ্মশান। এখানে ওখানে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে চিতার চিমসে ধোঁয়া। বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে মাংস পোড়া গন্ধে।

ফ্যাল ফ্যাল করে দেখতে দেখতে সে নদীর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে তার বাপের নৌকোটা খুঁজতে লাগল। কোথায় বাবা—কোথায় বা তার নাও। শুধু জলের ওপরে কয়েকটা পোড়া কাঠের মতো কি যেন বাতাসে ঢেউ লেগে তখনো দোল খাচ্ছে। আর দিদি?…

একটা ঝাঁকড়া মতো পাকুড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে জলের ওপরে। তার তলায় ধপ্ করে বসে পড়ল ছেলেটা। চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে। অতটুকু কচি মনের ওপরে চেপে বসেছে ভয়ংকর সব অভিজ্ঞতার বোঝা।

এ-পৃথিবীর সঙ্গে মাত্র আট বছরের পরিচয় তার। এতদিন দেখেছে সে তার আকাশ, মাটি আর খেত—তার ওপরে ছড়ানো সবুজ পান্নার পাহাড় যেন সব—উঁচু নিচু, কখনো সমতল—দিগন্ত ছোঁয়া। মৃত্তিকার সবুজ প্রাচুর্য ঠেলে উঠেছে গাদাগাদি সুপারী আর নারিকেল গাছের হিল্লোলিত ঝালরে ঝালরে—যেন সবুজের ফোয়ারা। তারপর হঠাৎ একদিন সে-সবুজে আগুন ধরে গেল।

বর্ষা তখনো নামেনি। এপ্রিলের প্রশান্ত এক শেষ রাতে, অন্ধকারের আড়ালে কতগুলো গানবোট এসে থামল গঞ্জের বাজারের বরাবর। ঘুমন্ত বাজার। নিঃসাড় ঘাটে বাঁধা নৌকোর সারি। হঠাৎ গর্জে উঠল মেসিনগান আর রাইফেল। অতর্কিত এ আক্রমণে যে জাগল সে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে—যে জাগল না সে ঘুমিয়ে পড়ল চিরকালের মত। দাঁড়ি-মাঝিরা কেউ কেউ টুপ টুপ ডুব দিল নদীতে—শেষ পর্যন্ত কেউ তারা উঠল, কেউ আর উঠল না।

জয়োল্লাসে তীরে নামল দুর্ধর্ষ খুনের দল। পশ্চিম পাকিস্তানের খান সেনা।

বাজারের এখানে ওখানে উড়ছিল কিছু ঝাণ্ডা—সেগুলোকে টেনে নামিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে, আগুন ধরিয়ে দিলে সার সার টিনের চালায়। তারপর মুখ ফেরাল গ্রামের দিকে—যেদিকে পথ দেখিয়ে ছুটে পালিয়েছে ভয়ার্ত মানুষের দল। এতদিন পরে সেই সবুজ পান্নার পাহাড়ের আড়ালে লুকানো হিজল কাঠি গাঁ, ধরা পড়ে গেল ওদের ক্ষুধার্ত হিংস্র চোখে। তারপর আরও কান্না,

আর্তনাদ, আর আগুন।··· দেখতে দেখতে সব সবুজ কেমন ঝলসে গেল চোখের সামনে।

চোখ থেকে ছেলেটার ভয় যেন শুকিয়ে গেছে, উদ্বেগেরও বাকি কিছু নেই। এখন শুধু চেয়ে থাকা···চেয়ে চেয়ে দেখা। একা। একসঙ্গে এত অভিজ্ঞতায় বুঝি এরকম হয়।

এমনি আড়ষ্টতার মধ্যে পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ল। আর যে কোথাও যেতে হবে—এ তার মনেও হলো না। মায়ের শেষ সে দেখে এসেছে। এখন একটা ক্ষীণ প্রতীক্ষা জেগে আছে তার মনের মধ্যে :

বাবা গেল কই ? আর তার দিদি।

জনহীন পোড়া বাজারটার এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে আর একটি লোক থমকে এসে দাঁড়াল তার পেছনে।

'কেডারে ! সুবল না ?'

ছেলেটা পিছন ফিরে তাকাল।

একলা বসে ছেলেটা কি করে এখানে !

'কি করস রে ?'

সুবল একবার নৌকোর পোড়া কাঠ গুলোর দিকে ফিরে তাকাল—তাকাল নদীর কিনারে যতদূর চোখ যায়। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বাবা গেল কই রহিম চাচা ?'

সোজা সরল জবাব যেন থমকে গেল রহিমের ঠোঁটে এসে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, 'হেইডা তো কইতে পারুম না রে।' সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আইবো—আইবো ঠিকই। তরে ছাইরা যাইবো আর কই ?' তারপর নদীর ওপারে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে বললে, 'বইসা তো আছস। দেখচস ?'

সুবল চোখ তুলে তাকালো।

সূর্যাস্তের শেষ আলোটুকু তখনো মিন মিন করছে। ওপারের গাছগাছালির মাথায়। নদী এমন কিছু চওড়া নয়। আবছা হলেও দেখা যায় এপার থেকে —বোঝা যায় মানুষজনের চলাফেরা। গায়ে কুর্তা, হাতে রাইফেল। ওপারে কেমন একটা চাপা ব্যস্ততা—প্রস্তুতি, গাছের ছায়ার আড়ালে। ব্যাপারটা এতক্ষণ চোখে পড়েনি সুবলের।

রহিম চাপা গলায় বললে, 'শয়তাইনেরা ছাউনি পাতে রে সুবল। আর বইসা থাকন ঠিক না। চল।'

সুবল জিজ্ঞেস করলে, 'আবার আইবো ?'

'নদী পারাইবো মনে লয়।' রহিম বলল, 'চল চটপট।'

কিন্তু চলতে গিয়ে ছেলেটা খোঁড়ায়। দু'পা গিয়ে দাঁড়ায়—পেছিয়ে পড়ে।

ব্যাপার দেখে রহিম জিজ্ঞেস করলে, 'কিরে, কাঁটা ফুটছে?'

'না।' সুবল গম্ভীর গলায় বললে, 'গুলী লাগছে। গুলী।' চিকন মিহি গলায় কেমন একটা বয়স্ক অভিজ্ঞ মানুষের সহিষ্ণুতা আর সাহস মেশানো গাম্ভীর্য যেন।

'ব'—দাঁড়া দেখি।'

ঝুঁকে দেখে রহিম জিভে চুক্‌চুক্ শব্দ করে উঠল। বোধ করি প্রকৃতি তার প্রাথমিক সাহায্যটুকু দিয়েছে বাচ্চাটাকে, রক্ত জমাট বেঁধে শুকিয়ে গেছে হাওয়ায় রোদে তাপে। ওকে ওইখানে বসিয়ে রেখে পোড়া বাজার টুঁড়ে কোথা থেকে সংগ্রহ করে আনল একটা পোড়া কাপড়ের ফালি আর একমুঠো দুর্বা ঘাস। ঘাসগুলো সুবলের হাতে দিয়ে বললে, 'চিবা—চিবাইয়া দে আমারে।'

সেই চিবানো ঘাস ক্ষতের মুখে চেপে বেঁধে দিল রহিম।

'ব্যস্, অখন ঠিক হইয়া যাইবো। হাঁইটা ভাখ।'

সুবল কয়েক পা হেঁটে গেল।

'কেমন লাগে?'

'ভালো।' শুধু ছোট্ট একটু উত্তর।

নদীর কিনারে কিনারে গাছ-গাছালির আড়ালে আড়ালে একটা সরু পথ ধরে অনেকটা হেঁটে এল ওরা দু'জন। সুবল জানে—এ ওদের গ্রামের পথ নয়। তবু একবার সে জিজ্ঞেস করলে, 'গাঁয়ে যাইবা না রহিম চাচা?'

'সে কবরখানায় আর থাকন যাইব না রে সুবল—কেও আর নাইও।'

তাহলে আর কোথাও নিয়ে যাচ্ছে তাকে রহিম চাচা! সুবল আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। গ্রামের সেই ভয়াবহ পরিবেশে ফিরে যাওয়ার মতো মনের শক্তি আর ছিল না ওই বাচ্চাটারও। মায়ের সেই ভয়ংকর চেহারাটা মনে পড়ে অনুক্ষণ যন্ত্রণা দেয় তাকে।—সেই চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা···বীভৎস চেহারা ···আর থক্‌থকে রক্ত, ছাই, কয়লা, আগুন। সেখানে আর ফিরে যেতে মন চায় না। তার মনে হয়—রহিম চাচা বড় ভালো লোক, তাকে আর সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। বরং যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে—সেখানে হয়তো দেখা হয়ে যাবে সকলের সঙ্গে···তার বাবা···দিদি···

ডান পা'টা টেনে টেনে নীরবে সে হাঁটতে লাগল রহিমের পেছনে পেছনে।

সন্ধ্যা তারা গাছগাছালির আড়ালে ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। নদীর নাবাল মুখে হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে তারা থামল—সেটা ঘাট নয়, আঘাটা। নদীর কিনার জুড়ে বড় বড় গাছপালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। নদীর কিনার ঘেঁষে ঝোপে ঝোপে ছোট ছোট লুকানো নৌকো আর ডিঙি। মানুষজনের ভিড়ে গিজগিজ করছে নদীকিনারের বনভূমি। চাপা চাপা ফিস্‌ফাস কথা—তারই মধ্যে কারুর গলায় এখনো লেগে আছে ফোঁপানীর রেশটুকু।

কে যেন চাপা গলায় শুধালো, 'কি বোঝ্‌লা রহিম?'

'আবার নদী পারাইবো মনে লয়।' রহিম তেমনি চাপা গলায় বললে, 'ছাউনি ফ্যালতাছে গঞ্জের বরাবর।'

অনেক লোক—ছেলে মেয়ে বুড়ো জোয়ান কাচ্চাবাচ্চা। আরও ঢের ঢের গ্রামের। তার মধ্যে তার নিজের গ্রামেরও ঢের লোক আছে। রহিম চাচার বৌ, দুই তিনটা কাচ্চাবাচ্চা, বুড়ো মা-বাপ। সুবল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আলো-আঁধারিতে ঘুরে ঘুরে দেখছিল। নেই শুধু তার বাবা আর দিদি। তাদের আর খুঁজে পেল না।

আরও দুটো বড দল এসে জড়ো হলো বনের ছায়ায়। যেন হাজার হাজার মানুষের মেলা। তাদের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সুবলের হঠাৎ মনে হলো—রহিম চাচাকে সে হারিয়ে ফেলেছে। খুঁজতে লাগল এদিক ওদিক। ডাকল, 'রহিম চা-চা!'···

চারদিক থেকে ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠল অচেনা লোকগুলো চাপা গলায়।

'কে! কেডারে!'···

'চুপ!'

কে যেন রুদ্ধ আক্রোশে গলা টিপে ধরার প্রস্তাব করে বসল।

'ধর ঠাইস্‌সা।'

ছেলেটা ঘাবড়ে গেল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল অসহায়ভাবে।

মৃত্যুতাড়িত একটা বাঁচার অন্ধ আবেগ যেন এই বনভূমিজোড়া তরল অন্ধকারে থিতিয়ে আছে—একটু নাড়াতেই সেটা ঘুলিয়ে উঠেছে।

এমন সময় কে এসে কাঁধে হাত রাখল সুবলের।

তার রহিম চাচা।

রহিম বললে, 'যা ব্যাটা—বস গিয়া তর চাচীর কাছে। কথা কইস্ না—শব্দ করিস্ না।'

সুবল বুঝতে পারল—এতগুলো মানুষ এখানে লুকিয়ে আছে। হিজলকাঠি গাঁয়ের সেই একটা ঝোপের মধ্যে সে যেমন নিঃসাড়ে লুকিয়ে ছিল। চুপচাপ গিয়ে সে রহিমের বৌয়ের গাঁ ঘেঁসে বসে পড়ল।

রহিম চাপা গলায় বললে, 'এই বেলা কিছু খাইয়া ল' সুবল।' বৌকে বললে, 'দে অরে মুড়ি চিড়া যা আছে ফিরোজা।'

সকলের সঙ্গেই প্রায় ছোট বড় একটা করে পুঁটলি—কারুর বাক্স-প্যাটরা থলে। শেষ সম্বল বেঁধেছেঁদে বেরিয়ে পড়েছে পথে।

এক সময়ে তৃতীয়ার চাঁদ অস্ত গেল পশ্চিম দিগন্তে। ঘন জমাট একটা অন্ধকার ছায়া যেন জঙ্গলের গাছপালার আশ্রয় থেকে ছড়িয়ে পড়ল সারা নদীর বুক জুড়ে। হঠাৎ একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। অন্ধকারে অপেক্ষমাণ মানুষগুলোর মধ্যে। কোথায় অন্ধকারে ঘাপ্‌টি মেরে বসেছিল দাঁড়িমাঝির দল—ঝুপঝাপ করে উঠে পড়ল নৌকোয়। তাদের পেছনে পেছনে পিঁপড়ের সারির মতো মানুষ। মুখে সাড়া নেই শব্দ নেই—ডাক হাঁক নেই। শুধু নৌকোর পাটাতনের ওপরে একটা চাপা ধুপ্‌ধাপ্‌ শব্দ।

'সময় হৈছে।'…

কিসের সময়—কি সময়, বুঝতে পারল না সুবল।

নাড়াচাড়ার ধাক্কাধাক্কিতে আবার কোথায় কেঁদে উঠল একটা বাচ্চা: 'ওঁয়া…ওঁয়া…ওঁয়া।'

চারদিকে হিস্ হিস্ করে উঠল আবার চাপা ক্রোধ। মা বুঝি জোর করে তার মুখে চাপা দিলে। দম আটকে ছেলেটা হেঁচ্‌কি তুলছে। দেখা যায় না কিছু অন্ধকারে, শুধু শোনা যায় অবরুদ্ধপ্রায় একটা অবুঝ কচি গলার ককানী।

নৌকোগুলো ছেড়ে দিল একে একে।

সুবল ফিস্ ফিস্ করে শুধালো, 'নাও কোথায় নিয়া যাইবো চাচা?'

'হেই পারে।'

'তারপর?'

'আরও পচ্ছিমে।' রহিম বললে, 'ভয় নাই—আমি তো আছি।'

ছেলেটা আর কিছু জিজ্ঞেস করতে যেন সাহস পেল না। এ শুধু তার দেখার পালা—শুধু দেখা…দেখা…দেখা। কাল শেষ রাত্ত থেকে ঘটনার প্রচণ্ড তরঙ্গগুলো যেন ভেঙে পড়ছে ওই একটু জীবনের ওপরে। তার বেগে তার ইচ্ছা অনিচ্ছা ভয়-ভাবনা সব যেন মুছে মুছে গেছে।

শুধু মনে হয়, বাবাও আইলো না—দিদিও আইলো না সাথে।…এখন এক সম্বল রহিম চাচা। তার আরও একটু গা ঘেঁষে বসল ছেলেটা।

ভাটির তীব্র টানে ভেসে ওপারের আর এক আঘাটায় এসে ভিড়ল নৌকো-গুলো। এক খেপ্ পৌঁছে দিয়ে ওপারে ফিরে গেল নতুন খেপের জন্য। দেখতে দেখতে মানুষের ভিড়ে ভরে উঠল নির্জন নদীর তীর। শেষ দলটিকে নামিয়ে দিয়ে নৌকোগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেল কোথায়।

এপারে নতুন জেলা—অজানা পথঘাট।

কে জিজ্ঞেস করল, 'রাস্তা জানে কেডা কেডা?'

চাপা গলায় উত্তর এল, 'ভয় নাই—আমরা জানি।'

'তো আউগাও।'…

অন্ধকারে নড়ে উঠল হাজার মানুষের পা। আর এক দেশের নিরাপদ সীমান্তের দিকে। অনেক গ্রাম ঘুরে বাদা মাঠ পার হয়ে, বাঁধা সড়ক এড়িয়ে পশ্চিমে…পশ্চিমে…পশ্চিমে।…

হাজার মানুষের একটা দলা পাকানো তাল যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে—রাতের পর রাত। দিনে ওরা আশ্রয় নেয় ঝোপে জঙ্গলে পাটখেতে। রাতে নিঃশব্দ পদযাত্রা।

প্রথম রাতে একটা মাঠের পাশে এসে আগের মানুষগুলো থমকে দাঁড়াল। সবাই উৎকর্ণ।

চাপা গলায় কে একজন বললে, 'হুইনবার পাও!'

বাতাসে ভেসে আসছে বুম্ বুম্ শব্দ।

ওদের মাথার ওপরে তারায ভরা প্রশান্ত আকাশ যেন শিউরে শিউরে উঠছে সে শব্দে।

কে বললে, 'উত্তরে।'

'না—না।' আর একজন বাধা দিয়ে বললে, 'পুবে।'—

হ্যাঁ, ওদের পিছনে।

'দেখ—হাইরে বাপ্!'

দূরে অন্ধকার আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠছে একটা রাঙা আভা। সেটা যেন ওদেব তাড়া করল।

'চল—চল। পা চালাও।'

চাপা একটা ত্রাসে চঞ্চল হয়ে উঠল জোড়া জোড়া পা।

সুবল পেছিয়ে পড়ছে।

'হাটতে পারস না সুবল ?' রহিম ফিস্ ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল।

সুবল বললে, 'লাগে চাচা। হেই গুলীর ব্যথাটা'…

'কাইল সকালে আবার বাঁইধা দিমু। চল অখন।'

দুটো ছেলে দুই কাঁধে—হাতে একটা বোঁচকা রহিমের। পেছনে বৌ। এগিয়ে চলল।

প্রাণপণে সুবল লেগে রইল রহিমের গায়ে গায়ে। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। একটা ব্যথার চিড়িক যেন পা থেকে উঠে আসছে মাথায়। রহিম চাচা ছাড়িয়ে চলে গেল। গেল রহিমের বৌ। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেঁটে চলল সে। ওই তো রহিম চাচা তার আগে আগে—ওই তো সকলের মাথার ওপর থেকেও দেখা যায় তার কাঁধে বসানো দুটো ছেলের মাথা। তারপর ? তারপর আর না। রহিম চাচা কোথায় হারিয়ে গেল। সে পা টেনে টেনে চলেছে আর কার পাশে পাশে যেন। অচেনা মানুষ। তা হোক। দলের লোক তো। সুবল ঘাবড়ালো না।

কিন্তু সে-ও এগিয়ে চলে গেল তাকে ছাড়িয়ে। তারপর আরও একজন… আরও একজন…আরও একজন। সবাই যেন ছুটছে। সবাই তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

'হেই যা, গেল…পইরা গেল। কার পোলা।'

বোধ করি মিছিলের ভিড়ে যে যার পোলাপান হিসেব করে দেখে নিলে। ঠিক আছে।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে সুবল। পা টেনে টেনে হাঁটতে সুরু করেছে আবার।

মিছিলের শেষ প্রায়।

অচেনা একজন জিজ্ঞেস করলে, 'কার পোলা ?'

সুবল ঢোক গিলে বললে, 'আমার রহিম চাচা আউগাইয়া গেছে।'

বাবা নাই—দিদিও নাই এ দলে, কার নাম আর করবে। জানে শুধু তার হিজল গাঁয়ের রহিম চাচাকে।

আর কেউ কিছু জিজ্ঞেসও করে না—কথাও বলে না। শুধু চলে যায় একে একে তাকে ছাড়িয়ে।

তবু প্রাণপণে চলেছে সে সকলের পেছনে।

এক বুড়ীকে সঙ্গে করে চলেছে ক'জন মেয়ে। তাদের চলন মন্থর। তাদের সঙ্গে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগল সুবল।

সহসা থমকে দাঁড়াল সামনের মানুষ।

'আইজ আর যাওন যাইব না—সামনে সড়ক।'

পাকা সড়কে খান-সেনার জিপ—ট্রাক—কনভয়। সড়ক তাদের এক্তিয়ারে।

ওদিকে পুবের আকাশে আলো ফুটে উঠছে।

আশ্রয়···আশ্রয়···আশ্রয়। ব্যাকুল চোখে তাকাল জোড়া জোড়া চোখ।

এখানে বন-জঙ্গল বড় একটা নেই। সামনে ধু ধু করছে ফাঁকা মাঠ। ওরা আর এগোতে ভরসা পেল না। খানিকটা আবার পেছিয়ে এসে একটা পাট-খেতের মধ্যে পিল পিল করে ঢুকে পড়ল মানুষগুলো।

এতক্ষণে একটু বসতে পেয়ে সুবল যেন বেঁচে গেল।

কে কোথায় বসেছে ঠিক নেই। রাতে, সেই হাজার মানুষের মহাপিণ্ডটা দিনের আলোয় এই পাটখেতের মধ্যে যেন টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সুবল এদিক ওদিক চোখ ফিরিয়ে দেখল—রহিম চাচাকে কোথাও আর দেখা গেল না। খোঁজার সুবিধে নেই। পাটখেতের বাইরে বেরুনো নিষেধ।

নিষেধ হাঁক-ডাক।

'সামনে সড়ক—হুঁশিয়ার।'···

সড়কে ওদের ভয়। হুস হুস করে ছুটে যাচ্ছে মিলিটারী জিপ। পাটখেতের ভেতরে ভেসে আসছে ফৌজী কনভয়ের গর্ গর্ শব্দ। লুকানো মানুষগুলো পারতপক্ষে কথা বলে না—নড়ে না, চড়ে না। শুধু ফিস্ ফিস্ কথা। অদূরের সড়কটা যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর ইসারার মতো সারাদিন চেপে বসে রইল ওদের সামনের পথ জুড়ে। অথচ ওই সড়কটা ওদের পার হয়েই যেতে হবে। ওরা অপেক্ষা করতে লাগল অন্ধকারের।

সুবলের পাশেই বসেছে সেই বুড়িকে ঘিরে মেয়েদের দলটা। কোনো পুরুষ নেই ওদের সঙ্গে। ছোট একটা মেয়ে আছে—বোধ করি সুবলেরই বয়সী হবে। বার বার তাকিয়ে দেখছে সুবলকে। বোধ করি অবাক হচ্ছে—আর কেউ নেই সঙ্গে, শুধু একটা ছেলে। ওর ফ্রকের কোঁচড়ে মুড়ি—খাচ্ছে মুঠো মুঠো। দলের মেয়েরা ঝিমুচ্ছে বসে বসে।

কি জানি কি মনে হলো মেয়েটার—চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে সুবলকে, 'এই, তোমার মুড়ি নাই।'

সুবল নীরবে মাথা নাড়ল।

নিজের ফ্রকের কোঁচড় দেখিয়ে বললে, 'খাবা ?'

সুবল চুপচাপ বসে রইল।

মেয়েটা সরে এল কাছে। ফ্রকের সামনেটা মেলে দিয়ে বললে, 'খাও।'

সুবল এক মুঠো মুড়ি তুলে নিল।

'তোমার নাম কি?'

'সুবল।'

'আমার নাম আসমানতারা। বাজান ডাকত তারা।'

'কই তোমার বাজান?'

'জান না? মাইরা ফেলাইছে। মিলিটারী।' মেয়েটা তার চোখ দুটো বড় বড় করে বললে, 'দাদারেও।' মেয়েটা কথা ভালোবাসে। ফিস্ ফিস্ করে হলেও কথা বলতে যেন তার উৎসাহের আর শেষ নেই। বললে, 'তোমার বাজান কই? মা কই?'

সুবল শুধু মাথা নেড়ে বললে, 'নাই।'

'আর কেউ নাই! কেউই নাই!' মেয়েটা যেন অবাক হলো।

সুবল বলল, 'আছে—আমার রহিম চাচা আছে।'

'কই?'

'আউগাইয়া গেছে।'

আসমান চুপ করে গেল খানিক। কি যেন ভাবল। তারপর বললে, 'তুমি খোঁরাইয়া হাঁট ক্যান?'

সুবল পা'টা দেখিয়ে বললে, 'ছাখছনি—পা'টা কি হৈছে?' তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, 'গুলী লাগছিল।'

'গুলী!'

একটা পাকা পুরুষালি গর্ব এবং সাহস ফুটে ওঠে সুবলের কচি গলায়। শুধু গম্ভীর হয়ে বললে, 'হুঁ।'

'ইস্!' আসমানতারা বললে, 'পা'টা কি ফুইলা উঠছে!'

রহিম চাচা বলেছিল, বেঁধে দেবে নতুন করে। কিন্তু কোথায় রহিম চাচা আর কোথায় কী। সুবল পায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগল। ফুলে উঠেছে এখন হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। কুঁচকির কাছ বরাবর কেমন একটা টন্‌টনে ব্যথা।

আসমানী বললে, 'তোমার চোখ দুইডাও লাল টকটক করছে।'

সুবল হাই তুলে বললে, 'ঘুম পাইছে।'

আশেপাশে অনেকে শুয়ে পড়েছে। সুবলও শুয়ে পড়ল।

'আমারও ঘুম পাইছে।' একটু ফিক করে হেসে আসমানী শুয়ে পড়ল পাশে। কিন্তু তার কথা থামল না। তার গ্রামের কথা, তার বাজানের কথা, আরও কত। একাই সে বক্‌বক্ করে যেতে লাগল। তার একটা কথাও কানে গেল

না সুবলের। শুধু ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল—যাক রহিম চাচা। আসমানীর সঙ্গে তার চেনা যখন হয়ে গেছে—তাদের সঙ্গেই সে চলে যেতে পারবে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল—মনে নেই। কোথায় ঘুমিয়ে আছে—তাও মনে নেই। আসমানীর ডাকে সুবল চোখ মেলে তাকাল। আসমানী তার হাত ধরে টেনে তুলছে।

'এই—আরে···কত ঘুমাইবা। হক্কলে চইলা যায় যে!'

সুবল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ওই কচি এক ফোঁটা শরীর—যেন নাড়ানো যাচ্ছে না। চোখ মুখ জ্বলে যাচ্ছে। পুড়ে যাচ্ছে সারা গা।

'আসমানী কই গেলি আবার?' মা ডাকল।

আসমানী ছুটে বেরিয়ে গেল পাটখেত থেকে।

কখন বেলা শেষ হয়ে আবার অন্ধকার নেমে এসেছে। আগের মানুষ চলতে সুরু করেছে। চলার সেই উদগ্রীব চঞ্চলতা। মাঠ বেয়ে এগিয়ে চলেছে একটা নীরব সর্পিল ধারা।

টলতে টলতে পাটখেতের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল সুবল। কই আসমানী! চোখ ডলে ভালো করে চেয়ে দেখল সুবল: নাঃ—আসমানীকেও আর দেখা যায় না। রহিম চাচার মত সে-ও বোধহয় হারিয়ে গেল।

তার সামনে, পাশে, পেছনে মানুষের ভিড়—সবাই ছুটে চলেছে সামনের দিকে, তাকে ছাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে সবাই। দেখতে দেখতে সবাই যেন মিলিয়ে যাচ্ছে সামনের অন্ধকারে।

ডান পা'টা একেবারে অসাড়। তবু প্রাণপণ টেনে টেনে ঘষটে ঘষটে কয়েক পা এগোল সে—তারপর বসে পড়ল ধপ্ করে।

তার ঘোলাটে চোখের সামনে তারাভরা অন্ধকার আকাশটা যেন একবার দুলে উঠল। অন্ধকারে তারপর আর কিছু দেখা যায় না—শোনা যায় না।

শুধু যেন মা তার এসে দাঁড়াল সামনে। কই, চোখ দুটো তো আর ঠেলে বেরিয়ে নেই, মুখটাও তো আর সেই বীভৎস রকম হাঁ করে নেই! তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। বকছে:

'মারে ছাইড়া যাও পাজি! উঠ উঠ—এই বুঝি তোর শোঅনের জাগা।'

পুরাতন ভূত

লোকগুলো বানে যদি বা বাঁচে তো মারীতে আর বাঁচে না।

জলায় ডোবায় এসে ঠেকেছে যত আবর্জনার স্তূপ—কাঠ-কুটো, পচা পাতা আর গোরু-ছাগলের মড়া, এখানে-ওখানে পড়ে আছে কোন্ গেরস্থালীর হাঁড়ি কলসী। বানের জল সরে যাওয়ার পর চারদিকে কেমন একটা ছন্নছাড়া লক্ষীছাড়া ভাব। বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে দুর্গন্ধে। তাকে আরও কুৎসিত করে তোলে শকুনের সুতীক্ষ্ণ কর্কশ চিৎকার। মনে হবে হঠাৎ—বুঝিবা এ কোন আদিম পৃথিবীর খণ্ড একটা, সবে জলের তলা থেকে উঠে সিক্ত কর্দমাক্ত দেহে শুদ্ধ চোখে চেয়ে আছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। ছন্দহীন, শ্রীহীন, নোংরা।

পুকুর-জলায় থৈ থৈ করছে জল—কিন্তু জল তো নয়, বিষ। তবু ওরই নোংরা জঞ্জাল সরিয়ে ওই জলই খায় গাঁয়ের মানুষ। আর জল পাবে কোথায়! কলেরা শুরু হতে বেশি দেরি লাগে না।

তাকে ঠেকাবার জন্যে টিকেদারের দল এসেছে বটে, ঘাঁটি পড়েছে বাবুর হাটে, উঁচু লোকাল বোর্ডের রাস্তার ওপর। কিন্তু টিকে দেবে কাকে! যাদের মরণ নেই—সেই বাবুভায়ারাই আগে ভাগে ছুটে গিয়ে টিকে নেয়, কিন্তু যারা মরবে নির্ঘাৎ তাদের টিকেকে বড় ভয়। কারণ কোনও জন্মে অভ্যেস নেই। তাই টিকেদার দেখলেই আর রক্ষে নেই—বন-বাদাড় ভেঙে ছুট।

তবু সেদিন হাট-ফিরতি একটা দলকে ঘিরে ফেললে টিকেদাররা। মুহূর্ত কয়েকের জন্যে বোকা-বোকা চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো লোকগুলো। যেন অবস্থাটা একবার বুঝে নিলে। ওদিকে ইন্‌জেকশন তৈরি হতে লাগল। তার ছুঁচ দেখেই ওদের চক্ষু স্থির। হঠাৎ দুদ্দাড় কে যে কোন দিকে ছুটে পালাল তার ঠিক নেই। ধরা পড়ে গেল শুধু রাধাপদ। প্রাণপণে সে শুধু আর্তনাদ করতে লাগল, 'হেই মামা···হরিপদ্দা···মেরে ফেললে···মরে গেলম—'

ছোকরা টিকেদাররা মহা আক্রোশে যেন তাকেই চেপে ধরলে চার-পাঁচ জনে মিলে—আজ খাড়া দুটো দিন একটা লোকেরও সন্ধান পায়নি তারা। হতাশভাবে রাধাপদ আর একবার শুধু প্রাণপণ চিৎকার করে ডাক পাড়লে, 'মামা!'—

কিন্তু কোথায় মামা, কোথায় কে! দেখতে দেখতে ইন্‌জেকশনের মোটা ছুঁচটা এসে প্যাট করে ঢুকে গেল হাতের পেশীতে। 'বাবারে' বলে রাধাপদ

একবার চিৎকার করে উঠল। পরের মুহূর্তেই সমস্ত স্নায়ু-শিরা-পেশী তার শক্ত হয়ে উঠল। বাইশ বছরের কোঁড়া জোয়ান। 'তবে রে—হে···এ····ই···' করে ঠেলে উঠে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। তারপর আসুরিক শক্তিতে সব ক'জনকে ধরাশায়ী করে দিয়ে ইনজেকশনের ছুঁচ ভেঙে ছুটল সে বন-বাদাড়, খানা খন্দ পার হয়ে। ঊর্ধ্বশ্বাসে একেবারে সে-ই গাঙতলির গাঁয়ে। বাবুর হাটের ঘাঁটি থেকে সে অনেক দূর—প্রায় পাঁচ-ছ মাইল তফাত।

তার ছোটা দেখে শুধিয়েছে কেউ কেউ, 'হলো কি গো!'

রাধাপদ তখন হাতের যন্ত্রণায় অস্থির। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে কোন রকমে শুধু বলেছে, 'টি-টি-টিকেদার!'—

বাস্—তারপর কে যে কোথায় লুকোবে তার ঠিক নেই। এমনি গাঁয়ের পর গাঁ।

টিকেদার তো নয়, যেন সাক্ষাৎ যম। অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ইনজেকশনের অভ্যাস নেই—কলেরা হলে স্যালাইন বা দেয় কে, তার সঙ্গতিই বা কোথায়। এক-আধটা পাশ-করা ডাক্তার যে এদিকে নেই তা নয়, কিন্তু তাদের পশার শুধু বাবুভায়াদের গ্রামেই। আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্র থেকে কিসানদের গাঁ গাঙতলি অনেক দূর।

কিন্তু লুকিয়ে বা পালিয়ে কলেরার টিকেটাকে ঠেকানো গেলেও কলেরাকে আর ঠেকানো যায় না। তার পুণ্যাহ শুরু হয়ে যায় রাধাপদর ঘর থেকেই। কিন্তু হলেও কি মুখ ফুটে কেউ স্বীকার করবে! করবে—সেই যখন হাউমাউ কান্না উঠবে।

দিন কয়েক পরে রাধাপদ কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়াল হরিপদর উঠোনে। বললে, 'ভাইটা মোর মরে গেল গো হরিপদ্দা!'

ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল হরিপদর। বললে, 'তবে কাল জিজ্ঞেস করতে বললে যে, কিছু হয়নি, ও এমনি পেটটা সামান্য খারাপ!'

রাধাপদ হাউমাউ করে বললে, 'আসল কথা বললে তোমরা কেউ মোর ঘরে যাবে না, কেউ ছোঁবে না—খাবে না। আমি কি করি!'

এ এক অপমানকর একঘরে ব্যাধি। হয়েছে শুনলে তার ছায়াও কেউ মাড়াবে না। বসন্তকেও ওরা এত ভয় করে না। সে তো মায়ের দয়া-দাক্ষিণ্যের পর্যায়ে। চাঁদা তুলে কসে শীতলার পুজো লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এ সাক্ষাৎ ওলাবিবির কোপ—ওলাউঠা। দেখতে দেখতে বস্তুটা রাধাপদর ঘর থেকে যায় হরিপদর ঘরে, হরিপদর ঘর থেকে রাধাপদর মামার ঘরে।

শোনা গেল, হরিপদর মা স্বপ্ন দেখেছে ওলাবিবির। ওলাবিবি নাকি ধমকেছে : হরিপদ কেন রাধাপদর ভাইকে পোড়াতে যায়নি।

তখন কণ্ঠাগত প্রাণ হরিপদর। রাধাপদ আসতে হরিপদ তার দুটো হাত কোনরকমে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি তো গেলম রাধাপদ ভাই রে—মোকে ক্ষ্যামা করিস।'

হরিপদ গেল, রাধাপদর মামা গেল, মা গেল, ভাই গেল কিন্তু ওইখানেই শেষ হল না। ছড়িয়ে পড়ল গাঁয়ের অন্য সব ঘরে—সারা বস্তিতে।

এবার ভর নামল হরিপদর মায়ের ওপর। একে বেচারী পুত্রশোকে আতুর—তারপর স্বামীকে ধরল কলেরা। হরিপদর মা সাক্ষাৎ ওলাবিবির মত উন্মত্ত মূর্তিতে ছুটোছুটি শুরু করে দিলে।

গাঁয়ের বুড়ো বুড়ো মাতব্বরেরা তার সামনে হাতজোড় করে এসে দাঁড়াল। বুড়িরা তাকে বার বার গড় করতে লাগল।

হরিপদর ঠাকুর্দা কেষ্টদাস সবচেয়ে প্রাচীন—সে পুত্রবধুর সামনে ভক্তিভরে হাঁটু গেড়ে বললে, 'আজ্ঞে করো মা—কি চাও ?'

হরিপদর মা রক্তচক্ষু মেলে বললে, 'ওই হারামজাদা রাধাপদ যত নষ্টের গোড়া।'

সবাই বললে, 'ঠিক। বাবুর হাট থেকে ওই তো হাতে করে বিষ এনেছে।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে রাধাপদ চোরের মত সরে পড়ল সুড়ুৎ করে।

কেষ্টদাস কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'বাঁচাও মা, বাঁচাও মোদের। ছাপোষা অধম চাষা—ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি।'

'হায় গো—মোর যে সব গেল, সব গেল। ওরে হরিপদ রে'—হঠাৎ বুঝি ভর ভেঙে হরিপদর মা কেঁদে উঠল ডাক ছেড়ে। তারপর ছুটে গিয়ে ঝপাং করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ভরা পুকুরে।

ভরের কথা শুনে এই দিকে ছুটে আসছিল সুদাম দাস—হরিপদর মাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরো ধরো—ওকে ধরো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে, ডুবে মরবে যে।'

বানভাসি অতল পুকুর—তার অথৈ জলে খাবি খাচ্ছে তখন হরিপদর মা। ডুবে তলিয়ে যাবার আগের মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে কাপড়ের আর মাথার চুলের একটু প্রান্ত। গাঁয়ের প্রাচীনেরা চেয়ে আছে ফ্যাল ফ্যাল করে। কে একজন শুধু আস্তে আস্তে টেনে টেনে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'ভর ছাড়ছে এবার।'

'এদিকে প্রাণ ছেড়ে গেল যে, দেখছ কী !' শেষ পর্যন্ত সুদাম পণ্ডিত ছুটে

গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। একেবারে তলিয়ে যাওয়ার আগে কোনরকমে টানাটানি করে একাই টেনে আনল হরিপদর মাকে।

যাই হোক, জল বেশি খায়নি। সামান্য একটু সেবার পরই হরিপদর মা উঠে বসল। তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল সুদামের গলা ধরে, 'ওরে বাপ, মোর যে সব গেল। মোরে কেন বাঁচালে পণ্ডিত—আমি যে ডুবে মরতম গো।'

'মরবে কেন!' সুদাম তাকে টেনে তুলে বললে, 'এখন ঘরে চলো। তোমার ঘরে রুগী, সেবা করবে কে—তুমি মরলে। চলো এখন, ওষুধ দিতে হবে। দরকার হলে ভাল ডাক্তার ডেকে আনব—চল, ভয় কি।'

'বলো তবে—বলো আমার গা ছুঁয়ে, হরিপদর বাপ বাঁচবে?'

'ওষুধ তো দিচ্ছি গো।' সুদাম বললে, 'বিপদ চারদিকে—এখন কি আর মাথা গরম করলে চলে! চলো তাড়াতাড়ি, তোমার রোগীকে এখন ওষুধ দেওয়ার সময় হলো।' হরিপদর মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সুদাম ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু বুড়োবুড়িরা হরিপদর ঠাকুর্দার সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে বললে, 'ই সব কাজের কথাই লয়। বানে ওলাবিবির থান ভেসে গেছে, তাই এই ভর নেমেছে, তাই এতসব বিপদ-আপদ। সিটি তাড়াতাড়ি সারিয়ে দাও।'

নতুন করে ওলাবিবির থান লেপাপোছা হলো কিন্তু কলেরা তখন মহামারীর আকার নিয়েছে। তার মধ্যে ওষুধ আর ডাক্তার বলতে এক হোমিওপ্যাথি। রোগের খবর পেয়ে ঝাঁক বেঁধে হাজির নতুন নতুন হোমিওপ্যাথের দল। এই সুযোগে দু-চার পয়সা রোজগার তাদের ধান্দা। তবু বিপদের দিনে তারাই একমাত্র সহায়। সুদাম তার পাঠশালায় সকলের থাকবার জায়গা করে দিলে।

পাশের গাঁয়ের লোক সে। সামান্য লেখাপড়া শিখে দু-গাঁয়ের মাঝখানে একটা ছোট পাঠশালা খুলে বসেছে। কিসানের গাঁ, পাঠশালায় ছাত্রই বা আর কটা। তাও আবার বানের সময় থেকে তা বন্ধ। এই ছোট পাঠশালাটুকুর সঙ্গে সুদামের হোমিওপ্যাথিক টুকটাকও ছিল। মহা উৎসাহে এখন সে চিকিৎসাক্ষেত্রে নেমে পড়ল।

কিন্তু রোগের শান্তি নেই—রোজই মরছে দুটো-একটা। রোগ প্রায় ঘর ঘর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন পোড়ায় কে কাকে; মড়া টেনে খালের জলে ফেলতে লাগল সব।

হাতুড়ে হোমিওপ্যাথদের মত মহামারীর খবর পেয়ে বৈরাগী-বোষ্টমের দলও

ঘুর ঘুর করতে লাগল। যদি বায়না পায়। কিন্তু বায়না করে কে ! গাঙতলির মানুষ দিশেহারা।

সুদামের বাপই একজন মস্ত বৈরাগী বোষ্টম। হরিপদর ঠাকুর্দাকে একদিন ডেকে বললে, 'বলি সব ক্ষৌত হয়ে গেল যে !'

সে হাউমাউ করে উঠল, 'বলো কি করি চিনিবাসদা।'

চিনিবাস বললে, 'নামকীর্তন করাও—নইলে এ পাপ যাবে না। শ্রীখোল আর কত্তালের শব্দ উঠুক—ওসব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

হরিপদর ঠাকুর্দা গাঁয়ের সকলকে ডেকে এনে বললে, 'শোন কথা।'

চিনিবাস তার বায়েনের দল নিয়ে জেঁকে বসল। বললে, 'মাধবপুরে এইরকম একবার ধরল মহামারী। মোদের ডেকে নিয়ে গেল। সাতদিন ছিলম। তারপর সব ঠাণ্ডা। কি ছিদাম, তোর তো মনে আছে ?'

ছিদাম তার খোলটা কোলে চেপে তৎপর সাফাই দিলে, 'তা আর মনে নাই।'

চিনিবাস বললে, 'তোমাদের বড় বিপদ—তাই কথাটা যেচেই বলতে এলম।' চিনিবাস একটু থেমে থমথমে গলায় বললে, 'সেদিন পষ্ট দেখলম কিনা।'

দিনের আলো তখন শেষ পাট গুটিয়ে দিগন্তে ঝিমঝিম করছে। মলিন ঠাণ্ডায় ভারি হয়ে উঠছে ধানখেতের পচা হাওয়া। সকলে ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় চেয়ে রইল চিনিবাসের মুখের দিকে।

হরিপদর ঠাকুর্দা সাহস করে জিজ্ঞেস করলে, 'কি দেখলে ?'

'তোমাদের গাঁয়ের পূর্বপুরুষদের।' চিনিবাস তেমনি থমথমে গলায় বললে, 'যেন তোমাদের গাঁ ছেড়ে শ্মশানের পথ ধরে চলে যাচ্ছে সোজা পুবে। কি যেন গুন্‌গুন্ করে বলতে বলতে যাচ্ছে। বগলে সব চ্যাটাই কাঁথা বালিশ।'

'ভূত দেখলে ? পষ্ট দেখলে !'

চিনিবাস বললে, 'তাদের ভূত বলোনি, তারা তোমাদের পূর্বপুরুষ। তারা এতদিন গাঁয়ে ছিল, আজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তার মানে সব ক্ষৌত হয়ে যাবে।'

'তাহলে কি হবে !' হরিপদর ঠাকুর্দা ভয়ে-ভাবনায় হাউমাউ করে উঠল। বললে, 'আমিও সেদিন দেখলম—ভর দুপুরবেলা একটা শেয়াল আমাদের এই দিকে মুখ করে হাউহাউ করে কাঁদছে।'

চিনিবাস বললে, 'সর্বনাশ ! কসে হরিনাম লাগাও, মোদের এই শ্রীখোল কত্তাল আর রামশিঙের শব্দে সব পাপ বাপ্ বাপ্ করে পালাবে। আর একটি দিনও দেরি লয়। বলে দিলম।'

ভয়ে-ভাবনায় রাজী সকলেই। তারপর দর-কষাকষি। শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো —রাত পিছু দেড় টাকা। তিন প্রহরে তিন দল সারা গাঁ প্রদক্ষিণ করবে।

চিনিবাস নিমরাজী হয়ে বললে, 'তোমাদের এ ভূতুড়ে গাঁ হয়ে গেছে—রেটটা বড় কম হলো কিন্তু। মোদের প্রাণ হাতে করে নাম গান।'

হরিপদর ঠাকুর্দা তার হাত দুটো চেপে ধরে বললে, 'এখন এই কুঁড়ো নিয়ে খুশি হও—ধান হলে কাঁড়ি দিয়ে শুধব বৈরাগী।'

কীর্তনীয়ার দল রাজী হয়ে গেল।

এবার ওদের আস্তানার ব্যবস্থা করা দরকার। তিন দল মিলে অন্তত জনা পনেরো লোক তো হবে। হরিপদর ঠাকুর্দা গাঁয়ের কয়েকজনকে নিয়ে হাজির হলো সুদামের কাছে। বললে, 'তোমার পাঠশালায় কীর্তনীয়াদের থাকতে দাও।'

সুদাম ভুরু কুঁচকে বললে, 'হরিনামে কলেরা তাড়াবে?'

'না হলে আর বাঁচার কি পথ বলো পণ্ডিত।'

সুদামকে সবাই খাতির সম্মান করে—সামান্য হলেও লেখাপড়া শেখা মানুষ! তার মুখের দিকে সবাই চেয়ে রইল।

সুদাম বললে, 'এই হরিনামের পেছনে টাকাগুলো নষ্ট না করে বরং তারানাথ ডাক্তারকে আনাও। আগে ছিলেন এলোপ্যাথ—এখন হোমিও করেন। তাঁর পায়ের কাছে বসে শিখেছি—তাঁকে জানি! তাঁর ওষুধে মরা মানুষও উঠে বসে।'

হরিপদর ঠাকুর্দা বললে, 'কিন্তু নাম-কীর্তনের কথা বললে তোমারই বাপ। আমরাও বলি—'

সুদাম ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিলে। রাগ করে বললে, 'ওই করে কলেরা তাড়াবে?—তাড়াও তবে। আমার পাঠশালায় জায়গা আর নেই। ভিন-গ্রামের ডাক্তার কজন আছে। এ বিপদে তারাই সহায়। তাদের তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না।' বলে হন হন করে চলে গেল।

হরিপদর ঠাকুর্দা কপাল চাপড়ে বললে, 'এই হলো দু-পাতা লেখা-পড়া শেখার ফল। বোষ্টমের ছেলে হয়ে বলে কিনা, নাম-গানে কী হবে! এখন ডাক্তার রাখবে, না কীর্তনীয়া ডাকবে—ঠিক করো তোমরা সব।'

এ অবস্থায় গাঁয়ের মানুষ ভয়ে ভাবনায় অস্থির। তারা সহজভাবে শুধু এইটুকু বোঝে—এ বিপদের দিনে সুদাম পণ্ডিত আর ডাক্তারদেরও যেমন দরকার, তেমন দরকার নাম-গানেরও। তাই শেষ পর্যন্ত তারানাথ ডাক্তারও

যেমন এল—তেমন কিসানপাড়ার একপ্রান্তে কীর্তনীয়াদের জন্তে তৈরি হল কাঠ-কুটো শরের বেড়া দিয়ে লম্বা এক চালাঘর। চিনিবাসের দল এসে আস্তানা গাড়লে সেখানে।

হরিপদর ঠাকুর্দা চিনিবাসকে বললে, 'তোমাদের থাকবার ভাল জায়গা দিতে পারলম নি, রাগ করোনি বৈরাগী। তোমার ব্যাটাকে বললম পাঠশালের কথা, কিন্তু তোমরা থাকবে শুনে মুখ বেঁকিয়ে টর্‌র্‌ হয়ে চলে গেল।'

কথাগুলো গায়ে লাগে চিনিবাসের—এমন কথা সে আরও শুনেছে। সুদাম যেন তার ছেলেই নয়—একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেছে। তাকে নিয়ে চিনিবাসের ভারি লজ্জা। চিনিবাস মুখ ভার করে বললে, 'কি বলল সে!'

'বলল—হরিনামে কলেরা তাড়াবে? শোনো কথা, বোষ্টমের ছেলে নাম-গানের গুণ বুঝে না গ!'

চিনিবাস কটমট করে তাকিয়ে বললে, 'বলল সে এই কথা।'

'আরও বলে কি শোন।' হরিপদর ঠাকুর্দা বললে, 'এইভাবে টাকাগুলো নষ্ট না করে বরং তারানাথ ডাক্তারকে আনাও। শুনে আমি বলি'—

হরিপদর ঠাকুর্দার আর কিছু বলার সুযোগ হলো না, চিনিবাস রাগে প্রায় লাফ দিয়ে উঠল। এ শুধু রুজি-রোজগারে বাগড়া নয়, তার বোষ্টম সমাজের অপমান, তার ধর্মবিশ্বাসের মূলে আঘাত, যেন বাপ চিনিবাসের ওপরই যত অবহেলা আর অশ্রদ্ধা ছুঁড়ে মারা। চিনিবাস চিৎকার করে অভিশাপ দিতে লাগল, 'ও মরবে—মরবে—অপঘাতে মরবে। এই আমি বলে দিলম, তোমরা দেখে নিও। দেখি ওর তারানাথ ডাক্তার এসে গাঁয়ের মহামারী কেমন করে থামায়।' চিনিবাস হাত-পা ছুঁড়ে একাই একশ' হয়ে চেঁচামেচি করতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত তারানাথ ডাক্তারও এল, ওদিকে চিনিবাসের দলের খোল-করতাল, রাম শিঙেরও গর্জন উঠল। তারানাথ কি চিনিবাসের গুণ—গাঁয়ের লোক বুঝতে পারল না, তবে ভয়াবহ ব্যাধির প্রকোপ যেন কিছুটা ঠাণ্ডা হলো। হৈ-হল্লায় মানুষজনের যেন সাহস ফিরে এল। কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল ভূতের উপদ্রব।

রোগে শোকে নানা দুশ্চিন্তায় সকলের দিনটা কাটে কোনরকমে। কিন্তু রাত হলে কারুর ধড়ে যেন আর প্রাণ থাকে না। ভয়ে শুকিয়ে লোকগুলো যেন আধমরা হয়ে যায়।

গরিব কিসানের গাঁ—সাঁঝ প্রহরের সঙ্গে সঙ্গে সব ঘরের আলো নিভে যায়।

রোগীর শিয়রেও আলোটুকু জ্বেলে রাখবার সঙ্গতি নেই। ছন্নছাড়া গ্রামের মাঠ-ঘাট-বসতি জুড়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে হা-হা করে শুধু জমাট রাত। তার মধ্যে মহামারীর গ্রাম তার মৃত্যুদীর্ণ সমস্ত ভয়াবহতা নিয়ে আরও বেশি থম্‌থম্ করে। প্রহরে প্রহরে ঘুরে যায় কীর্তনীয়ার দল—কিন্তু তাদের কলকোলাহল যত দূরে সরে যায় ততই যেন একটা ভয়ের রাজ্য ঘনঘোর হয়ে আসে আবার। এর মধ্যে কিসানদের ঝুপড়ি টঙের আশেপাশে কে যেন ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে। কে যেন সুস্থ জ্যান্ত মানুষগুলোর নাম ধরে ধরে ডাকে, এমন কি ঠেলা মারে বাঁশের দরজায়। রোগী তো দূরের কথা, রাত-জাগা সুস্থ মানুষগুলোও ভয়ে আধমরা।

চিনিবাস বললে, 'ভূত, ভূত—সব অপঘাতে মরা যে। ভূত পেত্নী না হয়ে কি স্বগ্‌গের দেবতা হবে।'

গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো হরিপদর ঠাকুর্দা। অভিজ্ঞতায় টইটম্বুর। বললে, 'তখনি জানি—এ বছর মেলা ভূত হবে।'

রাধাপদ ভয়ে সিঁটিয়ে গেল। বললে, 'কাল যেন মোর নাম ধরে কে ডাকল!'

চিনিবাস বললে, 'ও ডাক একবার শোনা মানেই তার শেষ।'

রাধাপদ প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'তবে মোর কি হবে গো!'

চিনিবাস কঠিন মুখ করে বললে, 'ডাকলে তো শুনি কলেরা ধরে। এখন তোমাদের তারানাথ ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে দেখ—কি হয়।' বলে চিনিবাস মুখ বেঁকিয়ে হাসল।

ভয়ে না ভূতের ডাকে কে জানে, বিকেলে রাধাপদকে কলেরা ধরল।

ডাক যে শুধু রাধাপদ একা শুনল তাই নয়, এ প্রায় ঘর ঘর। রাতের পর রাত।

তারানাথ ডাক্তার বিব্রত হয়ে বললে, 'লোকগুলো যে ভয়েই আদ্দেক মারা যাবে দেখি সুদাম।'

সুদাম বললে, 'এ তো মহা মুশকিল হলো স্যার!'

রোগের প্রকোপ আবার নতুন করে শুরু হলো। রাতের অন্ধকারে মনে হয়—এ গ্রাম নয়, এ শ্মশান। এখানে ভয়ে কেউ কাঁদেও না—হাসেও না। অন্ধকারের রহস্যময় কোন্ ছায়ামূর্তি যেন তার অদৃশ্য দুই হাতে চেপে ধরেছে এ গ্রামের জীবন্ত কণ্ঠ। সাক্ষাৎ মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ ধরে সে শুধু ডেকে যাচ্ছে দুয়োর থেকে দুয়োরে। ইতিমধ্যেই কয়েকটা ঘর একেবারে সাফ হয়ে গেছে। সেখানে জীবনহীন স্তব্ধতা আরোও ভয়াবহ ভয়ঙ্কর। যে ঘরে জীবন্ত মানুষ আছে—সে ঘরও মৃত্যুভয়ে ভীত, দুরু-দুরু বুকে অপেক্ষা করে আছে কখন কার ডাক পড়ে।

ভূতের দৌরাত্ম্য শেষ পর্যন্ত ডাক্তারদের ঘাঁটি সুদামের পাঠশালায় পর্যন্ত হানা দিলে।

একদিন খোনা খোনা গলায় ডাক উঠলো, 'বাঁবাঁ সুঁদাম।'

কিন্তু কাজটা বোধ হয় কাঁচা হয়ে গেল। সুদাম ব্যর্থতায় ক্ষোভে মরিয়া হয়ে উঠেছিল মনে মনে। খোনা খোনা গলার আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে দরজা খুলে ছুটে গেল অন্ধকারে। ভূত বোধহয় এতটা সাহস আশা করেনি। হঠাৎ সুদামের সামনা-সামনি পড়ে সে সোজা ছুটতে লাগল বৈরাগীদের আস্তানার দিকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল মাঝপথে। সুদাম তার চুলের ঝুঁটি ধরে চেঁচামেচি করে একটা হল্লা পাকিয়ে তুললে।

ছুটে এল কীর্তনীয়ারা, ছুটে এল গাঁয়ের মানুষ, এল ডাক্তারের দল। তাদের মধ্যে নেই শুধু তারানাথ ডাক্তার—তার থাকবার জায়গা পাশের গাঁয়ে। খবরটা সে-ই শুধু পেল না।

লণ্ঠন এনে দেখা গেল—ভূত বৈরাগীদেরই একজন। সুদাম বললে, 'এই নাও তোমাদের হরি-নামের ভূত।'

গাঁয়ের মানুষ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল বোকার মত।

লোকটার চুলের ঝুঁটি ধরে কয়েকবার টানাটানি করে সুদাম বললে, 'বলি এমন কটি ভূত আর আছে ?'

লোকটা হুঁ-ও করলে না. হাঁ-ও করলে না—পাথর-কঠিন চিনিবাসের মুখের দিকে একবার চাইলে শুধু। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদাম একবার তাকাল তার বাপের দিকে—বললে, 'তোমার এই কাণ্ড, ছিঃ !' বলে সে লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে ক্ষোভে ও ঘৃণায় চলে গেল সেখান থেকে।

সমান ক্রোধ ও ক্ষোভে ফেটে পড়ল চিনিবাস—অভিসম্পাত দিতে লাগল, 'বৈরাগী বোষ্টমের গায়ে যে হাত দেয়, তার হাত খসে পড়বে। ভগবান তার শাস্তি দেবে।'

হরিপদর ঠাকুর্দা বললে, 'কাণ্ডটা কি হলো—বুঝতে পারলমনি তো।'

চিনিবাস বললে, 'হবে আর কি, আমার গুণের ব্যাটা আমার শিঙে বাজিয়ে লোকটাকে ভূত বলে টানতে টানতে এনেছে। বলি ভূতকে কেউ কখনো জাপ্‌টে ধরতে পারে ? তেনারা তো হাওয়ায় মিশে যায়।'

বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে মিলে গাঁয়ের মানুষের কাছে ব্যাপারটা রহস্যময়ই হয়ে রইল। ভূত নেই—একথা কিসান গাঁয়ের মানুষকে বোঝাবে কে !

সেখানে চিনিবাসের আধিপত্য অপরিসীম। তবু এই একটা ব্যাপার ঘটে

যাওয়ার পর চিনিবাস ক্রোধে আর আক্রোশে মনে মনে দাঁত চেপে রইল। তার মনে হতে লাগল, এ গাঁয়ের একটা লোককেও যদি সুদামের দল ওষুধপত্র দিয়ে বাঁচায় তাহলে চিনিবাসের যেন মস্ত হার হয়ে যাবে। তারপর থেকে কোন কথায় সুদামের নামটা একবার কেউ তুললে আর রক্ষে নেই। চিনিবাস চিৎকার করে ওঠে, 'খবরদার—খবরদার, ওর নাম আমার সামনে মুখে আনবে নি বলে দিচ্ছি।'

সুদামও যেন তারানাথ ডাক্তার আর তার খুদে হোমিও বাহিনী নিয়ে পাল্টা উঠে পড়ে লেগে গেছে। শুধু ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসাই নয়—মায় সেবা পর্যন্ত। খাওয়া-শোওয়া-ঘুম তার সব গেছে—দিন নেই, রাত নেই, রুগী আর রুগী।

হঠাৎ একদিন শোনা গেল সুদামকে কলেরা ধরেছে। এবং সেইদিনই তার খুদে ডাক্তারের দল পাঠশালার ঘাঁটি ছেড়ে সরে পড়ল কে কোথায়।

চিনিবাস বললে, 'দেখলে তো। আরে মিছিমিছি তুই বাপকে অপমান করলি, একটা সৎ বোষ্টমের ছেলের গায়ে হাত তুললি। ডেকেছে তোকে কালে —তুই কিনা বোষ্টমের ছেলেকে ভূত বলে ধরলি। এখন বাঁচাক এসে তোর তারানাথ ডাক্তার।'

চিনিবাস সগর্বে ভূতের ডাকের মাহাত্ম্য কীর্তন করতে লাগল। গাঁয়ের মানুষ ভয়ে-ভাবনায় তার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল।

চিনিবাস বললে, 'আরে মোকেও কি ওই নিশির ডাক ডাকেনি। ডেকেছে। কিন্তু বেঁচে আছি শুধু এইটির জন্যে।' বলে সে কোমরের ঘুনশিতে বাঁধা ছোট একটা সরষের পুঁটলি তুলে দেখালে। বললে, 'এর দুটো দানা সরষে ছড়িয়ে যদি ঘর বন্ধ না করে শুতাম তো অ্যাদ্দিনে মোদের সব কটা মরে ভূত হয়ে যেত। এ গাঁয়ে ভূত এখন গিজ গিজ করছে।'

হরিপদর ঠাকুর্দা হাউমাউ করে বললে, 'বাঁচাও দাদা।'

সকলের দিকে একবার জ্বলন্ত চোখে চেয়ে চিনিবাস মহা আক্রোশে বললে, 'কেন, এখন বাঁচাক তোমার তারানাথ ডাক্তার।'

সকলে পরম নির্ভরে ও আশ্বাসে চেয়ে রইল চিনিবাসের দিকে। ও চোখের ভাষা চেনে চিনিবাস ভাল করেই—এমন অনেক কলেরার মহামারী সে দেখেছে। দেখেছে তার আধমরা মানুষগুলোকে। সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। চিনিবাস মনের সুখে নানা গালগল্প করে বেড়াতে লাগল। কলেরা যেন তার ছেলের হয়নি—হয়েছে একটা শত্রুর। কলেরা হয়েছে—বেশ হয়েছে!

সেইদিনই নিশুতি রাত্রে বৈরাগীদের আস্তানাতেও পড়ে গেল মহা হট্টগোল।

গাঁয়ের ভয়-পাওয়া মানুষগুলো ছুটে এল আবার! এসে দেখলে—লম্বা চালাঘরের দরজার সামনে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে স্বয়ং চিনিবাস, আধখানা ঘরের মধ্যে, আধখানা বাইরে। দু-হাতে ধরে আছে দু-পাশের বাঁশের চৌকাঠ। হাঁপাচ্ছে।

হরিপদর ঠাকুর্দা বললে, 'অ্যাঁ, এ কী হলো চিনিবাসদাদা!'

চিনিবাস আস্তে আস্তে উঠে বসে বললে, 'ভূত। ভূতে ধরেছিল।'

'তোমাকেও!'

চিনিবাস আস্তে আস্তে বললে, 'দরজার সামনেটায় কেউ শুতে সাহস পায় না, আমিই সব আগলে শুই। আজ দেহটা ভাল ছিল না। নাম-গান সেরে এসে এমনি শুয়ে পড়লাম। ঘব বন্ধ করিনি, দেহও বন্ধ করিনি—বললাম, থাক। সরষের পুঁটলিটা ওই বেড়াতেই ঝুলছে। তারপর একটু তন্দ্রা এসেছে কি অমনি দুটো ভূত এসে ঠ্যাং ধরে টানাটানি। দু-হাতে চেপে ধরলাম চৌকাঠ। ওরাও টানছে তো আমিও ছাড়িনি।' চিনিবাস হাঁপাতে লাগল।

জীবন্ত মানুষগুলো ভয়ে ঘন হয়ে এল। নিশুতি রাত তখন চারিদিকে শাঁ শাঁ করছে।

চিনিবাস শেষমেস বললে, 'এ গাঁয়ে মোবা আর থাকবনি।'

সকলের বুক ছ্যাঁৎ করে উঠল। হরিপদর ঠাকুর্দা হাউমাউ করে বললে, 'মরণের মুখে মোদের ফেলে চলে যাবে—হ্যাঁ দাদা!'

'ওই সামান্য দেডটা টাকাব জন্যে কে প্রাণ দেবে?' বৈরাগীরা মাথা ঝাঁকি দিলে।

চিনিবাস বললে, 'ওদের নিয়েই মোর কাজ—ওরা থাকতে না চাইলে কি করব।' বলে সে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল।

চিনিবাসের বুড়ো লিক্‌লিকে চিম্‌সে পাকানো শরীরটার ভাঁজে ভাঁজে, রেখায় রেখায় মনে হয়—চাপা নির্মম নিষ্ঠুরতা। দলবল নিয়ে সে চলেই যাবে। গাঁয়ের মানুষ তার হাত পা চেপে ধরলে: 'হেই বৈরাগী…'

শেষ পর্যন্ত রেট উঠল প্রতি বাত তিন টাকা। তবে চিনিবাসের দল থাকতে রাজী হল।

ওদিকে সকাল হতে শোনা গেল—সুদামের অবস্থা খারাপ।

মহামারী যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে; তার হাত থেকে বুঝি কারুর আর

নিস্তার নেই। সুদামও নিস্তার পেল না। এক সময় তারানাথ ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে চলে গেল সুদামের বিছানার পাশ থেকে।

সুদামের শেষ খবর এসে পৌছল চিনিবাসের কাছে। এবার লোকটা একটা কথাও কইল না, কেঁদেও উঠল না। হঠাৎ যেন চুপ করে গেল। তার মুখের ভাবান্তর কিছু হয়েছিল কিনা কে জানে, রাতের অন্ধকারে তা কেউ দেখতে পেলে না। ঝিম মেরে চালার এক কোণে বসে রইল তো রইলই। মাঝপ্রহরের সংকীর্তনে তাকে ছাড়া কেউ বেরুতে সাহস পায় না—কিন্তু সেদিন রাতে সে আর বেরুল না। শেষ প্রহরের কীর্তনীয়ারাও নাম-গান সেরে ফিরে এল—চিনিবাস নড়েও না, চড়েও না। তারপর ভোরবেলা সবাই উঠে দেখলে—চিনিবাস নেই।

বেলা হলো, দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। চিনিবাসের দেখা নেই। চালার এক কোণে তেমনি পড়ে আছে তার খোল, শরের বেড়ায় তেমনি ঝুলছে তার ঘুন্‌শিতে বাঁধা সরষের ছোট্ট পুঁটলিটা। গাঁয়ের মানুষ তাকে না দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত। লোকটার কোন পাত্তা নেই কোথাও। না ঘরে—না গাঁয়ে।

তারানাথ ডাক্তারকে খবরটা বলতে সে শুধু বললে, 'তাই নাকি। তাকে যে দেখলাম সেই শেষরাতের দিকে। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে আমাকে ডেকে তুললে।'

'কিছু বলল ?'

'সুদামের ওষুধের বাক্সটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললে--এটা আপনিই রাখুন ডাক্তারবাবু। ওর পাঠশালায় পড়েছিল—নিয়ে এলম। বলে সে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল তো।'

মানবী

সেদিন কি একটা যেন ছুটি ছিল। সস্ত্রীক ডাক্তার চারু দত্ত বেড়াতে এল বীরু মল্লিকের বিয়ের প্রায় দিন দশেক পরে। বেলা গোটা আষ্টেক হবে। গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানালো বীরু মল্লিক।

পয়লাই সুরু করে দিলে চারু দত্ত। একেবারে খাড়া বোল। ড্রয়িং রুমে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করে বসলো, 'তারপর? নতুন মেয়েলোকটিকে লাগছে কেমন?'

স্বামীর কথা আরম্ভের ভঙ্গীতে চারুর বৌ সুপ্রিয়া আর দাঁড়ালো না, যদিও এ-ব্যাপারে তারই কৌতূহল ছিল বেশী। মুখ চোখ সহসা লাল করে বললে, 'তোমরা কথা বলো। আমি দেখি মানবী কোথায়।' বলতে বলতে সোজা অন্দরের পথে।

বীরু মল্লিক পেছন থেকে গলা উঁচিয়ে বললে, 'ও কিন্তু নেই। মা আর পিসিমার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে গেছে।'

'বটে! এরই মধ্যে গঙ্গায়?' চারু দত্ত চোখ বড় বড় করে বললো, 'মা পিসীমা বুড়ো হয়েছেন—তাঁদের ধম্মকম্ম বুঝলাম। কিন্তু ওরে পাষণ্ড, মাত্র দশদিনে তোর জন্যে তাঁর কত পাপ জমা হলো যে…'

সুপ্রিয়া মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়েছিল—আর দাঁড়ালো না। ত্বরিৎ সরে গেল। ডাক্তার লোকটার মুখটা বড় বেফাঁস।

এবং বীরু চাপা গলায় বললে, 'বাবা পাশের ঘরে।'

চারু শুধু একটা 'হুম্' শব্দ করে থেমে গেল।

বীরু কাচুমাচু হয়ে বলতে লাগল, 'গঙ্গাস্নান মানে…জানিস তো আমার মা পিসিমার দীর্ঘকালের অভ্যেস। এখন উনিও হয়েছেন তাঁদের সঙ্গী। ওঁর নাকি আবার গাঁয়েব পুকুরে সাঁতার কেটে চান করার অভ্যেস আছে…বাথরুমের তোলা জলে মন ভরে না। তাই…ইয়ে…মানে…'

বীরুর কৈফিয়তের ভঙ্গী এবং কেমন একটা সসঙ্কোচ ভেজা ভেজা আদল দেখে চারু ডাক্তার হো হো করে সশব্দে হেসে উঠলো। বললে, 'এই কী সেই ডাক সাইটে মাইকেল-সর্দার বীরু মল্লিক!' সোফায় গা ছেড়ে দিতে দিতে বললে, 'বদলে গেছিস।'

বীরু নিঃশব্দে শুধু একটু হাসলো। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে।

ওদিকে চারুর পরিচিত অট্টহাসির শব্দ হানা দিয়েছে বুড়ো কর্তার বৈঠকখানায়। একজন চাকর এসে খবর দিয়ে গেল—'বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।'

সিগারেট ধরিয়ে চারু একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো, 'যাক, পাষণ্ডের তাহলে ভয় এবং সংশয় দুটোই গেছে—না কী?'

খোঁচা খাওয়া কুকুরের মতো গরগর করে বীরু বললে, 'মেয়েদের বীরু মল্লিক ভয় পেয়েছে কবে?'

'তা জানি।' চারু বললো, 'কিন্তু যাদের ভয় পাসনি তাদের ঘরে আনার সমস্যাও ছিল না। ওই হোটেলে বারে বা অন্য কোথাও প্রবল তুফান বইয়ে দেওয়া পর্যন্ত ইতি। তা সে থাক ভয়ের কথা, কিন্তু সংশয়?'

মাথা ঝাঁকি দিয়ে বীরু বললো, 'সংশয় আবার কী?'

'কেন? বি-এ পাশ মেয়ে, চাকরী করা মেয়ে, অতএব বয়-ফ্রেণ্ডেব সংখ্যা কত, গণেশ উল্টেছে কটা—এসব নিয়ে জিজ্ঞাসা তোর ছিল না?'

'থাকাটা কী অন্যায়? আমার অভিজ্ঞতা তো জানিস।' বীরু সসঙ্কোচে একটু হেসে বললো, 'তা ওতো চাকরী ছেড়ে দিয়েছে। নিজে থেকেই।'

'সুপ্রিয়ার কাছে সেই রকম শুনেছি বটে।' চারু বললো, 'তা হলে সংশয় গেছে?'

'দেখ চারু, খোঁচা দিয়ে আর বিঁধিসনে।' বীরু বললো, 'আমি জানি, আমি কী। বার তিনেক চেষ্টা করেও বি-এটা পাশ করতে পারিনি। বাপের অঢেল থাকলেও সামান্য কেরোসিন তেলের কারবারী আমরা, ব্যবসাটাও একটা ভদ্র গোছের নয়। যেখানে যাই—গন্ধ ওঠে। তারপর…' বীরু থেমে গেল।

চারু বললো, 'থামলি কেন, বলে যা বাকিগুলো—মাতাল, অনাচারী দুশ্চরিত্র…'

বীরু বললো, 'তুই আমার ভোগও জানিস, রোগও জানিস। সেই ডাক্তারী যখন পড়তিস তখন থেকে বার বার তুই আমায় সাহায্য করেচিস। নইলে এ্যাদ্দিনে পচে মরতাম।'

চারু বললো, 'সর্বনাশ! সে সব কথা আবেগের মাথায় বৌকে বলে বসিসনি তো?'

'মনে হয়েছে—বলি। ওর নিরীহ নির্ভেজাল মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মনে হয়েছে—ওকে আমি ঠকাচ্ছি।' একটু থেমে আবার বললো, 'সত্যি বলতে কি, মাঝে মাঝে নিজেকে ওর কাছে খুব ছোটই মনে হয়। দুঃখও

হয় নিজের জন্যে। ও আমার ঘরে আসবে জানলে নিজের শরীরটাকেও এমন করে নষ্ট করতুম না।'

শেষ কথাটায় ডাক্তার চারুর মন সজাগ হয়ে উঠলো। বললে, 'শরীরে মনে দুদিকেই মরচিস মনে হচ্ছে। এ্যাই—তাকাতো আমার দিকে। হুঁ···দেখি তোর নাড়ি।' চুপচাপ খানিক ডাক্তারী সেরে চারু বললো, 'ও কিছু না—ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোর বৌয়ের কাছে ওষুধের ব্যবস্থা করে যাবো। এক আদলেই জীবন শেষ হয়না রে গাধা—সে বড় বিচিত্র। আর একটা কথা মনে রাখিস—আত্মগ্লানির চেয়ে বড় ব্যাধি আর নেই।'

বীরু কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় গাড়ি বারান্দায় ওদের গাড়ি এসে থামলো এবং মা চেঁচামেচি করতে লাগলো, 'এই দরোয়ান, পাঁচিব মা, নন্দরাণী, কৈলাস, বীরু—তাড়াতাড়ি ছুটে আয়।'

দেখতে দেখতে গাড়ি বারান্দায় ভিড জমে গেল। খোদ কর্তা ব্রজকিশোর পর্যন্ত। ব্রজকিশোর বললো, 'হলো কি?'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ী বললো, 'দিদি আজ যাচ্ছিলেন গঙ্গায়।'

'এ্যাঁ! বলো কী!'

সবাই ছুটে গেল গাড়ির দিকে।

মৃণাল পিসী তখনো কাং হয়ে আছে মানবীর কাঁধে। শীর্ণকায়া বেঁটে-খাটো মানুষটি। বিধবা মানুষ—মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে তখনো ভেজা সপসপে থান। মুখ চোখ ফ্যাকাসে· সেখানে তখনো একটা বিহ্বল আচ্ছন্ন ভাব লেগে আছে। ধরাধরি করে মোটর থেকে নামানো হলো মৃণাল পিসীকে।

পেছনে পেছনে নামলো মানবী। সর্বাঙ্গ ওর ভেজা সপসপে—শাড়ীর আঁচল গাছ-কোমর করে তখনো বাঁধা। দুই কাঁধ বেয়ে নেমেছে দীর্ঘ ভেজা চুলের রাশি। মানবী দীর্ঘাঙ্গী। ওর ভেজা কাপড়ের অন্তরাল থেকে ওর বাইশ বছরের পরিপূর্ণ দেহটা যেন প্রচণ্ড ঔদ্ধত্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।

হিরণ্ময়ী তিন আঙুলে তার বৌমার চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে বললো, 'ভাগ্যিস বৌমা সঙ্গে ছিল। সাঁতরে গিয়ে টেনে নিয়ে এলো।'

এক পলকে সকলের চোখ গিয়ে পড়ে মানবীর দিকে।

শ্বশুর ব্রজকিশোর অবাক চোখে তাকালো তার বৌমার দিকে। বললে, 'কী বিপদ! তুমি? বৌমা! তুমি গেছলে?'

ভীড়ের একাংশ থেকে চারু বললো, 'ভয় নেই—উনি সাঁতার জানেন।'

গলার স্বর চিনতে পেরে মানবী চমকে তাকালো ভিড়ের পেছনে। চারুকে

দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, 'আরে—ডাক্তারবাবু! এদিকে এসে পিসীমাকে দেখুন মশাই—ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছেন কী?'

চারু ডাক্তার মানবীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটু মুখ টিপে হেসে বললে, 'কাকে যে দেখি।...'

হঠাৎ মানবী দেখতে পেল সুপ্রিয়াকেও। বলে উঠলো সকলরবে, 'আরে! সুপ্রিয়া! এতদিনে মনে পড়লো?' ও ছুটে গেল সুপ্রিয়ার দিকে।

চারু ডাক্তার তখন তার রোগীর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। মৃণাল পিসীর ফ্যাল-ফেলে মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'দেখলেন তো—কেমন জাঁদরেল মেয়ে এনে দিয়েছি।'

মৃণাল পিসী ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'ও মেয়ে নয়—দেবী, বিপদত্তারিণী...'

'হুঁ', চারু জিজ্ঞেস করলে, 'তা কতটা জল খেয়েছেন?'

'তা খেয়েছিলুম—বৌ বমি করিয়ে দিয়েছে।'

'হুঁ—তাও জানা আছে দেখছি।'... মৃণাল পিসীর নাড়ী দেখতে দেখতে চারু বললো, 'আর জল খেতে যাবেন?'

ব্রজকিশোর মল্লিক জলদগম্ভীর কণ্ঠে হুকুম জারি করে দিলে, 'কাল থেকে গঙ্গায় স্নান বন্ধ। আর বৌমাকে নিয়ে খবর্দার যদি কেউ গেছ।' তারপর চারু ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত গলায় বললো, 'আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেও না চারু।'

সকালে আর ফেরা হলো না চারু-দম্পতির।

সারা দিনটা কেটে গেল হিরণ্ময়ী আর মৃণাল পিসীর জবানী বিস্তারে—বৌয়ের সাহস, শক্তি, রূপগুণের ব্যাখানে। ফিরতে ফিরতে হলো সেই সন্ধ্যে!

গাড়ি বারান্দা ছেড়ে, মস্ত সাজানো বাগান পেরিয়ে দারোয়ানের সন্ত্রস্ত সেলাম এবং ফটক পার হয়ে চারু ডাক্তারের মোটর যখন রাস্তায় এসে পড়লো—সুপ্রিয়া একবার ফিরে তাকালো বিরাট প্রাসাদোপম বাড়িটার দিকে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে, বাগান আলো করা মস্ত একটা ফ্ল্যাশ লাইট।

সুপ্রিয়া যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠলো, 'যাক বাবা, দুশ্চিন্তা ঘুচলো। অতো বড় ঘরে এনে দিয়েছিলুম গরীব মাস্টারের মেয়ে। ভাবনা ছিল—কিনা কী হয়।'

চারু বললো, 'মিনু পিসী কি বলেছে—স্বকর্ণে শুনেছি। কিন্তু তোমার বন্ধুর শাশুড়ী ঠাকরুণ কি বললেন?'

'লক্ষ্মী বৌ।'...সুপ্রিয়া পাল্টা জিজ্ঞেস করলে, 'কিন্তু শ্বশুর কি বললেন?'

'রূপে লক্ষ্মী – গুণে সরস্বতী।'

'আর তোমার বন্ধু?' সুপ্রিয়ার প্রশ্ন।

'ওদের কাঁধে সব দেবী ভর করেছে।'

সুপ্রিয়া বললো, 'মানবীর কপালটা খুব ভালো।'

'ঈর্ষা হচ্ছে বুঝি? বদলাবদলি করবে?'

'বদলালে তুমিই বদলাবে।' সুপ্রিয়া খর গলায় বললে, 'তখন হাঁ করে যেভাবে চোখ দিয়ে গিলছিলে – বেচারী ভেজা কাপড়ে ওই বিপদে এ্যাকসা তখন। অমন বেল্লিকের মতো কী দেখছিলে?'

'মূর্তিমতী যৌবন…স্রষ্টার রূপসৃষ্টির মুন্সিয়ানা।'

ঠিক বটে। মূর্তিমতী রূপ নিয়েই মানবী মল্লিক বাড়ির বৌ – নইলে তার বাপের না ছিল অর্থ, না ছিল কুল-গৌরব। মল্লিক বাড়ির দাবীও ছিল ওই রূপ, বিদ্যেটা ফালতু। শেষ পর্যন্ত সেটাও অবিশ্যি ওদের মুগ্ধ করেছে।

হঠাৎ চারু নিজের মনে একটু হেসে উঠলো।

সুপ্রিয়া বললো, 'হাসলে যে?'

'এই আর কী – মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারটা ভাবছিলুম।' চারু বললো, 'বিয়েটা যেন শুধু একজনের সঙ্গেই নয় – এ যেন গুষ্টিসুদ্ধ বিয়ে করা – মা, মাসী, পিসী, দেওর, শ্বশুর যে যেখানে আছে।'

'মেয়েদের দায়টা তবে বোঝ মশায়।' সুপ্রিয়া বললো, 'আমাদের সকলের মন ভজাতে হয়।'

মন ভজানো দায়টা বড় বিচিত্র – তার যেন আর শেষ নেই। দিব্যি সুন্দর বৌ হলো, বার-মুখো ছেলে ঘর-মুখো হলো, অশান্ত সংসারে শান্তি ফিরে এলো। সব হলো, এখন চাই ছেলেমেয়ে যা হোক একটা। কিন্তু সে কই?

মাসের পর মাস গড়িয়ে বছর গেল। দেখতে দেখতে তিন-তিনটে বছরও কেটে গেল আশায় আশায়। মা পিসীমা – বিশেষ করে মৃণাল পিসীর বিশ্বাসের জগৎ সুদূর প্রসারী। নানা অলৌকিক কাণ্ডকারখানায় তা ঠাসা। ফলে যেখানে যত সন্ন্যাসী সাধক ফকির দরবেশ ছিল তাদের তাবিচ কবচের বোঝা শুধু মানবীর উপরেই চাপলো না – চাপলো বীরু মল্লিকের ওপরেও। কিন্তু কিছুই হলো না। অশান্ত হয়ে উঠলো মানবী। ডাক পড়লো সুপ্রিয়ার।

তাকে একান্তে নিয়ে মানবী বললো, 'ভাই তোর ডাক্তারকে বলে একটা ব্যবস্থা করে দে – ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করাতে চাই, দুজনেই।'

সুপ্রিয়া হেসে বলল, 'সে আর এমন কথা কী গো দেবী, গিয়ে বলবো ব্যবস্থা করতে।'

'ধর — কালই যদি হয়।…'

'বাবা — এত্ত তাড়া?' সুপ্রিয়া হেসে ফেললো। থুৎনী নেড়ে দিলে মানবীর।

মানবীর মুখ গম্ভীর। শুধু বললো, 'হ্যাঁ — তাই।'

'বেশ তাই হবে।'

কিন্তু ডাক্তারী পরীক্ষার কথা শুনে স্বয়ং চারু ডাক্তারের মুখটা বড গম্ভীব মনে হলো সুপ্রিয়ার। শুধু একটা 'হুম্' শব্দ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'কী ভাবছো? হঠাৎ অতো গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?'

'তোমাদের মেয়েদের স্বভাবটা বড় খারাপ।' চারু কৃত্রিম পরিহাসের ভঙ্গীতে বললে, 'বর চাচ্ছিলে — দিলাম বর। আবার কি—না ছেলে চাই। বায়নাক্কার আর শেষ নেই।'

সুপ্রিয়া বললো, 'ভালো মতো আমাদের দুটোই চাই মশাই। আজ মানবীর যে রোখ দেখলুম — ব্যবস্থা একটা করে দিতেই হয়। তুমি না পার —'

চারু বললো, 'মানবীর পরীক্ষা ভালো গায়নাকোলজিস্ট দিয়েই হবে। বীরু মল্লিককে আমার নিজের হাতেই রাখতে হবে সুপ্রিয়া।' ভাবিত কণ্ঠে বললে, 'কি জানি কী বেরিয়ে পড়ে।'

'মানে?'

'আর জিজ্ঞেস করো না।' নীরস গলায় চারু বললে, 'পরীক্ষা করবো — তবে তো বলবো।'

একেবারে পরের দিন না হলেও কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যবস্থা হয়ে গেল এবং মানবী তার সুস্থ স্বাভাবিক সার্টিফিকেট নিয়েই বেরিয়ে এলো। রিপোর্ট আসতে দেরি হতে লাগলো শুধু বীরু মল্লিকের। উদ্বিগ্ন মানবী। উদ্বিগ্ন বীরুও; সে শুধু উদ্বিগ্নই নয় — হঠাৎ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে লাগলো। এর ওপর আবার মানবীর প্রশ্ন:

'কী ব্যাপার বলো তো? তোমার রিপোর্ট দিচ্ছে না কেন?'

একদিন ক্ষেপে গিয়ে মোটর হাঁকিয়ে হাজির হলো গিয়ে চারু ডাক্তারের চেম্বারে। তখন সন্ধ্যা হব হব। রুখে বললো, 'কই আমার রিপোর্ট দে।'

তরল পরিহাসে চারু বললো, 'লড়াই করতে বেরিয়েছিস মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, লড়াই-ই বটে।' নীরসভাবে বীরু বললে, 'তবে আর কারুর সঙ্গে নয়—এবার নিজের সঙ্গে।'

ওর কথার ঢঙে চারু একদৃষ্টে বীরু মল্লিকের মুখের দিকে মুহূর্ত কয়েক তাকিয়ে রইলো। এমনিতে মল্লিক বাড়ির সন্তানের রঙ একেবারে দুধে আলতা। তার ওপর উত্তেজিত রক্তের উচ্ছ্বাসে বীরুর সারা মুখটা মনে হচ্ছে যেন সিঁদুর মাখা।

চারু ধীরে ধীরে বললো, 'স্থির হয়ে বোস—কথা আছে।'

'কথা!'···

মুহূর্তে যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল বীরুর মুখটা। একটা চেয়ার টেনে সে ধপ করে বসে পড়লো। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে উঠলো, 'বু-ঝে-ছি।'

'কি বুঝেচিস্!' জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো চারু।

'মল্লিক ভিলার শো-কেসে আমি পুরুষের একটা ডামি—পুতুল মাত্র।'

'আপাততঃ আত্মধিক্কার তুলে রাখ, আবেগ বাদ দে।' চারু আস্তে আস্তে বললো, 'একটা পোষ্য নে—চুকে যাক ঝামেলা। যতদূর মনে হচ্ছে, মানবীরই ছেলের বায়নাটা বেশী বোধ করি।'

'কেন, আমার থাকতে নেই?' ফুঁসে উঠলো বীরু। বললো, 'পচে গলে ভেতরে ভেতরে আমি শেষ হয়ে গেছি। সে তুই জানিস। এই তো?' একটু থেমে আবার বললো, 'একটা সুস্থ সুন্দর মেয়েকে আমরা সবাই মিলে ঠকিয়েছি। তুই ঠকিয়েছিস। তোর বৌ ঠকিয়েছে।'

চারু শান্ত গলায় বললো, 'শোন। অত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন!'

'আরে দূ-র। বীরু মল্লিক—বীরু মল্লিকই।'···

চেয়ার ঠেলে চেম্বার থেকে বেরিয়ে গেল বীরু। গাড়িতে স্টার্ট নিয়ে চলে গেল হুস করে—সোজা তার ছেড়ে আসা ক' বছরের পুরানো 'ডেন'-এ।

সে গাড়ি আর আস্ত হয়ে ফিরে আসেনি মল্লিক ভিলায়। পরের দিন কলকাতা ছাড়িয়ে অনেক দূরে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল মোটা এক গাছের গুঁড়ির গায়ে একটি ভাঙা তোবড়ানো মোটর, স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে থেঁতলে যাওয়া বীরু মল্লিক, সঙ্গে এক মিসেস কে যেন,—ঘাড় মটকে গেছে।

মল্লিক বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই। অস্বাভাবিক শুধু—মানবী, মা পিসীমার মতো ডাক পেড়ে কাঁদে নি। সে যেন হতচকিত—অপ্রস্তুত।

আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল দিন কয়েক বাদেই। মৃণাল পিসী কোথা থেকে সুন্দর ফুটফুটে মাস দশেকের একটা ছেলে এনে বসিয়ে দিলে মানবীর কোলে।

'এই তোমার ছেলে বৌমা। তোমার পছন্দমতো ওর নাম রেখো।' এই বলে তফাতে সরে গিয়েছিল চোখে আঁচল চাপা দিয়ে।

অবাক হয়ে দেখেছিল মানবী কিছুক্ষণ। সহসা যেন কিছু স্থির করে উঠতে পারছিল না। ছেলেটাও তাকিয়েছিল ডাগর ডাগর চোখ মেলে। হঠাৎ মানবীর কি হলো কে জানে—কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চোখের কোণ বেয়ে। এই রকম একটা ছেলে সে চেয়েছিল কী! ছেলেটাকে সে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। হঠাৎ গলা ছেড়ে কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা।

মা পিসীমা আশপাশ থেকেই বোধ করি লক্ষ্য করছিল—ছুটে এল।

মানবী বললো শুধু, 'কার ছেলে? আমাকে দেখে ভয় পেয়ে গেছে বোধ হয়।' বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মৃণাল পিসী আর হিরণ্ময়ী অবাক চোখে তাকালো মুখোমুখি।

মৃণাল পিসী বাচ্চাটার কান্না থামাতে থামাতে বললো, 'এ কেমন ধারা হয়ে গেল হিরণ।'

হিরণ্ময়ী বললো, 'আহা, আপন করে নিতে সময় নেবে তো।'

কিন্তু আপন করে নেওয়ার বিন্দুমাত্র লক্ষণও দেখা গেল না মানবীর মধ্যে।

সুপ্রিয়া এসে ব্যাপারটা বোঝাতে চেয়েছিল, 'ভেবে দেখ, ওরা সবাই যখন চাইছেন।'…

'আমার চাওয়া না-চাওয়া বুঝি কিছু নেই।' মানবী বলেছিল, 'ওঁরা আসলে চাইছেন ওঁদের বিপুল সম্পত্তির একটা উত্তরাধিকারী। আর আমি চেয়েছিলাম ছেলে—যার জন্যে আমি নিজেকে ক্ষয় করবো, যন্ত্রণায় চিৎকার করবো, তাকে জন্ম দেবো, তাকে বুকে চেপে রাখবো। কি জানি কেন, সেই কবে কলেজে পড়া বায়োলজির ক্লাশগুলো ভয়ানক মনে পড়ে। সে জীবন-রহস্য জানার সুযোগ পেলাম না। আমার সে-কথা জানার পাগলামি ওঁরা কিছুই বুঝবেন না।'

সুপ্রিয়া বলেছিল, 'কি করতে চাস?'

'ওঁরা আমায় আবার চাকরি করতে দেবেন?' সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে আবার নিভে গিয়েছিল। বলেছিল, 'তা-ও বোধ করি দেবে না। ওঁদের আভিজাত্যে লাগবে।' একটু থেমে আবার বলেছিল, 'আমার সময় কাটে না।'…

অবশ্য ওর শূন্য সময় ভরে দেওয়ার জন্য মা ও মৃণাল পিসীর চেষ্টার অন্ত নেই…ছেলেটার ফাইফরমাশে সদা বিব্রত রাখার চেষ্টা করেন। স্বয়ং কর্তা

ব্রজকিশোর আরও অগ্রসর। বিধিমতে পোষ্যপুত্র গ্রহণের জন্য বামুন পণ্ডিতের আনাগোনা শুরু হয়ে গেল, বৈঠকখানায় বসে লম্বা ফর্দ তৈরী হতে লাগলো। অনুষ্ঠান যখন আসন্ন—মানবী একদিন বলা-কওয়া না করে চলে গেল তার বাবার কাছে। রেখে গেল লম্বা একটা চিঠি। শ্বশুরের জন্য। চিঠি তো নয়—মল্লিক পরিবারে বজ্রাঘাত।

মৃণাল পিসী চেঁচামেচি করতে লাগল, 'ডাক সেই হতচ্ছাড়া ডাক্তারকে—আর তার বৌকে। ওরে এ কী বৌ এনে দিলে রে! এঁ্যা!'...

এলো আবার চারু ডাক্তার আর তার বৌ। ব্যাপার শুনে ওরা থ। ব্রজকিশোর গম্ভীর মুখে মানবীর চিঠিখানি ধরিয়ে দিলে চারুর হাতে।

চারু নিঃশব্দে যখন চিঠি পড়া শেষ করলে—ব্রজকিশোর গম্ভীর গলায় বললো, 'এর পর ও মেয়ের সঙ্গে আমাদের আর কোন সম্পর্ক রইলো না—তুমি জানিয়ে দিতে পারো মেয়ের বাপকে। আমিও লিখবো। আর এই দত্তক পুত্র—তাকে কেউ ভণ্ডুল করতে পারবে না। ও আমিই নেবো। আমার এসব সম্পত্তি ওই মেয়ের হাতে পড়বে—আমি তা কখনই হতে দেবো না!'

চারু বললো, 'সে দাবী তো সে নিজেই ছেড়ে দিয়ে গেছে।'

'কথাটা তোমাকে আমিও জানিয়ে রাখলাম।'

সেদিন ওই পর্যন্ত। বোধ করি ঘণ্টাখানেকও কাটল না। চারু সুপ্রিয়া বিদায় নিয়ে নিজেদের গাড়িতে চেপে বসলো। বাগান পেরিয়ে আজও সুপ্রিয়া একবার পেছন ফিরে তাকালো। সন্ধ্যার অন্ধকার পটভূমিতে আজ ওই বিশাল বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল সমাধির মত।

সুপ্রিয়া জিজ্ঞেস করলো, 'শ্বশুর কি বললে?'

'সম্পর্ক ছেদ।' পাল্টা জিজ্ঞেস করলো চারু, 'মা পিসীমা কী বলে?'

'রাক্ষসী।' সুপ্রিয়া বললো, 'মা হবে কী—মায়ের বুক নেই, ভগবান সেই অভিসম্পাত দিয়ে নাকি ওকে পাঠিয়েছে।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলে না। তারপর হঠাৎ সুপ্রিয়া সক্ষোভে ফেটে পড়ল, 'ও পোড়ারমুখির নাম যদি আর কখনো মুখে আনি। দেখে নিয়ো... দেখে নিয়ো...' কি জানি কেন, গলা কেঁপে উঠলো সুপ্রিয়ার। চোখ হয়ে এলো ঝাপসা। নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে যা রোধ করতে চাইলো—তা পারলো না। চোখের কোণে জল এলই।

এক পলক তাকিয়ে নিয়ে চারু বললো, 'কাঁদছ কেন?'

কি জানি কেন। বন্ধু-বিচ্ছেদ? এই সুন্দর পৃথিবীর সংসারে চিরদিনের

জন্য একটা মেয়ের জীবন-যজ্ঞ ব্যর্থ হয়ে গেল বলে ?—সুপ্রিয়া চুপ করে রইলো।

আবার কত মাস কেটে গেল। মাস গড়িয়ে বছর গেল। একটা দিনের জন্যও সুপ্রিয়া আর মানবীর নাম মুখে আনেনি। ডাক্তার তো নয়ই।—তার পসার বাড়ছে। তাই নিয়েই সে ব্যস্ত।

কিন্তু বছর তিনেকের মাথায় হঠাৎ এক চিঠি এসে স্বামী-স্ত্রীর সুশৃঙ্খল সংসারটাকে দুলিয়ে দিলে। চিঠি মানবীর। নিজের ঠিকানা দিয়েছে, নেমন্তন্ন করেছে।

সুপ্রিয়া বললো, 'কিন্তু এ ঠিকানা তো ওর বাপের বাড়ির নয়!'

'হয়তো বিয়ে করেছে।' চারু বললো, 'দেখ না, পদবী বদলেছে কি ?'

'কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

'যাও—দেখে এসো। এই রাণাঘাট লাইনে—ট্রেনের সময়টময়ও তো বলে দিয়েছে।' চিঠিটা নাড়াচাড়া করতে করতে চারু বললো।

সুপ্রিয়া বললো, 'তুমিও যাবে।'

'আমার রোগীটোগী ফেলে··'

'রাখো তোমার রোগী। হয় দুজনে যাবো—নয়তো কেউই যাবো না।'

'কিন্তু ওর নাম মুখে আনবে না বলেছিলে।'

'দেখি মুখপুড়ি কী করছে। অতো জবরদস্তি নেমন্তন্ন কিসের!'

নেমন্তন্নের দিন ওরা রওয়ানা দিলে। ট্রেণে নয়, নিজেদের গাড়িতে। রেল স্টেশনের নাম উল্লেখ করা ছিল—জায়গাটা খুঁজে পেতে দেরি হলো না। পাকা সড়ক ঘেঁষা গাঁ। গাঁয়ের একটি ছেলের সাহায্যে বাড়ির সন্ধানও ওরা পেয়ে গেল সহজে। গাড়ি এসে দাঁড়ালো একটা ছোটখাটো টালির বাড়ির সামনে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িটি—সামনে একটু তরিতরকারীর বাগান, দু-একটা ফুলের ঝাড়। বাঁশ-বাখারির গেট। তাতে উঠেছে ঝুমকো লতা। সঙ্গের ছেলেটি ছুটে ভেতরে খবর দিতে গেল।

বেরিয়ে এল মানবী।

অবাক হয়ে দেখছে চারু আর সুপ্রিয়া। মানবী সব্জীবাগানের সরু পথটুকু পার হয়ে আসছে—কোলে ফুটফুটে একটা গাঁট্টাগোট্টা বাচ্চা।

মানবী গেট খুলে দিয়ে সকলরবে বলে উঠলো, 'ওমা! সুপ্রিয়া···ডাক্তারবাবু! আমি কখন থেকে কান পেতে আছি সাইকেল রিক্সার শব্দ শুনবো বলে।'

চারু হাত বাড়ালো মানবীর কোলের বাচ্চাটার দিকে। তুলতুলে গাল দুটো টিপে দিয়ে বললো, 'ছেলে না মেয়ে ?'

মানবী আড়চোখে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে সগর্বে বললো, 'কেন – এ আমার ছেলে।' সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললো, 'দোহাই তোর, অভিশাপ দিসনি – আজ আমার ছেলের অন্নপ্রাশন।'

সুপ্রিয়া চটে বললো, 'তুই কী রে মানবী – এমন দিনে আমরা যে শূন্য হাতে এলাম ! একটু খুলে লিখতে তোকে যমে ধরেছিল ?'

'যদি না আসিস – যদি ঘেন্না করিস।'

'ঘেন্না ? দে – ছেলে দে।' সুপ্রিয়া ছেলেটাকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো, চুমোয় চুমোয় ভরে দিলে। শূন্যে তুলে ধরে বাচ্চার মুখের দিকে চেয়ে চারুকে বললে, 'দেখ – এ যেন আর একটা মানবী।'

ডাক্তার লিঙ্গ শুধরে দিয়ে বললে, 'মানব।'

সুপ্রিয়া তেড়ে বললে, 'ছেলে দেখলুম – বাপ কই।'

মানবী মৃদু হেসে বাগান দেখিয়ে বললো, 'ওই যে…চাষার মতো, কোদাল হাতে একটা লোক…'

অল্প দূরে সব্জি বাগানে একটি লোক কাজ করছে ঝুঁকে। পরনে পায়জামা, তার ওপরে কোমরে জড়ানো একটা তোয়ালে। আদুল গা। কোদাল নিয়ে মাটি সরাচ্ছে। নেচে নেচে উঠছে সুঠাম পেশী তার চওড়া পিঠ আর বলিষ্ঠ দুই বাহুতে।

মানবী ডাক দিল, 'এই শুনছো – দেখ কারা এসেছেন।'

কোদাল ছেড়ে লোকটি ঘুরে দাঁড়ালো সিধে হয়ে। দীর্ঘ চেহারা – চওড়া কাঁধ, প্রশস্ত বক্ষ। রংটা কালোই কিন্তু স্নিগ্ধ মুখখানি। দূর থেকে হাত তুলে নমস্কার করলো।

মানবী ডাকলো, 'চলে এসো এক্ষুণি !'…তারপর ঘুরে সুপ্রিয়াকে বলতে লাগলো, 'পাগল -- গাছপালার পাগল। জানিস, এসব যা দেখছিস'…

সবটা একটা লোকের সৃষ্টি। মানবীর কথায় গর্বের টান।

বাগানের সরু ফালি পথটা ধরে ওরা এগোচ্ছিল ঘরের দিকে।

সুপ্রিয়া ফুট কাটলো, 'জীবন-রহস্যের সন্ধান তা হলে পেয়েছ ?'

মানবী নিঃশব্দে শুধু হাসলো একটু। উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো সারা মুখ।

সুপ্রিয়া গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করলো, 'মানুষটাকে পেলি কোথায় ?'

'ওর অফিসেই। আমি ওর সহকর্মী।'

সেদিন ফিরতে ফিরতে রাত হলো প্রায় ন'টা।

চারু ডাক্তারের গাড়ি ছুটেছে গাঁয়ের বাইরের পাকা রাস্তা ধরে। দু'জনেই নীরব।

সুপ্রিয়া বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো, 'এ্যাই, কথা বলছো না কেন ?'

'কী বলবো ?'

'যা দেখলে ?'

চারু ডাক্তার অন্য মনে শুধু কেটে কেটে বললো, 'দেবী নয়, দানবী নয়—শুধু মানবী।'

ভেট জমি

অন্নপ্রাশনের আয়োজন ধূমধাম করে চলতে লাগল।

নেমতন্ন সারা গাঁয়ের তো শুধু নয়—দূর গাঁ থেকেও আসবে গণ্যমান্য মানুষেরা, আসবে কয়েকজন বাঘা বাঘা পণ্ডিত—যারা নাকি সমাজের বিধান-দাতা। মহকুমা শহর থেকে আসবে কয়েকজন উকিল, মোক্তার, মায প্রথম মুন্সেফবাবু, ক'জন সদরআলা ভদ্রলোক। চৌধুরী বাড়িতে কোনও সামাজিক অনুষ্ঠান হলে সাধারণত যা হয়—তার কোনও ত্রুটি থাকছে না।

কিন্তু স্বয়ং কর্তা সব আয়োজন থেকে দূরে—নিজের শোয়ার ঘরে উসখুস করছে।

মধু ভট্‌চায্যি বলে গেছে, 'খবর্দার—তুমি ঘর থেকে বেরোবে না। যা করবার আমি ছোটগিন্নির মারফৎ সব করে নিচ্ছি। কিচ্ছু ভেবো না।'

সেই ছোটগিন্নির প্রথম ছেলের মুখে ভাত।

ব্যবস্থা সবই করছে মধু ভট্‌চায্যি—সাকরেদ, এস্টেটের গোমস্তা গোপী চক্রবর্তী। নানা জনের আপ্যায়ন, ফাইফরমাসের হাঁক-ডাক হুঙ্কার—ঘরের ভেতর থেকে সবই শুনতে পাচ্ছে অনঙ্গ। একবার বেরিয়ে উঁকি মারতে যে ইচ্ছে করছে না, তা নয়—প্রকাশ্যে বেরুতে সঙ্কোচ হচ্ছে। গোলগাল দীর্ঘ চেহারা তার—মুখটা ততোধিক গোলাকার। নাকের ডগায় ঝাঁপানো গোঁফ—কিন্তু আজ পাক নেই দুই প্রান্তে—ফলে ঝুলে পড়েছে দু'পাশে টিকটিকির ল্যাজের মত। চাকরে গড়গড়া ধরিয়ে দিয়ে গেছে—নীরবে টানছে ভুড়ুং ভুড়ুং করে।

এক ফাঁকে মধু ভট্‌চায্যি সুড়ুৎ করে এসে ঘরে ঢুকলো। এক পলক অনঙ্গের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'কি ভাবছ বল দেখি অত? টাকা পয়সাগুলো তোমার উড়িয়ে দিচ্ছি—মেরেও বা দিচ্ছি—নাকি?'

'ছি ছি ভট্‌চায্‌', অনঙ্গ বললো, 'ওসব কথা আমি মনেও আনিনি।'

'তবে অতো মনমরা দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

অনঙ্গ বলল, 'মানে···কে কী ভাবছে—'

'আহা, শহরের বাবুভায়ারা যাঁরা এসেছেন তাঁরা তো সব ব্যাপারটাই বোঝেন।' মধু ভট্‌চায্যি বলল, 'পণ্ডিতদেরও সব কথা আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি। গাঁয়ের ভদ্রলোক ক'জনা—তারাও ঠারে ঠুরে বুঝে নিয়েছে সব। ব্যস—চুকে গেল।'

তবু অনঙ্গ জিজ্ঞেস করল আবার, 'কেউ খোঁজ করছে না আমার ?'

মধু ভট্টচায্যি তামাক টানতে টানতে বললে, 'ওই শহরের বাবু ক'জন শুধিয়ে ছিল। বলে দিয়েছি—কঠিন শিরঃপীড়া, ভয়ানক রক্তচাপ বৃদ্ধি। কবিরাজের পরামর্শে একদম শোয়া, বাক্যালাপ বন্ধ।'··

অনঙ্গ বললে, 'বাঁচালে।'···

'বিলক্ষণ', ভট্টচায্যি বললে, 'তোমাকে আমি বাঁচাবো—তুমি আমাকে বাঁচাবে। গাঁয়ে তো আছি এই দুটো ঘর—যা হোক দুধে ভাতে। আর তো সব জ্ঞাতি আত্মীয় কে কোথায় ছিটকে গেল, মামলা···মোকদ্দমায় ভিটে মাটি চাটি হয়ে গেল। এই তোমাদের দালানটুকু ছাড়া চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ না—কি হাল।'

খুবই খারাপ হাল—এদিক ওদিক দু-চারটে ভাঙা প'ড়ো বাড়ি, কোথাও হয়তো টিম টিম ক'রে একটু আলোর রেখা দেখা যায় মাত্র, কোথাও জঙ্গল-আগাছায় ভরে গেছে, সাপ-খোপের আড্ডা—দিনের আলোতেও কেউ সেদিকে পা মাড়ায় না। কেউ উৎখাত হয়ে গেছে—কেউ ঘর-জামাই হয়ে এ গ্রামের বাস উঠিয়ে চলে গেছে, কেউ যজমানীব দায়ে অন্য গাঁয়ে চলে গেছে। শুধু এদিকে গম্‌গম্‌ করছে অনঙ্গ চৌধুরীর বাড়ি—আর পাড়ার এক প্রান্তে মধু ভট্টচায্যি। তার দেউলে নিত্যি সকাল সন্ধ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজে, প্রবল শঙ্খ এবং ঘণ্টাধ্বনিতে জনশূন্য বামুন পাড়ার শুব্ধতাকে কিছুক্ষণের জন্যে যেন একটা ঝাঁকানি দিয়ে আবার নিঃসাড়ে মরে যায়। চাষাভুষোর পাড়া—ধন বসতির পাড়া, মাঠের ওপারে অনেক দূবে। তার সাড়া শব্দ এদিকে আসে না।

মধু ভট্টচায্যি তামাক খাওয়া সেরে বললে, 'যাই—ওদিকে ঢের কাজ পড়ে আছে। তুমি কিচ্ছু চিন্তা ভাবনা করো না।' পাকানো বেতের মতো চেহারাটা ছিটকে বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সব ঠিক ঠিক সামলে দিলে ভট্টচায্যি।

নিমন্ত্রিত ভদ্রজনেরা পরিতৃপ্তিতে খেয়ে দেয়ে একে একে বিদায় নিলো। বামুন পণ্ডিতেরা ছাঁদা বাঁধলে, থালা ঘটি বাটি দান পেল, মোটা দক্ষিণা বিদায় পেল। দু'হাত তুলে তারা নানা শাস্ত্র বচনে ছেলের শতেক শরৎ পরমায়ু প্রার্থনা করে গেল। কাঙালী ভোজনও হলো অনেক রাত পর্যন্ত। এদিকে বাকি কিছু রইল না। শুধু খেতে এলো না গাঁয়ের চাষাভুষোরা। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত হলো—রাত গড়িয়ে গভীর হলো। মধু ভট্‌চায্যি শেষ পর্যন্ত হুঙ্কার দিতে লাগল :

'দেখে নেবো—ব্যাটা উদো চাষাদের দেখে নেবো।'

ঘরের ভেতর বন্ধ থেকেও সে কথা কানে যেতে দেরি হলো না অনঙ্গের। উসখুস করতে লাগল।

খানিক বাদে ঘরে ঢুকলো মধু ভট্‌চায্যি—এসে চাপা গলায় প্রায় ফেটে পড়ল, 'দেখলে ব্যাটাদের কাণ্ড। ব্যাটাদের কথাবার্তা আগেই আমার একটু একটু কানে এসেছিল—ব্যাটারা হাটেবাটে বলাবলি করছিল, "কোর্ট-কাছারি করা, ছাড়-পত্তর করা বউ—তার নাকি ছেলের মুখে ভাত। কার না কার ছেলে মশায়, খেতে যেয়ে জাত যাবে, ওই ভট্‌চাযই সুযোগ পেলে বেকায়দায় ফেলবে শেষ কালে!" তো আমিও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলাম বড় বড় সব বামুন-পণ্ডিত—দেখুক, বিশ্বাস হোক। শেষ পর্যন্ত ব্যাটারা কেউ এলই না! ব্যাটা ছোট জাত—তোদের আবার জাত অজাত কী রা!'

এই রকম একটা ঘোঁটের ভয়ই করছিল অনঙ্গ। একটা ঢোক গিলে বললে, 'উকিলকে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না—ডাইভোর্স করা বউয়ের ছেলে যদি দৈবাৎ হয়ই—তা হলে আইনের চোখে কী দাঁড়াবে।'

মধু ভট্‌চায্যি বলল, 'সে-আইন মোতাবেক—ও ছেলে তোমার নয়।'

'এ্যাঁ!'··অনঙ্গ চৌধুরী অন্ধকারে শুধু একটা দীর্ঘ শব্দ করল।

'তাই তোমাকে অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান থেকে একেবারে সরে থাকতে বলেছি—আদালতের রায়ও বজায় থাকুক, আবার বিষয়-আসয়টা, তাও বজায় থাকুক।' মধু ভট্‌চায্যি বললে, 'কি বলে তোমার ওই—ডাইভোস যে!'

ডাইভোর্সই বটে। শুধু একটা নয়—দু-দুটো।

প্রথম ডাইভোর্স সর্বজয়া—প্রথম স্ত্রী।

তার গালাগাল আর নাকী কান্না থেকে বাড়ির দাসী চাকর একদিন শুনতে পেলে—'ওই মুখপোড়া হাড়চিম্‌সে ভট্‌চায্যি কি মন্তর দিলে কত্তার কানে কানে—আমার কপাল ভেঙে গেল রে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। সর্বজয়া বেশ মনে করতে পারে—একদিন ধুলো পায়ে সোজা মহকুমা শহর থেকে এসে হাজির হলো মধু ভট্‌চায্যি—সন্ধ্যে তখন উৎরে গেছে। কার না কার খুনের মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়েছিল। এসে বললে, 'বড় খারাপ খবর শুনে এলাম শহর থেকে অনঙ্গ। গাঁয়ের ক'জন চাষাভুষোও আমার সঙ্গে গিয়েছিল সাক্ষী দিতে। ওরাও শুনেছে। শুনে তো সব বগল বাজাতে বাজাতে ঘরে ফিরেছে।'

অনঙ্গ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেছিল, 'ব্যাপার কি ভট্‌চায।'

সর্বজয়া বসেছিল পাশেই।

মধু ভট্‌চায্যি সর্বজয়ার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'তুমি ভেতরে যেয়ে আমার জন্যে এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দাও বড় গিন্নি, আমরা একটু নিরালায় শলাপরামর্শ করি।'

সন্ধ্যের বারান্দায় অনঙ্গের সামনে বসে ঘর-সংসারের কথা বলছিল সর্বজয়া— উঠে গিয়েছিল। মনে ভেবেছিল—কি জানি, খুনের মামলার কোনও গোপন কথা হবে হয়তো। তার সামনে সে সব বলতে চায় না ভট্‌চায্যি।

কিন্তু কী কথা হলো কে জানে—অনঙ্গের সারাটা রাত কাটল অনিদ্রায়। ভোর না হতে হতে গোপী গোমস্তাকে নিয়ে ছুটল মহকুমা শহরে, সঙ্গে গেল সেই মধু ভট্‌চায্যি।

শহর থেকে ঘুরে এসে অনঙ্গ যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। লোকটা ঘুমোতে পারে না রাতের বেলা—ঘুরে বেড়ায় অন্ধকার ঘরে ভূতের মত। কি যেন বলে বিড় বিড় করে—হাত নাড়ে, আঙুল নাড়ে আপন মনে। রাত্রিবাস আলাদা ঘরে।

হঠাৎ একদিন নিশুতি রাতে দমাদম ধাক্কা সর্বজয়ার ঘরের দরোজায়।

'খোল খোল—দরোজা খোল। কে তোমার ঘরে দেখবো।'

সর্বজয়া দরোজা খুলে দিয়ে থ' হয়ে দাঁড়াল।

ছোট ছোট দুই মেয়ে ভয় পেয়ে জেগে উঠে বসেছে বিছানায়। অনঙ্গ চারদিকে একবার ভাল করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'লোকটা কোথায় গেল?'

'কে লোক! কী বলছ?'

'কী বলছি!'

অনঙ্গ ধরল সর্বজয়ার চুলের মুঠি—এক ঝটকায় ছিটকে দিলে মেঝেয়। খাটের পায়ার ঠোক্কর লেগে কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল। ছোট মেয়ে দুটো ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে চেঁচাতে লাগল প্রাণপণে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে ছুটে এল চাকর-চাকরাণীর দল। আপাতত অনঙ্গ সবে গেল। কিন্তু ঘটনাটা নানা রঙে রটে গেল চারদিকে পরের দিন সকাল থেকে।

অনঙ্গের অত্যাচার বাড়তে লাগল দিনের পর দিন—বাড়তে লাগল রাত বিরাতে তেমনি দরজায় ধাক্কা। দেখতে দেখতে সুখী সম্পন্ন জোতদারের বউ সর্বজয়ার ঢিলেঢালা দিনগুলো হঠাৎ যেন কোন বাজীকরের যাদুতে বদলে গেল। বিনা মেঘে বজ্রপাত হয়ে গেল। সর্বজয়ার ইনিয়ে বিনিয়ে গুমরে মরা কান্না একদিন সাড়া জাগিয়ে ডুকরে উঠল:

'সেই বিট্লে বামুন, হাড়চিম্সে ভট্চায কোন মন্তর দিয়েছে…ছোট বউ নিঘ্ঘাত কিছু খাইয়ে দিয়েছে গো। অমন লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কপাল আমার পুড়ে গেল রে।….' মেঝেয় মাথা ঠুকতে ঠুকতে সর্বজয়া মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে রইল আধ ঘণ্টা।

অত্যাচারের যখন বাড়াবাড়ি—এগিয়ে এল সেই মধু ভট্চায্যি। চাষাভুষোর পাড়ায় গিয়ে একজন লোক ঠিক করে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলে সর্বজয়ার বাপের বাড়ি। বললে, 'অবলার ওপর অত্যাচার! মধু ভট্চায সহ্য করবে না বাবা—সে তুমি অনঙ্গ চৌধুরীই হও আর যত বড় জোতদারই হও। আমি মা চণ্ডীর সেবক। বলি—তোরা শুনেছিস তো সব।'

চাষাভুষোরা বোকা বোকা চোখে চেয়ে বললে, 'ওই ওদের চাকর-চাকরানীদের মুখে যতটুকু শুনি—'

'বাস্ বাস্—তোরাই সাক্ষী। ছুটে চলে যা একজন কেউ চিঠি নিয়ে।'

চিঠি গেল। ছুটে এল সর্বজয়ার বাপ, ভাই। দফায় দফায় শলা-পরামর্শ করল আগে এসে মধু ভট্চাযের সঙ্গে। তারাও ডাকাবুকো জোতদার। একদিন একেবারে পাল্কী বেহারা নিয়ে গিয়ে সর্বজয়ার ভাই হাজির হল অনঙ্গ চৌধুরীর উঠোনে। প্রথম কথা কাটাকাটি, তারপর গালাগালি। শেষে, সর্বজয়া চোখ মুছতে মুছতে দুই মেয়ে নিয়ে উঠল পাল্কীতে।

অনঙ্গ বলে উঠল, 'যারা এখানে আছ—সব শুনে রাখ। আমি বড় বউকে ত্যাগ করলুম।'

তা দাঁড়িয়েছিল অনেকে। সংসারের দাসী চাকর রাঁধুনী—ক'জন মজুর কাজ করতে এসেছিল চাষীপাড়া থেকে, তারা সব ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

সর্বজয়ার ভাইও পাল্টা বলে গেল, 'করো ত্যাগ। তোমার দালানের একটা একটা ইট খসিয়ে তবে ছাড়ব—আমিও বলে গেলাম।'

পরের ঘটনা বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা। আগে মামলা দায়ের করল অনঙ্গ। বিপক্ষে তখন দাঁড়িয়ে গেছে মধু ভট্চায্যি। সর্বজয়ার তরফ থেকে দাঁড়িয়ে গেল তার বাপ ভাইয়েরা—পেছনে ভট্চায্যি। এজলাসের দরোজা বন্ধ করে মামলার শুনানি হলো। যত হোক, বড় ঘর—মানী ঘরের মামলা তো, স্বামী-স্ত্রীর ভেতরের কথা কত বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। গাঁয়ের চাষাভুষো উৎসাহী কিছু মানুষ দরোজার বাইরে বৃথাই কান খাড়া করে রইল। ওদিকে ভেতরে দু'পক্ষের উকিল-মোক্তারে মিলে মামলা শেষ করে দিলে। বিবাহ-বিচ্ছেদ কায়েম। দুই মেয়ে থাকবে মায়ের কাছে।

গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে চলে গেল অনঙ্গ। পেছনে কাঁদতে কাঁদতে বেরুল সর্বজয়া। বাপ সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'কিছু ভয় নেই মা, ত্যাখ না ব্যাপারটা কী হয়। বলি আমরা তো এখনও বেঁচে আছি।'

এরপরে আরও বড মামলা। রুজু হলো সর্বজয়ার তরফ থেকে। সম্পত্তির ভাগ—তার নিজের ভরণ-পোষণ আছে, আছে দুই মেয়ে—তাদের ভরণ-পোষণ, বিয়ে-থা আছে।

এ মামলা আর বেশী দূর গড়াল না।

মধু ভট্‌চায্যি বললে, 'উকিল-মোক্তারকে আর বৃথা পয়সা খাইয়ে কী হবে—নিজেরা ঠিকঠাক করে নিষ্পত্তি করে নাও না। অবশ্য অনঙ্গ যদি রাজি থাকে।'

অনঙ্গ রাজি হয়ে গেল।

পেছন থেকে মধু ভট্‌চায্যিই হিসেব নিকেশ করে ঠিকঠাক করে দিলে—অনঙ্গের সমস্ত সম্পত্তিব হিসেব তার নখ-দর্পণে। বলা যায়—মোটা একটা অংশেই দাবী সর্বজয়ার।

অনঙ্গ বলল, 'মানতে পারি—সম্পত্তি নিয়ে বাপের বাড়ি থাকা চলবে না। এই ভিটেতেই থাকতে হবে। আমার চৌদ্দ পুরুষের ভিটে। সেখানে বাতি জ্বলবে না—এ হতে পারবে না।'

সর্বজয়া রাজি।

অম্লান বদনে অনঙ্গ কোর্টের কাগজে সই-স্বাক্ষর করে দিলে। অন্দর মহলের দিকে—বসত ভিটার এক অংশ পেয়ে গেল সর্বজয়া। পরের দিনই রাজমিস্ত্রী ডেকে সর্বজয়ার অংশ ঘিরে একটা পাকা পাঁচিল তুলে দিলে অনঙ্গ। তা দিক—মাঝে মাঝেও তো তবু লোকটাকে দেখা যাবে আড়াল-আবডাল দিয়ে।··· সর্বজয়া ভাবল, মেয়ে দুটোও তো বড় হচ্ছে।··· বাপের চোখের সামনে থাকুক।

সর্বজয়াকে জয়ের আসনে বসিয়ে তার বাপ ভাই হাসিমুখে বিদায় নিলে। ভাই বলে গেল গলা নামিয়ে, 'কিছু ভাবিস নে দিদি—দেখিস সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব।'

বাপ খুশি—যাক মেয়ের নামে, নাতনীদের নামে মোটা বিষয় কব্‌জা করা গেছে।

সর্বজয়া কিন্তু খুশি নয়। এক ধারার জীবন চলছিল—হঠাৎ বদলে চলতে লাগল আর এক ধারায়। কোথায় কী যেন ঘটে গেল রহস্যময়ভাবে। শেষ পর্যন্ত এই ধারণাটা তার রয়ে গেল—ছোট বউ হৈমবতী নির্ঘাৎ কোন একটা ওষুধ বিষুদ খাইয়ে বিগড়ে দিলে স্বামীর মাথাটাকে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে ধারণা হলো তার বদ্ধমূল। অনঙ্গের পুরানো রোগ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এবারে অন্য আকারে।

হঠাৎ একদিন পাঁচিলের এপাশ থেকে শুনতে পেল সর্বজয়া—ঝন্ ঝন্ করে থালা, বাটি, গেলাস ছত্রখান করে যেন ছোঁড়াছুড়ি করছে কে।

সঙ্গে সঙ্গে অনঙ্গের হিংস্র চিৎকার :

'বিষ দিয়েছ—বিষ দিয়েছ তুমি। এই জলে তুমি বিষ দিয়েছ, এই খাবারে বিষ দিয়েছ। ভেবেছ, বিষ দিয়ে আমাকে নিকেশ করে বিষয় নেবে ? নচ্ছার মেয়েমানুষ কোথাকার···গুলী করে আজ শেষ করব।'

প্রাণভয়ে ছুটে পালাল হৈমবতী—ছুটতে ছুটতে একেবারে খিড়কীর দরজা দিয়ে সোজা সর্বজয়ারই মহলে। সর্বজয়াকে জড়িয়ে ধরে বললে, 'দিদি, আমাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলবে। বন্দুক নিয়ে আসছে।'

থর থর করে কাঁপছে হৈমবতী।

না, ছোট বউকে সে আজ ঠেলে তার সীমানা থেকে বের করে দিতে পারল না। বরং নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'ভয় নেই তোর—থাক এইখানে। দেখি কে গুলী করতে আসে।'

সর্বজয়ার চেয়ে অনেক ছোট হৈমবতী—বড় জোর বিশ-বাইশ বয়েস হবে। দেখতে আহ্লাদী আহ্লাদী মতো। প্রাণ ভয়ে যেন আরও ছোট হয়ে কুঁকড়ে গেছে। ছেলেপুলে তখনও হয় নি, হাতে অনেকরকম তাবিজ মাদুলী বাঁধা। সর্বজয়াকে প্রায় আঁকড়ে বসে রইল। একবার আস্তে আস্তে বললে, 'দিদি—আমাকে তুমি তোমার ঘর থেকে যেতে ব'লো না।'

না, সর্বজয়া তা বলে নি। কিন্তু রাখতেও পারে নি। পরের দিন লোক পাঠিয়ে স্বয়ং অনঙ্গ ডেকে আনলে হৈমর বাপকে। মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে বাপ বেচারী এতটুকু হয়ে গেল। সর্বজয়ার বাপের মত হৈমর বাপ খানদানী জোতদার নয়—সামান্য গরীব বামুন। মেয়ের চেয়ে বর বয়সে ঢের বড় হলেও এবং দ্বিতীয় পক্ষ হলেও—বড় ঘর দেখে সে সৌভাগ্য বলে মনে করেছিল : মেয়েটা তবু সুখে থাকবে। এখন সুখের চেহারা দেখে হতবাক হয়ে বসে রইল।

অনঙ্গ নিজে পাল্কী দিয়ে হৈমবতীকে সেইদিনই বিদেয় করে দিলে। বললে, 'ওকে আমি ত্যাগ করলুম। বিষ-কন্যা।'

সুরু হলো দ্বিতীয় ডাইভোর্স কেস।

মধু ভট্‌চায্যি এবারও দাঁড়িয়ে গেল অবলা জাতির স্বপক্ষে। হৈমবতীর

বাপকে সাহস ও শলাপরামর্শ দিয়ে বলল, 'নিত্যি দু'বেলা পুজো করি ভগবতীর। অবলার হয়ে না দাঁড়ালে ধর্মে সইবে না বাবা।'

চাষাভুষোর পাড়া থ'। তাদের প্রশ্ন—'ই হচ্ছেটা কী?'

বুড়োরা বললে, 'বহু পুরুষের পাপ চৌধুরী কত্তার মাথায় কামড়েছে এবার।'

জোয়ানরা বললে, 'অমন পরীর মত যুবতী বউটাকে ছাড়ান দিয়ে দিলে?'

মেয়েরা বললো, 'মুখি আগুন।'

আগের মামলার মতই খাড়া হল মামলা। অভিযোগটা ছিল যা নতুন। দু' পক্ষের ঝানু ঝানু উকিল মোক্তার এজলাসের দরজা বন্ধ করে সওয়াল করলে—কায়েম হয়ে গেল সাফ্ ডাইভোর্স।

তারপর ভরণ-পোষণের জন্য সম্পত্তির দাবী।

অনঙ্গ এবারও নারাজ হল না। তবে তার ওই এক কথা:

'সম্পত্তি নিয়ে বাপের বাড়িতে থাকা চলবে না। থাকতে হবে এই ভিটেতে।'

তাতে হৈমবতীর বাপও গররাজি নয়—হৈমও নয়।

সর্বজয়ার পাশে অধিষ্ঠান হ'ল হৈমবতীর। পরের দিনই মিস্ত্রী ডেকে হাঁক ডাক করে অনঙ্গ সর্বজয়ার সীমানা পাঁচিলটাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে হৈমবতীর এলাকা চিহ্নিত করে দিলে। নিজে আশ্রয় নিলে বা'র মহলে।

শেষ ডাইভোর্সও এ বাড়ির একদিন শেষ হলো এই ভাবে। পরে ছেলেও হলো বছর দুই-আড়াই বাদে, তার অন্নপ্রাশনও হলো জাঁকজমক করে।

তারও এক বছর বাদে আবার একটি নবজাতক এলো। এবার সর্বজয়ার পালা।

কপালে চোখ তুলে চাষাভুষোবা শুধালো, 'এ যে সবই হচ্ছে গো—শুধু ওদের ভেট জমিগুলান গেল কোথায় বল দিকিন।'

'ভেট' অর্থাৎ ভেস্ট জমি, পঁচিশ একরের বেশী হলে সরকারে ন্যস্ত হওয়ার কথা তখন। তা আবার বিলি বাঁটোয়ারা হবে গরীব রায়তদের মধ্যে। ওরা বড় আশায় আশায় ছিল—ঢের জমি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু ছাই পড়ল।

একদিন হাটের পথে চেপে ধরলে ওরা মধু ভট্চাযকে:

'তুমি সব জান—তুমিই বল ভট্চায মশয়, পঁচিশ একরের ঢের বেশী জমি ছিল চৌধুরী কর্তার—সে সব গেল কোথায়? একটা বিঘাও ভেট হলো নি?'

ভট্চায বলল, 'বাঃ, দু-দুটো বউ খোরপোষের বাবদে সম্পত্তি বের করে নিয়ে গেল না? জানিস তো, ডাইভোস হয়ে গেল।...'

'তবে ছেলে হয় কি করে মশয়। ও সব, মামলা-সামলা সাজানো—ঘর বন্ধ করে কী সব করলে…'

'তবে এক কাজ কর না—অনঙ্গ চৌধুরীকে বাপ সোপর্দ করে তোরা নালিশ ঠুকে দে।'

'ওই তো বাপ—না-কী?'

'যে বাপ, সে কথা শুধু সে-ই বলতে পারে—আমি পারবনি বাবা। বলে ভট্‌চাযি্য হন হন করে এগিয়ে গেল।

চাষাভুষোরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল এ-ওর দিকে।

কে একজন বলে উঠল, 'অদের কুলুজিতেই গলদ গ—অরা সব পারে।'

কৃষ্ণচূড়া

চঞ্চল নাগালের বাইরে। চলে গেছে গত রাত্রে। অগত্যা দেবযানীর রাগ তার দীর্ঘ কয়েক বছরের লেখা চিঠিগুলোর ওপরে গিয়ে পড়ল। নিজের ঘরের এক কোণে ফিকে নীল রংয়ের চিঠিগুলো নিয়ে সে ছোটখাট একটা অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দিলে।

ব্যাপারটা চোখে পড়ে গেল ছোট বোন সুরযানীর। বললে, 'ও কি পোড়ালে দিদি?'

দেবযানী দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'চঞ্চলের চিঠি।'

সুরযানী অবাক হয়ে বলল, 'এই এতদিনের সব চিঠি—সে যে তোমার চঞ্চলের একটা রোমাঞ্চকর পত্র-সাহিত্য দিদি! সব পুড়িয়ে ফেললে? পৃথিবীর বিখ্যাত সেই প্রেমপত্রগুলোর সংকলনটা আমি পড়েছি। বাজি রেখে বলতে পারি—তোমার চঞ্চলবাবুর চিঠি তার চেয়ে কোনো অংশে খেলো নয়।'

দেবযানী শুধু বললে, 'ও একটা স্কাউনড্রেল।' (প্রথম গালাগাল)

'কিন্তু চিঠিগুলো?' সুরযানী বললে, 'আমি হলে ওগুলো শক্ত দড়ি বা লোহার চেনে বেঁধে রেখে দিতুম। তোমার সব চিঠি তুমি দেখাওনি দিদি। যে দু-একখানি দেখিয়েছ সে যে রীতিমত শিল্প। একাধারে মাইকেল এঞ্জেলো আর তাঁর বিশুদ্ধ এ্যানাটোমীবোধ এবং শেলী কীটস রবীন্দ্রনাথ মায় সেকালের কালিদাস পর্যন্ত—সব এক আধারে। উদ্ধৃতিগুলো ওর যেমন মোক্ষম তেমনি সুন্দর।'

দেবযানী ফুঁসে বলল, 'একটা মিথ্যেবাদী।' (দ্বিতীয় গালাগাল)

'চিঠি হয়ত আবেগের মাথায় কখনো মিথ্যে—মানে এক-আধটুকু বাড়িয়েই বলেছে।' সুরযানী বললে, 'কিন্তু ওঁর নতুন কেনা ওই ছোট বাংলোটা? সে তো মিথ্যে কথা বলবে না দিদি। পরীক্ষার পর দু'মাস তোমার ছুটি—বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। চলে এলে বাবার কাছে। অদর্শনের দুঃখ সইতে পারবে না বলে বেচারী বাপের ব্যবসা ফেলে এই সাঁওতাল পরগণার পাণ্ডববর্জিত প্রান্তে এসে একটা বাংলোই কিনে ফেললে। এটাকে কি বল? রবি ঠাকুরের ক্যামেলিয়ার নায়ক একটা এ্যানিমিক ভীতু হাভাতে—আর চঞ্চল?'

'ও দেখিয়ে দিলে—টাকা আছে অঢেল।'

সুরযানী কপাল কুঁচকে বললে, 'কি জানি দিদি! তোমাদের এতদিনের এত

কাণ্ডের পরে হঠাৎ কী হল। এই তো সেদিন লুকিয়ে একা একা বেড়াতে গেলে—ফিরে এলে খোঁপা ভরা কৃষ্ণচূড়া নিয়ে। এসে চুপি চুপি বললে—আজ কি যে ছেলেমানুষি করলে চঞ্চল—জানিস !... তোমার সে কথা বেশ মনে আছে আমার। সেদিন দেখেই বুঝেছিলুম—নিজের বাগানের গোলাপ ক্রিসেনথিমাম না দিয়ে যে এ রাঙা মাটির দেশের কৃষ্ণচূড়ায় তোমার খোঁপা সাজিয়ে দিয়েছে—সে লোকটা প্রেমিক শুধু নয়—কবিও।'

কৃষ্ণচূড়ার প্রসঙ্গে দেবযানীর চোখ জলে উঠল—জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। বেলা তখন পড়ে আসছে। ঠাণ্ডা আলোয় আদিগন্ত প্রসারিত হয়ে পড়ে আছে রাঙা মাটির দেশ। এখানে চড়াই ওখানে উৎরাই। তারই ওপর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে গেছে সরু ফালি পথ। সেই পথের এক বাঁকে ঝাঁকড়া একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছে যেন আগুন লেগেছে। তলায় আরও কয়েকটা কি গাছের ঘন ঝোপ—পড়ন্ত বেলায় ছায়া ঘনিয়েছে সবটা জুড়ে। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে দেবযানীর ঠাণ্ডা কালো চোখে আজ যেন আগুন জলে উঠল। বিড়বিড় করে বললে, 'একটা সস্তা বুনো ফুল ! আমাকে অতটা সস্তাই মনে করেছিল ও।'

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সুরযানীও তাকিয়েছিল দূরের ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে। নিজের কথার রেশ টেনে সুরযানী বললে, 'সস্তা কি আর কিছু জানিনে দিদি। সত্যি কথা একটা বলি। জানো, পরের দিন সকালেই বেড়াতে যাওয়ার নাম করে ছুটেছিলুম তোমার ওই কৃষ্ণচূড়ার সন্ধানে।' বলে সে অর্থপূর্ণ ভাবে একটু হাসল। বললে, 'কি আর করি—নিজের খোঁপায় নিজেই গুঁজেছিলুম।'

চিঠি পোড়ানর আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছিল তখনও। দেবযানী তার সুটকেশের এক কোণা থেকে কতকগুলো শুকনো কৃষ্ণচূড়া ফুল মুঠো করে এনে দিলে সেই আগুনে ফেলে। পাতলা পাপড়িগুলো পুড়তে লাগল।

সেই দিকে নিষ্ঠুর চোখে তাকিয়ে দেবযানী দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'একটা বার্গলার—চোর।' (তৃতীয় গালাগাল)

'এঁ্যা ! কী বলছ দিদি ?'

'জানিস, ও আমার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে লোকেন দত্তের একটা চিঠি কখন সরিয়েছে। তাই নিয়ে আমার সম্পর্কে...ওঃ—সে বলা যায় না।'—

সুরযানী ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

দেবযানী বললে, 'আমিও আজ ওর বাংলো হাতড়ে ওর শাঁখচুন্নিদের লেখা ছেঁড়া-খোঁড়া যেসব চিঠি এনেছি...দেখতে চাস ?—'

'বাংলোয় ঢুকলে কি করে? চঞ্চলবাবু তো সব বন্ধ করে চলে গেছেন?'

'ওর সেই সাঁওতাল মালিটাকে ঘুষ দিয়ে।' বিড় বিড় করে ফের গাল দিলে দেবযানী, 'একটা বাটপাড়। লোফার।' বলে হাতের চেটোয় তখনও যে ক'টা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি লেগেছিল সেগুলোকে কুটি কুটি করে ফেলতে লাগল চিঠির আগুনে!

যেন কৃষ্ণচূড়ার সব প্রসঙ্গ ওইখানে শেষ করে-দিলে দেবযানী।

সুরযানী পরিষ্কার বুঝে গেল—দীর্ঘ দিন আগে হৃদয়গত প্রসঙ্গ একটা যেমন আরম্ভ হয়েছিল তেমনি শেষ হয়ে গেল। মাঝখানের অনেক চিঠি—অনেক গান, ফুল আর গন্ধ—তার কোন কিছু আর অবশিষ্ট রইল না।

খানিক বাদেই এসে দাঁড়াল দেবযানীর এতদিনের পত্রবাহিকা সল্‌মা—মূর্তিমতী বিদ্রূপের মত। যেমন সে হাসি-হাসি মুখ করে বলে, তেমনি করেই বললে, 'খৎ-টৎ কিছু দিবি নাকি দিদিমণি!'

যেন একমুঠো অঙ্গার ছুঁড়ে মারলে মেয়েটা মুখের ওপর।

দেবযানী যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে কোনো রকমে জবাব দিলে, 'না।'

সল্‌মা মুচকি হেসে বললে, 'কেনে গ। আমি যেতম যে।'

ওর হাসি, ওর কথা দেবযানী যেন আর সইতে পারে না। জংলি ছুঁড়িটা তো জানে সব আগের ব্যাপার। কিন্তু পরে? এখন কেমন করে বোঝাবে তার সব কথা বুনো এই সাঁওতাল মেয়েটাকে। কর্কশ কণ্ঠে শুধু বললে, 'যেতে হবে না।' বলে সে দ্রুত সরে গেল সল্‌মার সামনে থেকে।

নিজেকে সংযত করার জন্য গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে বারান্দার এক কোণে। কিন্তু সেখান থেকে যা দেখলে তাতে সে আরও অসংযত হয়ে পড়ল। দেখলে—চড়াই উৎরাই ছুটো পার হয়ে সল্‌মা চলেছে সেই চক্ষুশূল বাংলোটারই দিকে। এ বাড়ি থেকে তার সবই দেখা যায়—দূরবীক্ষণ দিয়ে নজর করলে যায় বাংলোর ভেতর পর্যন্ত। আগে তেমনও দেখেছে দেবযানী। কিন্তু বাংলোর মালিক চলে গেছে কলকাতা, তার ঘর দুয়ার বন্ধ। তবু সল্‌মা চলেছে ওই বাংলোটারই দিকে। অবাক চোখে চেয়ে রইল দেবযানী—তার যোগাযোগ আজ বিচ্ছিন্ন—পরিসমাপ্ত। তবু সল্‌মা ওদিকে যাচ্ছে কোথায়! কেন?

ওদিকে বন্ধ গেটে ঝাঁকি দিয়ে সল্‌মা ডাকল, 'হেই ঝমরু!'

গেট খুলতে ছুটে এল ঝমরু—বাংলোর অনুপস্থিত মালিকের একমাত্র পাইক-পেয়াদা-মালী। আজ কোনো চিঠি নেই। তবু সল্‌মা ঢুকল ভেতরে। আর কেন

যে তার এত অকারণ হাসি। হেসে যেন ছল্‌কে ছল্‌কে উঠছে। দূর থেকেও তা যেন দেবযানীকে বিঁধতে লাগল। তাকিয়ে রইল চোখ পাকিয়ে। কিন্তু কিছুই আর দেখা গেল না। গাছপালার আড়ালে ঝমরু আর সল্‌মা আড়াল হয়ে গেল। দূরবীক্ষণটা আনবে না কী? ভাবতে লাগল।

এবং শুধু জ্বলতে লাগলো ভেতরে ভেতরে দেবযানী। সল্‌মা যে তার কোনো প্রয়োজনে ও হতচ্ছাড়া বাংলোটায় যায়নি—গেছে নিজের টানে, দেবযানীর কাছে এটা এখন জলের মত পরিষ্কার। আগে চোখে পড়ে নি—পড়ার ফাঁক ছিল না, এখন পড়ল। একটা কিছু পাকিয়েছে ওই ছোঁড়াটার সঙ্গে নির্ঘাৎ। দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বললে—তুই একবার ফিরে আয় জংলী কোথাকার!

সল্‌মা ফিরল সন্ধ্যার পরে। গান গাইতে গাইতে। সে গানে তার প্রাণের আনন্দ যতটাই থাক—দেবযানী না বোঝে তার ভাষা, না বোঝে তার মর্ম। ওকে ডেকে নিয়ে এলো নিজের ঘরে। কড়া গলায় বললে, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

মেয়েটা সহজ নিলাজ গলায় বললে, 'হোই যে তোমার সয়াব কুঠিতে গ।'

তার মানে দেবযানীর সখার—বন্ধুর বাড়ি। কথায় যেন সল্‌মা এক মুঠো পাঁক ছুঁড়ে মারলে দেবযানীকে। নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে দেবযানী বললে, 'কেন গিয়েছিলি?'

'এমনি। সাধ হলো যে।' তেমনি সহজ নিলাজ গলায় বললে, 'সব কাজপাট সেরে তাই ভাবলম—যাই একবার ঝমরুর সঙ্গে দেখা করে আসি।'

'ঝমরু কি তোর চেনা লোক—গাঁয়ের লোক?'

'না—না, উ আলাদা গাঁয়ের। ওই তো তোমার খং দিতে গিয়ে চিনাশুনা। লোকটা বড় ভালো গ।'

আবার সার্টিফিকেট!

দেবযানী ফেটে পড়ল রাগে। ধমক দিয়ে বললে, 'ফের যদি ওদিকে যাবি তো তোর ঠ্যাং ভেঙে দেবো। ওখানে আর কোনদিন যাবিনে।'

এমন সময় সুরযানী এসে পড়ল সেখানে। বললে, 'কি হলো দিদি?'

দেবযানী বললে, 'এ জংলীটাকে নিয়ে ভারি মুশ্‌কিল—বোঝে না কিছু। ও গেছে আবার সেই বাংলোতে।'

'কেন?'

'সে ওই জানে। ওর নাকি সাধ হলো। সেখানে আছে আর একটা জংলী—ওই যে ঝমরু না কি নাম।'

'বলো কি দিদি ! চিঠি বইতে গিয়ে তোমার পত্রধারিণীও বাঁধা পড়ে গেল নাকি ?'

'দেখ সুরো, তোর ওই ফাজলামিগুলো সব সময় ভাল লাগে না।'

'তুমি বড্ড চটে আছ—মন মেজাজ তোমার ঠিক নেই।' রসিকতা বাদ দিয়ে সুরযানী বললে, 'তা ও যদি যায় তো যাক না।'

দেবযানী চটে বললে, 'ওই বাংলোতে যাওয়া আমি ওর ঘোচাচ্ছি।'

বাড়িটা ছোটই—ভবেশ বাবুর অবসর জীবনে বিরামের ঘাঁটি। আরও কয়েকটি বাঙালী পরিবারকে অনুসরণ করে বিশ্রামের জন্য এসে পড়েছেন এখানে। দুই মেয়ে—দেবযানী আর সুরযানী কলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়ে—এসেছে ছুটিতে। নিজে তিনি বিপত্নীক শান্তিপ্রিয় মানুষ—গত বছর স্ত্রী-বিয়োগের পর একেবারে সিধে চলে এসেছেন লোকালয় জনপদের সমস্ত কোলাহল ঝঞ্ঝাট পরিহার করে, ডেরা গেড়েছেন এই সুদূর সাঁওতাল পরগণার প্রান্তে এসে। নিত্য-সহায় পুরানো চাকর হরিপদ। এর মধ্যে ছুটির দিনে মেয়েরা এলে একঘেয়ে দিনগুলোর মধ্যে একটু নতুনত্ব আসে। ওদের হাসি, গান, কলরবে ভরে ওঠে সবটা। ওদের ফাইফরমাসের জন্য এবার যোগাড় করেছিলেন সাঁওতাল মেয়ে—সল্‌মাকে। মেয়েদের যাতে অসুবিধে না হয়।

কিন্তু দেবযানীর সব ওলট-পালট হয়ে গেল। এ বিশ্রাম স্থানে সব বিশ্রাম ও শান্তি দেবযানীর মন থেকে একেবারে ঘুচে গেল। তার নিজের যে-প্রসঙ্গ শেষ হয়ে গেছে তার ছেঁড়া সুতো ধরে এ এক নূতন অশান্তি। অশান্তি তার সল্‌মার প্রসঙ্গ নিয়ে, যেটার সূত্রপাত মাত্র হয়েছে এই মাসখানেকের মধ্যে। একটা ভাঙল, আর একটা গড়ল।

সেদিন সুরযানীকে সে প্রায় ধরে নিয়ে এল ঘর থেকে বারান্দায়। তখন বিকেল। বললে, 'কি বিচ্ছিরি কাণ্ড ছাখ।'

সুরযানী কিছুই না বুঝতে পেরে বললে, 'কী !'

'শুনছিস না বাঁশী বাজছে ওই বাংলোটার দিকে !' দেবযানী কুটিল চোখে কটাক্ষ করে বললে, 'আর ওই দেখ, ওই জংলী ছুঁড়ির গান।'

সুরযানী কৌতুক বোধ করে বললে, 'তাই তো রে দিদি, ঝমরুর বাঁশীর সুরটা যেন ওর গানের কথার সঙ্গে মেলানো অথবা ঠিক উলটো।'

সুরে সুর মিলিয়ে কি একটা গান গাইছে সল্‌মা আর জল তুলছে পাতকুয়ো থেকে। সে যেমন সহজ তেমনি সাবলীল।

দেবযানী চোখ পাকিয়ে বললে, 'দেখলি! কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীতে এগুলো সহ্য করা যায়?'

'তা আর কি করবে বল—গলা চেপে ধরবে?' সুরযানী হাসল। বললে, 'ও ওর মনের সুখে সুর মেলাচ্ছে।'

বলা বাহুল্য, সুরযানীর সে-হাসি দেবযানীর ভালো লাগল না। রাগ করে সে সেখান থেকে চলে গেল। বলে গেল—এর একটা হেস্তনেস্ত সে করবেই।

কিন্তু এর চেয়েও সাংঘাতিক একটা ব্যাপার দেবযানীর জন্যে ঘটতে বাকি ছিল তখনো। সেটা ঘটল পরের দিন বিকেলে। সেদিন ছিল হাট-বার। গ্রামের দিকে কোথায় যেন হাট বসে। সল্‌মা হাটে বেরিয়ে গেল দুপুরে। একা। কিন্তু পড়তি বেলায় ফিরে এল যুগলে, ঝমরু সঙ্গে—ফিরে এল অদূরের শালবনের ছায়া-ছায়া পথটাকে মুখরিত করে। একটা মেয়ের মিহি গলায় এবং ততোধিক মিহি একটা বাঁশীর সুরে কি এক দুর্বোধ্য ভাষার কথা ছিল, কে জানে—ওরা দু'জন ফিরে আসছিল তন্ময় হয়ে। বারান্দা থেকে চোখে পড়ে গেল দেবযানীর।

দেবযানী চোখ পাকিয়ে সুরযানীকে বললে, 'দেখলি অসভ্য জংলীর বেলেল্লাপনা! বাবাকে বলে আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করছি।'

কিন্তু এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগেও দেবযানী সুবিধে কিছু করতে পারল না। ভবেশ বাবু স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'ওরা নাচ-গান বড় ভালবাসে মা—দেখিস নি তো ওদের দলবেঁধে গান আর নাচ। ও তো শুধু দু'জন।'

দেবযানীর কেবল যন্ত্রণাই বাড়ল সে কথা শুনে। বাপকে সে কেমন করে বোঝাবে—বিশ্ব সংসারে আর কেউ নয়, কেবল ওই 'দু-জন' নিয়েই যত গণ্ডগোল। দেবযানী অতঃপর ঠিক করলে—সল্‌মার শাস্তির ভার সে নিজেই গ্রহণ করবে। বাপ্‌কে দিয়ে হবে না, সুরোও না। সল্‌মাকে ডেকে ধমকে দিলে, 'তোর এই ইকড়ি-মিকড়ি গান আর একবার যদি আমার কানে আসে তা হলে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।'

মেয়েটা সভয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

তারপর দিন থেকে তার গানের টুঁ শব্দটিও শুনতে পেল না দেবযানী। কিন্তু থামল না একটা আড়বাঁশী। সেটা দুপুরে বাজে, বিকেলে বাজে, রাতে বাজে। এ রাঙা মাটির চড়াই-উৎরাই তরঙ্গের মত তার সুর—শালবনের উচ্ছ্বসিত মর্মরের মত লঘু আর নৃত্যচঞ্চল। সেটা আর থামাতে পারলে না দেবযানী।

হঠাৎ একদিন রাতে বাঁশী শুনে তার মনে হলো—এ বোধ করি বা একটা ইসারা। শুতে পারল না। কি এক খ্যাপামিতে পেয়ে বসল। অন্ধকারে পা

টিপে টিপে সে উঠল—দরজা খুলে বেরিয়ে গেল বাইরে। যতটা পারল চোখ মেলে দেখল—না, কেউ কোথাও নেই। এগিয়ে গেল সে সল্‌মার ঘরের দিকে। সল্‌মার ঘর বন্ধ।

ফিরে বিছানায় শুতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল সুরযানীর কাছে। ঘুম-চোখে সুরযানী বললে, 'কি হলো দিদি! কোথায় গেছলে?'

'ওই জংলী পেত্নীটার ঘরে তালা লাগিয়ে এলুম।'

'কেন!'

'শুনছিস না—সেই বাঁশীটা বাজছে। আমি ঠিক বলতে পারি—ওটা হলো ওদের ইসারা। ছুঁড়িটা নিশ্চয়ই রোজ রাত্তিরে বেরিয়ে যায়। আজ থেকে ওর ঘরে তালা বন্ধ করলুম।'

সুরযানী ততক্ষণে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ক্রোধে ক্ষোভে দেবযানী শুধু একাই জেগে জেগে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। কোথায় তার যেন একটা শূন্যতা, একটা যন্ত্রণা। মনে হলো বুকে। না,—বোধ করি মাথায়।

দেবযানীর কড়া নজরে সল্‌মা ক'দিন না বেরুলো বাইরে—না করলে একটু সাড়াশব্দ। মুখ বুজে সে শুধু তার কাজ করে গেল। ওকে শায়েস্তা করা গেছে ভেবে দেবযানীর মনে ভারি আনন্দ হলো। কিন্তু সে মাত্র কয়েকটা দিন। দেবযানী সহসা একদিন দেখলে—সল্‌মা আবার চলেছে সেই চক্ষুশূল বাংলোটারই দিকে।

দেবযানী বিকেলে পায়চারী করছিল বাইরে—সল্‌মা পড়ে গেল তার সামনে। দেবযানী চোখ পাকিয়ে বললে, 'কোথায় যাচ্ছিস ওদিকে?'

সল্‌মা মুহূর্তের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকাল দেবযানীর চোখে চোখে। তেমনি স্থির গলায় বললে, 'ঝমরু সকালে ডেকে গেছে—কি তার কথা আছে বলবেক।' বলে সে এগোল।

দেবযানী প্রায় চীৎকার করে উঠল পেছন থেকে, 'সল্‌মা।'

সল্‌মা ঘুরে দেখল একবার—তারপর তেমনি স্থির শান্ত গলায় বললে, 'না গ—যেতেই হবে মোকে। সে ডেকে গেছে।'

'খবরদার বলছি—'

সল্‌মা যেন সে কথা শুনতেই পেল না। তার খাটো কাপড়-পরা আঁটসাট ওই কালো পাথরে কুঁদো দেহটা মূর্তিমান বিদ্রোহের মত চলে গেল দেবযানীর সুমুখ দিয়ে। দেবযানী প্রায় রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরে এলো।

সুরযানীকে বললে, 'ওই জংলীটা আজ ফিরে আসুক—ওকে আমি দূর করে ছাড়ব।'

সুরযানী বললে, 'কোথায় গেল আবার?'

'অভিসারে!' দেবযানী মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'ওর অভিসার আজ বের করছি।'

'বলিস কী দিদি—ওর বেশবাসটা একটু দেখতে পেলুম না তো!'

'পেত্নীর আবার বেশবাস। আদুল গা, তার ওপরে ওই তো এক আট-হাতি কাপড়, তার গন্ধে আবার ভূত পালায়। যত নোংরার বেহদ্দ। আসুক একবার।'

বিকেলে ছায়া ঘনতর হয়ে এল। দেবযানীর মনে অস্বস্তি। কোন কিছুতেই সে মন বসাতে পারলে না। এ-বই সে-বই নাড়াচাড়া করতে করতে জোর করে সে মন বসাতে চাইল—পারলে না। এই কথাটা মনে কেবলি বিঁধতে লাগল—সল্‌মাকে সে আটকাতে পারল না। মেয়েটা বুনো শুয়োরের গোঁ ধরে গেল তো গেলই!

এ দেশের ছায়া নীল বিকেলের বিরাট আকাশে বোধ করি কোনো যাদু আছে। ওর চোখের সামনের আদিগন্ত নীল আকাশটা আস্তে আস্তে যেন ওর নিজের কোন হারানো কথা মনে পড়িয়ে দিলে। মনে পড়িয়ে দিলে—এমনি দিগন্তে ছায়া ঘনিয়ে এলে সে-ও কোনদিন উন্মনা হয়ে উঠতো, বেশবাস প্রসাধন করত—বেরিয়ে যেত। বেরুবার মুখে একদিন দেখলে, তার অতিপ্রিয় গন্ধের শিশিটা একদম খালি। সেই সেণ্ট এখন কোথায় পায় সে—এই পাণ্ডববর্জিত জংলী দেশে? প্রায় তখন কেঁদে ফেলার মত অবস্থা তার। ওই গন্ধটা শুধু সে-ই যে ভালবাসে তা নয়। সে যে আরও একজন ভালবাসে। সেটা না মেখে কেমন করে যায় সে তার কাছে। গুরুজন পরিবাদ নয়—আর অন্য কোনো কিছু নয়, লক্ষ্মীছাড়া শূন্য সেণ্টের শিশিটাই পরিবাদ সাধলে, আটকে দিলে তাকে।

কিন্তু ওই জংলী মেয়েটার সে-সব কিছুর বালাই নেই। শ্যামল-চিহ্নবিরল এ দেশের মাটির মতই তার বিরল সাজসজ্জা, তেমনি সে স্বল্পাবৃত—উদ্‌ভ্রান্ত। দেবযানী যাকে বলে—'হায়া নেই।' সে ওর কোন কিছুই সহ্য করতে পারল না।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো—সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত। এমন সময় ফিরে এল সল্‌মা। দেবযানীর ডাক পড়ল। গিয়ে দাঁড়াল সামনে। দেবযানী যেন মুহূর্তে চমকে উঠলো ওর দিকে চেয়ে। এ জংলী মেয়েটার এ যেন এক নতুন রূপ। আগে দেখেনি। ওর শান্ত প্রসন্ন কালো মুখটায় এ দেশের অন্ধকার রাতের

স্নিগ্ধতা—উজ্জ্বল যেন এক ধ্রুবতারার দ্যুতি ওর গভীর চোখে। দেবযানীর চোখ জ্বলে উঠলো। প্রেমহীনা অপমানিতা নারীর ঈর্ষা। প্রায় পাগলের মত চীৎকার করে উঠল সে, 'কি করছিলি তুই এতক্ষণ ?'

হাতে ছিল আধুনিক 'পঁচিশ বছরের প্রেমের গল্পে'র বাঁধানো মোটা বইখানা—সেটা ছুঁড়ে মারলে দেবযানী। রাগে তখন হাত-পা তার সব কাঁপছিল বটে—তবু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। সল্‌মা একটা বোবা জানোয়ারের মত আর্তনাদ করে উঠল। তার কালো চিবুক বেয়ে ঝরছে তখন রক্তের ধারা। চোখ জ্বলে উঠেছে বাঘিনীর মত। এগিয়ে এল সে এক পা।

'মোকে তুই মারলি কেনে—মারলি কেনে ?'

মাঝখানে এসে পড়ল সুরযানী। হাত ধরে টান মেরে বললে, 'আয়—আগে তোর মুখ ধুইয়ে দি।'

ভোরবেলা উঠে দেবযানী দেখলে—সল্‌মা নেই। ছোট কুঠরিটা তার হা-হা করছে। অদৃশ্য হয়েছে তার বেতের ঝাঁপি—খান দুই কাপড়। বেলা বাড়ল—তবু তার দেখা নেই। সুরযানীকে গিয়ে বললে, 'ওরে ওই বুনো পেত্নীটা পালিয়েছে।'

সুরযানী তার সুটকেশ গুছোচ্ছিল। বললে, 'তাই নাকি !'

'ও আমি আগেই জানতুম। যা ঢলাঢলি সুরু করেছিল।' দেবযানী বললে, 'হ্যাঁ রে, সুটকেশ গুছোচ্ছিস যে !'

'ওমা, আজ যাব যে ! কলেজ খুলবে কাল। যাবে দিদি ?'

'নাঃ। কি করতে আর যাব।'

সুরযানী বললে, 'পড়ার শেষ তোমার—এখন মজা তোমারই।'

হঠাৎ দুজনেই ওরা সচকিত হয়ে উঠল সল্‌মার গলা শুনে। দেবযানী একটু এগিয়ে গেল দেখবার জন্যে।

সল্‌মা এসেছে—কথা কইছে ভবেশ বাবুর সঙ্গে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে ঝমরু।

সল্‌মা বললে, 'মোরা গাঁয়ে যাচ্ছি বাবু !'

'কেন রে ?'

'সেখানে মোদের মাত্‌বররা আছে।' সল্‌মা এক পলক তাকাল ঝমরুর দিকে—শান্ত চোখে। পরে একটু সলাজ মুখে ঝমরুকে দেখিয়ে বললে, 'ওর সঙ্গে মোর বিহা হবে।'

দেবযানী আড়ালে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেবযানী ওদের দেখতে লাগল। হেঁটে চলেছে দু'জন পাশাপাশি সামনের চড়াই উৎরাই ভেঙে কোন গাঁয়ের দিকে কে জানে! যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল সেই লালে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। দু'জনেই মুখ তুলে তাকাল—যেন মনে হলো হাসল মুখোমুখি চেয়ে। তারপর ঝমরু হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণচূড়ার ডাল ভেঙে নিলে একটা। তার ফুলগুলো ছিঁড়ে গুঁজে দিল সল্মার এলোমেলো করে বাঁধা খোঁপায়। মেয়েটা ঘাড় হেঁট করে ফুল পরলে। গোধূলি আলোয় উদ্ভাসিত তার চোখ মুখ—লজ্জা নেই, সংকোচ নেই। তারপরে অতি সহজ ভঙ্গীতে ঝমরুর কাঁধে হাত দিয়ে চলে গেল গাঁয়ের দিকে। ··অসহ্য!

কেমন ছায়া ঘনিয়েছে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়, নির্লজ্জ ওর প্রসারিত লাল পাপড়িগুলো থর-থর করে কাঁপছে হাওয়ায়—তরুলতাবিরল লালমাটির বুক চেরা অগ্নিশিখার মতো।

হঠাৎ একটা শব্দ হলো ধপাস করে।

সুরযানী সুটকেশ গুছোতে গুছোতে শব্দটা অনুসরণ করে তাকাল বারান্দার দিকে। চিৎকার করে উঠলো। ছুটে গেল বারান্দায়।

'এই দিদি—কী হলো!'

কিছু একটা হলো নিশ্চয়। সম্বিৎ হারাবার আগে দেবযানী বিড় বিড় করে শুধু বলেছিল: 'অসহ্য।'···

রক্তের দাম

কঅর এ্যাণ্ড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেকটার পরমানন্দ করের অপারেসন আসন্ন—রক্তের দরকার। নার্সিং হোমের ডাক্তার স্লিপে কয়েকটা ওষুধ-বিসুদের সঙ্গে লিখে গেছে—আপাতত দু'বোতল চাই।

বিপত্নীক পরমানন্দ। তাহোক, প্রত্যেকদিন বাড়ির কেউ না কেউ আসে দেখা করতে। সেদিন এসেছিল ছোট ছেলে সোমেন—সঙ্গে বৌ সুতপা। একটু জাঁকিয়ে সাজগোজ করেই এসেছিল সুতপা—নার্সিং হোম থেকে যাবে কোন ফিল্মে। তাহোক। এসেই পরমানন্দের পায়ে হাত দিয়ে বসেছিল সে—জিজ্ঞেস করেছিল, 'আজ কেমন আছেন বাবা!'

'ভাল আর কই বৌমা। পেটের যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারিনে।' কাতর কণ্ঠে বললে পরমানন্দ। তারপর ছোট ছেলে সোমেনের হাতে ডাক্তারের স্লিপটা গুঁজে দিয়ে বললে, 'দেখ কি লিখেছে।'

একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সোমেন বলল, 'হবে। থামো—আগে ওষুধগুলো কিনে আনি।'

বিশ মিনিটও হয়নি—সব ওষুধ কিনে নিয়ে ফিরে এল সোমেন, সঙ্গে আরও এনেছে কাগজের বাকসভরা সন্দেশ, অনেক রকম ফলপাকুড়, এমন কি দু'তিন খানা চটকদার ইংরেজি সাপ্তাহিক, পাক্ষিক পত্রিকা। পড়ে সময় কাটবে বাপের। নেই শুধু রক্তের বোতল।

পরমানন্দ বলল, 'রক্তের জোগাড় তো করতে হয়।'

'ও হয়ে যাবে।' অবলীলায় বলে উঠল সোমেন, 'তুমি কিছু ভেবো না। কালই আমি ব্লাড ব্যাংকে যাবো।'

'ব্লাড ব্যাংক!...' নিস্তেজ গলায় পরমানন্দ বলল, 'ডাক্তারের তো সন্দেহ আছে—পাওয়া যাবে কিনা। বললে—মজুদ কম। যা আছে তা এমার্জেন্সির জন্য।'

'টাকা ঢালবো। পাওয়া যাবে না মানে!' চড়া গলাতেই বললে সোমেন, 'তোমার কেসটা কি কম জরুরী—কম এমার্জেন্সি। তোমার কারবার কারখানা ফেলে কতদিন পড়ে থাকবে তুমি এখানে! ও তুমি ভেবো না বাবা। চাঁদির জুতোয় সব হয়।'

হয় কি না হয় কে জানে—তবে চাঁদি সোনা দানা গাড়ি বাড়ি কারবার ওদের ঢের।

শ্বশুরের পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বার বার হাতের ঘড়ি দেখছিল সুতপা। সোমেনের কাছে ইঙ্গিতটা অর্থবহ।

সোমেন বললে, 'চল সুতপা।' বাপকে বললে আবার, 'তুমি ভেবো না। কালই তুমি খবর পেয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, ব্যবস্থা একটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।' সুতপাও বলল, 'ভেবে ভেবে আপনি আবার শরীর আরও খারাপ করে বসবেন না যেন।' একটু মিষ্টি হেসে বললে, 'কাল এসে যেন আর গোমড়া মুখ দেখতে না হয় বাবা।'

পরের দিন ওরা কিন্তু এলো না—এলো বড় ছেলে রমেনের স্ত্রী মাধবী।

সেও সঙ্গে নিয়ে এসেছে গুচ্ছেক ফলপাকুড়, ডায়বেটিক মিষ্টি। মায় এক গুচ্ছ ফুল। ফুলদানির পুরানো ফুলগুলো ফেলে দিয়ে নতুন ফুল সাজিয়ে দিলে শিয়রের টেবিলে। তারপর সুতপারই মতো একটা টুল টেনে নিয়ে বসলো শ্বশুরের পায়ের কাছটিতে। পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'আজ কেমন আছেন বাবা?'

পরমানন্দ পাল্টা জিজ্ঞেস করল, 'সোমেন রক্তের ব্যবস্থা করতে পারল? আজ তার ব্লাড ব্যাংকে যাওয়ার কথা ছিল।'

'তবেই হয়েছে—ঠাকুরপো করবে ব্যবস্থা!' মাধবীর ঠোঁটের কোণে ধূর্ত হাসি। বললে, 'আমি আজই গিয়ে আপনার বড় ছেলেকে বলবো।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পরমানন্দ বলল, 'তুমি বলছো—সোমেন যায়নি!'

মাধবী হেসে বললে, 'মনে থাকলে গেছে হয়তো।' আপশোষ করে বললে, 'আমি যদি জানতুম—অফিস যাওয়ার মুখে একটু মনে করিয়ে দিতুম।'

'তোমাদের সে কিছু বলেনি?'

'কিচ্ছু না।' মাধবী জানাল, 'কাল ফিরলই তো সে বৌ নিয়ে প্রায় রাত বারোটায়।'

কাতর কণ্ঠে পরমানন্দ বললে, 'আমি আর যন্ত্রণা সইতে পারছি না বৌমা। রক্তের ব্যবস্থা হলেই ডাক্তার বলেছে—অপারেশন করবে।'

'রক্তের ব্যবস্থা আপনার হয়ে যাবে—ও আপনি ভাববেন না বাবা।' মাধবী বললে, 'আজই গিয়ে আপনার বড় ছেলেকে ব্যবস্থা করতে বলছি।'

ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়ে সেদিন মাধবীও বিদায় নিল।

পরের দিন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে দেখা করতে এল রমেন। বয়স চল্লিশের মতো। অফিস-কর্তা হওয়ার মতো দীর্ঘ ভারী চেহারা। হাতে কাগজ পত্র ফাইলে ভরা চামড়ার পোর্টফোলিও। সেটা বাপের শিয়রের টেবিলের ওপরে ধপ্ করে বসিয়ে দিলে। তারপর একটা চেয়ার টেনে একেবারে এলিয়ে পড়ল। আগেই গেয়ে নিলে নিজের কথা: 'ক'দিন আগে বুকের কাছে ব্যথাটা আবার চাড়া দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার নন্দীকে ডেকে দেখালুম—বললে, ক'টাদিন একটু বিশ্রাম নিন। তোমার এখানেও আসতে পারিনি—এদিকে কারবার কারখানার চাপ। তুমিও অসুস্থ। সব সামলানো দায় হয়ে উঠেছে। ভয় হয়—আমি যদি একবার পড়ে যাই—'

রমেন শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে কথাটা, যেন অনুমান করতে দিলে বাপকে—তা হলে কী একটা মহা বিপর্যয় ঘটে যাবে।

একটুখানি চুপ করে থেকে একটা শ্রান্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'যাক সে কথা। আজ কেমন আছ তুমি?'

'আমার তো নিত্য যন্ত্রণা রমেন।' পরমানন্দ বললে।

'ওষুধ বিষুদ খেয়ে কিছুই কমছে না?'

'নাঃ।' পরমানন্দ এতক্ষণে ফুরসুৎ পেল আসল কথাটা পাড়ার। 'সব আটকে আছে রক্তের জন্য। পেট তো কাটতে হবেই। তা সোমেন ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে কিছু করতে পারল?'

'ষণ্ডো চামার।' একটা গালাগাল দিয়ে রমেন মুখ বিকৃত করে বলল, 'কিছুই করতে পারেনি! উল্টে ওকেই নাকি চাপ দিয়েছিল রক্ত দেওয়ার জন্য। ও এক ফাঁকে পালিয়ে এসেছে।'

শুনে পরমানন্দ নির্জীব মুখটা আরও শুকিয়ে গেল।

ব্যাপারটা রমেনের দৃষ্টি এড়াল না। সে বলল, 'তুমি যা-ই বলো, আমার তো মনে হয়—চলে এসে ও ভালোই করেছে। টাকা দিয়ে যদি রক্তের ব্যবস্থা করা যায়—আমাদের রক্ত দেওয়ার কোন মানে হয় না।'

পরমানন্দ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল ছেলের মুখের দিকে। প্রায় ভিখারীর মতো। একটা মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে সজীব ভরাট, প্রদীপ্ত—আর একটা মুখ রক্তহীন, বিবর্ণ, শুকিয়ে যাওয়া—সে মুখে জীবনের অন্তিম প্রার্থনা: একটু রক্ত দাও।

রমেন আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ও তুমি ভেবো না বাবা—ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে।'

পরমানন্দ আস্তে আস্তে বলল, 'কী করবে ভাবছ ? লোকের সন্ধান তো করতেই হবে।'

'আজ বলেছি আপনার পি-এ নীহার দত্তকে।' রমেন সক্ষোভে বলল, 'একটা অপদার্থ পুষেছেন এতদিন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলে। না পারে ভালো করে একটা চিঠি লিখতে, না রাখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের খোঁজ খবর। আপাতত রক্ত দিয়ে একটু ঋণ শোধ করুক।'

'কী বলল সে ?'

'বলল—কাল জানাবে। আমিও বলে দিয়েছি—জানাবার কিছু নেই। কর্তাই যদি অফিসে না থাকেন তো তার আর কাজটাই বা কী।'

পরমানন্দ বলল, 'দেখ, ব্লাড ব্যাংকআবার অযোগ্য বলে তাকে বাতিল না করে। শুনেছি—তেমন না-কি ওরা করে থাকে। ছোকরা বড্ড রোগা তো।'

'তা বলে কী আব রক্ত নেই বোতল খানেক দেওয়ার মতো ?' বমেনের দীর্ঘ ভারী চেহারা ক্ষোভে রাগে আরও ডবল ভারী হয়ে উঠলো। বলল, 'তা ছাড়া রক্তের জন্যে টাকা দেবো আমরা।'

পরমানন্দ সাগ্রহে বলল, 'নিশ্চয় দেবো—খুশি হয়েই দেবো। কত চায় সে ?'

'কিছু বলেনি। চুপ করে সব শুধু শুনে গেছে।' রমেন বলল, 'সে আমি ব্যবস্থা করবো—তুমি কিছু ভেবো না।' ভরাট আশ্বাস দিয়ে রমেন তারপর একটা কাগজ বের কবলো পোর্টফোলিও থেকে। বাপের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার একটা সই দরকার। আমার নামে একটা পাওয়ার অফ এটর্নী। নইলে আমি তো কারবারের সই স্বাক্ষরে কাজকর্মে এক পা এগুতে পারছি না। তোমাকে যে কতদিন নার্সিং হোমে থাকতে হবে ঠিক নেই।'

পরমানন্দ অসহায়ের মতো সই করে দিলে।

কাজের লোক রমেন। কাজ গুছিয়ে সযত্নে কাগজটা ব্যাগে ভরে রাখল।

একটা অস্বস্তি—একটা যন্ত্রণা পেটের ভেতর থেকে যেন একেবারে ব্রহ্মতালুতে গিয়ে দাপাদাপি সুরু করে দিয়েছিল পরমানন্দের। ভয়ে ভয়ে বলল, 'ধর—নীহার দত্ত যদি রক্ত দিতে রাজি না হয়।'

'স্রেফ ছাঁটাই করব।' রমেন ফুঁসে উঠে বলল, 'না দিয়ে যাবে কোথায়। ওর সংসারের হালচাল জানি—চাকরী দিয়ে তুমি প্রায় ওকে বাঁচিয়েছ। থাক সে কথা। তুমি চিন্তা করো না। ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।' যাওয়ার সময় রমেন আবার আশ্বাস দিয়ে গেল।

আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে সবাই—আছে দু-বেলার দুটো নার্স, টেবিল আলমারী

ভরা ফলপাকুড় সন্দেশ, চটকদার পত্র-পত্রিকা কিন্তু নেই এক ফোঁটা রক্ত। পরমানন্দ একটা রক্তহীন প্রাণহীন মহাশূন্যে ঝুলে রইল। বাইরে কোথায় যেন কতগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে চেঁচামেচি করছে—খেলা করছে। তারা যেন মস্ত একটা নদীর ওপারে— প্রাণহীন ঊষর এপার থেকে কাঙালের মতো চেয়ে আছে সে, কিছু দেখতে পাচ্ছে না, নড়তে পারছে না, ভেতর থেকে পচে উঠছে শুধু দিনে দিনে মুহূর্তে মুহূর্তে। আর ওপারের প্রাণের উচ্ছল কলরবটা কেবলি বিঁধে যাচ্ছে তাকে। সেখানে কত নবীন রক্তের উচ্ছ্বাস।

'মরা···মরা···মরা।' খেলুড়ে বাচ্চাগুলোর কচি গলার কী তীক্ষ্ণ চিৎকার!··· পরমানন্দকে যেন তীরের মত এসে বিঁধছে।

'বাবুজীর রক্তের জোগাড় হয়ে গেল?'—

'কে!' পরমানন্দ চমকে উঠল। যেন তার চিন্তার রাজ্য থেকে কোন অশরীরী আত্মা কথা বলে উঠল।

'লছমনিয়া জী।' লছমনিয়া ঘর সাফ করছিল। ওদের বাপ-বেটার কথা শুনেছে।

'কিছু বলছিলি?'

'হ্যাঁ, ওই খুনের বাত্‌।' লছমনিয়া বলল, 'জোগাড় হলো?'

'এখনও হয়নি রে লছমনিয়া।'

'দরকার হলে বলবেন আমাকে।' লছমনিয়া বললে, 'দু-চারঠো ছোকরা আছে—খুনের কারবার করে।'

'করে! জানিস তুই?' পরমানন্দের উঠে বসতে সাধ হল।

'জানি বৈ কি। ঢের আদমিকে দিয়েছে। তবে হ্যাঁ, বেশী রূপেয়া লাগে।'

'দেবো। তুই এক্ষুণি ডাক। কত চায়?'

'সে আপনি বাতচিত করে লিন।' লছমনিয়া বললে, 'আর আমার বখসিস্‌ যা দিবেন—দিবেন।'

'তোকে এক্ষুনি দিচ্ছি'—পাঁচ টাকার নোট একখানা লছমনিয়ার হাতে দিয়ে পরমানন্দ বলল, 'তুই খবর দে। এক্ষুনি।'

'এখন হবে না বাবুজী, ডাক্তারবাবুরা আসবে।' লছমনিয়া বলল, 'ওরা লুকিয়ে ছিপিয়ে আসবে ডাক্তারবাবুরা যখন থাকবে না। সে আমি ব্যবস্থা করিয়ে দিব। ডাক্তারবাবুরা দেখলে একটু মুস্কিল আছে তো।'

'চেনে বুঝি?'

লছমনিয়া বললে, 'যেমন ওদের কারবার বাবু।'

পরমানন্দও কারবারী। তিনি চেপে গেলেন। আপাতত তাঁর রক্ত পেলেই হলো।

পরের দিন সুতপা এসে খবর দিল—নীহার দত্ত রক্ত দিয়েছে।

সুতপা সাতটা করে বলতে লাগল, 'সে আপনার ছোট ছেলে গিয়ে, কত কাণ্ড করে বাড়ি থেকে ধরে এনে—নিজে সঙ্গে ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ব্যবস্থা করেছে। যাক বাবা, আর একটা বোতল জোগাড় করতে পারলে বাঁচি।'

'আর এক বোতলের ব্যবস্থা আমি করেছি বৌমা!' পরমানন্দ বলল, 'তুমি কাল সকালে শ'তিনেক টাকা আমাকে দিয়ে যেয়ো। দেখো ভুল না হয়।'

সুতপা আনন্দে কলরব করে উঠল, 'ওমা! কী আশ্চর্য! আপনি নিজেই জোগাড় করে ফেলেছেন!'

হ্যাঁ, ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে পরমানন্দ। জানা ছিল না শুধু গোপন চক্রের সূত্রটা। সেদিন দুপুরেই যোগাযোগ হয়ে গেছে নির্বিঘ্নে।

ডাক্তাররা তখন রোগী দেখার পালা চুকিয়ে চলে গেছে। নার্সরাও বোধহয় কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে—তাদের তৎপরতা নিঃসাড়। বিরাট নার্সিং হোম নিঃশব্দ। সেই সুযোগে লছমনিয়ার ব্যবস্থায় তিনটি ছোকরা এসে ঢুকেছিল পরমানন্দের ঘরে। হাতে কয়েকটা কমলা লেবু—যেন অসুস্থ আত্মীয় স্বজনের কাছে এসেছে। এক ছোকরা বেশ কাঁধ চওড়া, গাট্টা গোট্টা—বেশ একটা নেতা নেতা ভাব। আর একটি ছিপছিপে রোগা—কেমন যেন অসুস্থ অসুস্থ মনে হয়। আর একটির বয়স ওদের দু'জনের চেয়ে কম—চিকন চেহারা, মুখে লেগে আছে কেমন একটা নিরীহ ভাব এবং বুদ্ধির ছাপ।

কাঁধ চওড়া ছেলেটিই কথা শুরু করেছিল। চাপা চাপা গলায় বলেছিল, 'লছমনিয়া আমাদের খবর দিয়েছিল স্যার।'

উৎসাহে উঠে বসেছিল পরমানন্দ। জিজ্ঞেস করেছিল, 'রক্ত কে দেবে—তুমি?'

'না—ও দেবে।' মার্জিত চেহারার অল্পবয়স্ক ছেলেটিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়েছিল সে।

পরমানন্দ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছিল, 'কিন্তু বয়সে তো ওকে বাতিল করে দেবে মনে হচ্ছে।'

নেতা ছোকরা হেসে বলেছিল, 'না স্যার, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গেছে। বয়স কুড়ি। ওজনেও আটকাবে না। মেপে নিয়েছি। আমাদের কাজ কিলিয়ার স্যার। আর দেখছেন তো মাল—একেবারে তাজা দেখে এনেছি স্যার আপনার

জন্যে—এই দেখুন—' ছেলেটার হাত টিপে টিপে দেখাল—মসৃণ চিকন চামড়ার তলায় কেমন রক্ত ফুটে বেরোয়।

পরমানন্দ তৃষ্ণার্তের মতো চেয়ে চেয়ে দেখছিল—কনুইয়ের কাছে কপালের কাছে, কয়েকটা শিরা রক্তে ভরা—নীল হয়ে আছে। সারা অঙ্গে প্রকৃতির নবীন উচ্ছ্বাস। ও যেন মানুষ নয়—তাজা, গরম অনেকখানি রক্তে ভরা একটা মস্ত বোতল পরমানন্দের কাছে।

দরদাম হয়ে গেল—এক বোতল দু'শ টাকা। কি ভাবে কোন নামে জমা পড়বে—তাও সব জেনে নিলে। রক্ত দেবে পরের দিন।

যাওয়ার সময় পরমানন্দ ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার নামটা তো বললে না।'

ওদের নেতা বলেছিল, 'ওর নাম কমল সোম।'

'ওরা সম্পর্ক জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?'

'সে সব আমার ওপর ছেড়ে দিন স্যার।' ওদের নেতা হেসে বলেছিল, 'বলবে নাতি। মেয়ের ছেলে—আবার কী!'

হুঁশিয়ার কারবারী পরমানন্দ - সব খুঁটিয়ে জেনে নিয়েছিল। যদি কোনো গোলমাল হয়, যদি ফস্‌কে যায়!

কিন্তু ফস্‌কে যাওয়ার মতোই অবস্থা দাঁড়াল যেন।

সুতপা সকালেই টাকা পৌঁছে দিয়ে গেল।

দুপুরের দিকে রক্ত জমা দিয়ে ছোকরাদের টাকা নিয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলো, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যেও হলো—তাদের কোনো পাত্তা নেই। বাড়ির লোকজন আজ প্রায় সবাই এসেছিল দল বেঁধে—সকলরবে। দুর্ভাবনামুক্ত হাসিখুসি। কিন্তু বিদেয় হলো সব মুখ গোমড়া করে। আবার সেই সমস্যা ঝুলে রইলো ওদের মাথার ওপরে।

রমেন ভুরু কুঁচকে বলল, 'টাকাটা আগে ভাগে দিয়ে দাওনি তো বাবা?'

'ডিজঅনেস্ট···ডিজঅনেস্ট।' সোমেন দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'দেশটা ডিজঅনেস্টে ভরে গেছে।'

কিন্তু কমল সোম এল ঠিক—সন্ধ্যের খানিক পরে। চোরের মতো এসে ঢুকল পরমানন্দের কেবিনে। পরমানন্দ আকুপাকু করে বলল, 'কী হলো কমল, রক্ত জমা পড়েছে?'

'না স্যার।' কমল একটা টুল টেনে বসল। মুখে তার দুশ্চিন্তার ছায়া।

'দেবে না?' করুণ গলায় জিজ্ঞেস করল পরমানন্দ।

'দেবো।' কমল বলল, 'একটা কথা ভেবে আজ দিইনি । শরীর খারাপ বলে ওদের কোনোরকম এড়িয়েছি আজ । ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে সবটা বলি।'

'বলো কী বলবে।' পরমানন্দ দুশ্চিন্তায় কমলের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কমল পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বললে, 'এইটে একটু দয়া করে পড়বেন।'

পরমানন্দ দ্রুত চিঠিটা চোখ বুলিয়ে গেল । ছোট চিঠি – কাঁচা হাতের লেখা, লিখেছে কে এক মিনু।

'মিনু কে?' পরমানন্দ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'আমার ছোট বোন।'

'তোমার মায়ের কি অসুখ কমল?'

'অনেকদিন থেকে ভুগছেন। কিছু লেখেওনি।'

শুধু লিখেছে – যদি দেখা করতে চাও চলে এস।

'ভেবেছিলাম : রক্ত দিয়ে কিছু টাকা পাবো, সেইটে পাঠাবো।'

'কী কর তুমি?'

'বি-এ পড়ি আর টিউশনি করি, একজনের বাড়িতে থাকি, একজনের বাড়িতে খাই একবেলা। আর একবেলা...' কমল আবার থেমে গেল।

পরমানন্দের মুখ দিয়ে ফস্ করে বেরিয়ে গেল, 'পাশ করো – চাকরী দেবো আমার ফার্মে। কথা দিচ্ছি।'

কমল বলল মাথা নেড়ে, 'না, পড়া আর হলো না। কাল ভেবেচিন্তে ঠিক করে ফেলেছি। আপনি যা দেবেন তাই নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাই । দেখি মায়ের চিকিৎসা করে।'

'বাবা নেই?'

'না।'

পরমানন্দ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল কমলকে। মুখে চোখে ওর সেই নিরীহ গ্রাম্যতা, কোথাও ভেজাল নেই। কুড়ি বছর বয়স হলেও বোধ করি তাই গায়ে লেগে আছে এখনো মায়ের গায়ের গন্ধ।

'তোমাদের বাড়ি কোথায় কমল?'

'সে অনেক দূর। বাঁকুড়া – তালডাঙ্গা গ্রাম।' একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল, 'মুস্কিল হয়েছে আপনার টাকাটা নিয়ে।'

সাগ্রহে পরমানন্দ বলল, 'কেন কমল – কী মুস্কিল? টাকা নিয়ে আমি তৈরী।'

'আপনি তৈরী জানি—কিন্তু ওরা নিয়ে নেবে দেড়শ, আমার ভাগে মাত্র পঞ্চাশ।' কমল বলল, 'তাই কাল আমি ভেবে ঠিক করেছি—' বলে থেমে গেল আবার।

'কী ঠিক করেছ কমল?' পরমানন্দ উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল।

'ওদের চোখ এড়িয়ে এক ফাঁকে আমি রক্তটা জমা দিয়ে আসব আপনার নামে।' কমল বলল, 'তেমনি ওদের এড়িয়ে এক ফাঁকে এসে পুরো টাকাটা নিয়ে সেই রাতের ট্রেনেই চলে যাবো তালডাঙ্গা।'

'তোমাকে দুশ' নয়—তিনশো টাকা দেবো কমল।' পরমানন্দ আবেগে বলে ফেললে, 'মনে রেখো—আমিও মরতে বসেছি কমল।' ···আহা এমন তাজা জ্যান্ত একটা বোতল যদি পিছলে যায়!

'ঠিক আছে স্যার।' কমল উঠে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, 'ওরা আমার পেছনে লেগে আছে। হয়তো খোঁজ করতে আসবে আপনার কাছে। আমি ওদের বলে দেবো—রক্ত আমি দেবো না। ওরা যদি আপনার কাছে জানতে আসে···'

পরমানন্দ মাথা নেড়ে বলল, 'আমি কিছুই বলবো না কমল।'

কমল আশ্বস্ত হয়ে চলে গেল।

কিন্তু সেদিন একটু রাত হলেও শিকারী নেকড়েদের চোখকে এড়াতে পারেনি কমল। করকরে তিনশ' টাকা পকেটে ভরে নার্সিং হোমের ফটক পার হতে না হতে চেপে ধরেছিল দুজোড়া হাত।

'বড় খেল্ খেল্ছ যাদু—বার কর টাকা।'

তারপর একটা ঝটাপটি।

'তবে মর শালা গাঁইয়া।'

গলাচাপা একটা করুণ চিৎকার উঠেছিল বটে, তবে পরমানন্দের ঘর পর্যন্ত সেটা আর পৌছয়নি। ফুটপাথে মুখ থুবড়ে পড়া একটা নিস্পন্দ দেহের ওপর শুধু শীতের ঠাণ্ডা রাত ঘন হয়ে এসেছিল ধীরে ধীরে—পরম আত্মীয়ের মতো।

উত্তরাধিকার

স্লিপার ঘষটানো একজোড়া দ্রুত পায়ের শব্দ হু হু করে এগিয়ে আসছে রমেশের ঘরের দিকে। ওই দুটো হুড়মুড়ে পায়ের শব্দ চেনা হয়ে গেছে রমেশের। সকাল থেকে আনাগোনা করেছে বহুবার। ললিতের সঙ্গে জেল-গেটেও গিয়েছিল। এখানে আসার পরে তার ঘরে এসেছে কয়েক বার। রান্না ঘরে বৌদির কাছে গেছে—কয়েকবার এসেছে ললিতের খোঁজে। দূর থেকে ও পায়ের শব্দ শুনেই রমেশ বলে দিতে পারে—ও হলো সেই পাশের বাড়ির মেয়েটা, বাসনা যার নাম। ইতিমধ্যে কুমুদিনীর কাছ থেকে ওর সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনেছে রমেশ। ভালো লাগেনি।

চটি ঘষটানো মেয়েটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, আব রমেশেব মুখটা ঘুরে গেল একেবারে উল্টো দিকে। মুখের পেশীগুলো সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হযে উঠলো ঝড় জল খাওয়া ব্রোঞ্জে গড়া কোনো সৈনিক মূর্তির মতো।

কুমুদিনী হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পড়ে রমেশের এই ব্যাপাবে। রমেশের পাশেই বসেছিল একটা চেয়ার টেনে—বাসনার দিকে চেয়ে অত্যন্ত বিব্রত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইল। ঘরের এই অনাত্মীয় আবহাওয়া হয়তো বাসনাকে স্পর্শ করলো না। জিজ্ঞেস করলো, 'বৌদি—ললিত ফেরেনি?'

এই নিয়ে পাঁচবার হলো ললিতের খোঁজ।

একটু ফিকে হেসে কুমুদিনী বললে, 'না তো!...সারাদিন গেল—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। তার দাদাকে পৌঁছে দিযেই সেই যে বেরিযে গেছে। কোথায় গেছে সে বলতো?'

কুমুদিনীর উল্টো প্রশ্নে বাসনা হেসে বললো, 'আমি কি করে জানবো!'

'জানিসনে তুই!' কুমুদিনী তরল মেয়েলী গলায় বললে, 'তখন যে কি কথা হচ্ছিল তোদেব? তুই বললি—যাবি। সে বলে গেল—এখন কিছুতেই না, বিকেলে।'

বাসনা হেসে বললো, 'ওই পর্যন্তই বৌদি। বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে মিটিং আছে, বলেছিল—এক সঙ্গে যাবো। কিন্তু বিকেল তো হলো; দেখুন না—ললিতেরই দেখা নেই।'

বাসনা যেমন হুড়মুড় করে এসেছিল তেমনি করে চলে গেল।

'ললিত! হুঁঃ—' রমেশ কেমন বাঁকা ভাবে বললো, 'ললিত ওর চেয়ে বয়সে বোধ হয় বড়ই হবে?'

'তা হবে।' ইঙ্গিতটা বুঝে কুমুদিনী সপ্রতিভ ভাবে বললে, 'বছর দেড়েকের বড় হবে হয়তো। ললিতের হলো ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার আর ও এবার বি. এ. দেবে।'

কুমুদিনীর কথাগুলো শোনায় যেন একটা মস্ত অপরাধের কৈফিয়তের মতো। সে কথা রমেশের কানে যেন ঢোকেই না। রমেশ তার কথার সূত্রে বললো, 'ছোটরা আমাদের সময়ে বড়দের দাদা বলে ডাকতো।'

কুমুদিনী এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে সহজ করে দেওয়ার জন্যে হেসে বললে, 'বাবা, তোমাদের দলের মধ্যে তো সবাই দাদা।'

'আমাদের ছেলেরা নেতাদের শ্রদ্ধা করতো, বড়দেরও।'

রমেশের এই রকম চাপা চাপা ভারী ভারী কথার পরে কুমুদিনী ঘাবড়ে চুপ করে যায়। বুঝল—একটা আক্রমণ আসছে।

রমেশ সোজা বলে ফেললো এবার, 'মেয়েটা যেন কী রকম!'

কুমুদিনী বিব্রত ভাবেই যেন রমেশের কথায় সায় দিয়ে বললে, 'ওকে ছোট-বেলা থেকেই ওই রকম দেখছি। একটু চঞ্চল ও।'

রমেশ একটু হেসে বাঁকা ভাবে বললো, 'কি জানি, আমি অন্ধ মানুষ—সব কিছু দেখতে পাচ্ছিনে। আমার কি মনে হচ্ছে জান বৌদি?—সব যেন কেমন হালকা, কেমন পলকা—সব যেন ওই বাসনার মত অস্থির। ওদের কোন লঘুগুরু জ্ঞান নেই। জেলের বাইরে এসে মনে হচ্ছে—পৃথিবীটা কি বিশ্রী ভাবে বদলে গেছে বিশ বছরে।'

কুমুদিনী কোন কথা বলে না। রমেশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে—ভয়ানক গুরুগম্ভীর দেখায় তাকে। নাকের দুপাশ দিয়ে গালের ওপরে গভীর হয়ে পড়েছে বয়সের বলিরেখা ঘোড়ার লাগামের মতো, থুত্‌নিটা ঝুলে পড়েছে কিছুটা, দেহে প্রৌঢ়ত্বের প্রসারতা। রমেশ কি যেন ভাবছে। ভাবতে ভাবতে বিরক্ত গম্ভীর মুখটা প্রসন্নতায় ভ'রে উঠছে আস্তে আস্তে। বিশ বছর পরের বিশ্রী পরিবর্তিত পৃথিবীটার মাঝখানে ভালোলাগার কি একটা পেয়ে গেল যেন সে তার অন্ধ চোখের সামনে।

হ্যাঁ, সে তার অতীত।

রমেশ বলে উঠলো, 'মৃণালকে তোমার মনে পড়ে বৌদি—সেই যে রিভলভার সমেত ধরা পড়লো ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাণ্ডারসনকে গুলি করতে গিয়ে।'

কুমুদিনী বললে, 'খুব মনে পড়ে। পাহাড়ীপুরের বাড়ীতে তোমার সেই কোণের ঘরে প্রায়ই আসতো যেতো। তখন কে জানতো তার মধ্যে অতো ছিল।

হাতে বই খাতাপত্তর থাকতো—ভাবতুম তার মাস্টার মশায়ের কাছে পড়া জানতে এসেছে।'

আজ বিশ বছর পরে সেই মেয়েটিই যেন গম্ভীর মুখে খাতাপত্র নিয়ে এসে দাঁড়ায় রমেশের অন্ধ দুই চোখের সামনে—তার পেছনে আর সব কিছু আড়াল হয়ে যায়, হালকা পলকা তুচ্ছ হয়ে যায় বাসনারা।

রমেশ সোৎসাহে বললো, 'সেই একদিনের কথা মনে পড়ে বৌদি—পুলিস যেদিন প্রথম খানাতল্লাস করতে এলো আমাদের বাড়ী? মৃণাল তখন আমার ঘরে। সেইদিনই হয়তো ধরা পড়তুম মৃণাল না থাকলে!'

কুমুদিনী চুপ করে শুনছে।…

রমেশ তার কথার সূত্রে বলে চললো, 'একেবারে নতুন আমদানী তিন-তিনটে রিভলভার সেদিন আমার ঘরে। মৃণাল চারদিক দেখে এসে বললো—পেছনের গলির দিকে মাত্র দু-জন, গুলি করে বেরিয়ে যাই চলুন রমেশ দা। সেদিন তার সাহস দেখে অবাক হয়েছিলুম বৌদি!'

রমেশ মৃণালের কথা শেষ করলো আচ্ছন্ন দুটি কথা দিয়ে, 'আশ্চর্য মেয়ে!' তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'জেল থেকে তোমার কথাও শুনেছি বৌদি। দলের সব যখন একে একে ধরা পড়ে জেলে এলো—তাদের মুখে শুনতুম তোমার কথা।'

সে কথায় কুমুদিনী কেমন যেন লজ্জিত, সঙ্কুচিত বোধ করে। তবু রমেশ টান মারছে তাকে সময়ের সুগভীর এক তলায়; আস্তে আস্তে কুমুদিনীও তলিয়ে যায় সে টানে।

রমেশ বললো, 'আচ্ছা, পুলিস সুপারিনটেনডেন্টের বৌয়ের কাছে সেই নতুন মাটির সরায় করে আতপ চাল কাঁচকলা আর থান কাপড় পাঠানো কি তোমার বুদ্ধি?'

কুমুদিনী হেসে বললে, 'শয়তান লোকটা বেয়াড়া অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন। ও ব্যাপার নিয়ে সে আবার এক কাণ্ড। সুপারিনটেনডেণ্ট ছিল মুসলমান তো—তার বৌ ওই সব জিনিসপত্তর পেয়ে বুঝতে পারে না, ব্যাপারটা কি। সে আবার সরকারী উকিলের বৌকে পাঠিয়ে রটিয়ে আসতে হয়েছিল—হিন্দু বাড়ীর বিধবাদের ওই সব খেতে পরতে হয়: কমিশনারের বৌ বিধবা হবে শিগগির, সাবধান না হলে। ভয় পেয়ে তারপর মেয়েটার সে কি কান্নাকাটি! স্বামীকে ধরে পড়লো—বদলীর দরখাস্ত কর।'

রমেশ বললো, 'ব্যাপারটা শুনেই আঁচ করেছিলুম—এতে মেয়েলী হাত আছে।'

কুমুদিনী বললে, 'বাব্বা! সে একদিন গিয়েছে। শেষ ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে

আসতে হলো কলকাতায়। তোমার দাদা ও সব কিছু বুঝতেন না—নিরীহ শান্ত মানুষ। তিনিও ক্ষেপে উঠলেন পুলিস যখন আমাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিলে।'

কেউ আর কোনো কথা বলে না। সুদূর এক অতীত তার একদিনের সমস্ত কথা ও কাহিনী নিয়ে যেন নিঃশব্দে এসে দাঁড়ায় ঘরের মাঝখানে রমেশের আহ্বানে। তার যাদুস্পর্শে কুমুদিনীও রমেশের মত যেন অভিভূত হয়ে বসে থাকে।

একান্ত অনিচ্ছায় যেন রমেশ ফিরে এল পরিবর্তিত বর্তমানে। নিরাসক্ত ভাবে বললো, 'ওয়েলিংটন স্কোয়ারে কি মিটিং আছে বলছিল না বাসনা?'

কুমুদিনী হেসে বললে, 'ললিতের ও সব খবর বাসনাই রাখে। আমি ও সবের কিছুই জানিনে। ছেলেপুলে ঘর-সংসার নিয়ে পারিনে আর ভাই। বাসনা পড়াশোনা টুকিটাকি নিয়েই ছিল—সে দেখি কবে থেকে ললিতের পেছনে ওই সব নিয়ে মেতে উঠেছে।'

রমেশকে অন্যমনা মনে হয়। হঠাৎ সে বলে বসলো, 'ওরা বোধ হয় ভালোবাসে—না বৌদি? মানে—'

ওরা মানে কারা বুঝেছে কুমুদিনী। বললে, 'কেমন করে জানবো?'

'তুমি জানো না বলতে চাও?'

'হয়তো হবে।' কুমুদিনী বিব্রত বোধ করে। বললে, 'ঠিক জানিনে। পাহাড়ীপুরের সেই এক কোণের ঘরে বসে তুমি সায়েব মারার ষড়যন্ত্র করতে—মৃণাল আসতো যেতো! ওরাও তেমনি দু-জনে মাঝে মাঝে ক্ষেপে ওঠে। চেঁচায়।···তখন মৃণালকে দেখে শাশুড়ী ঠাকরুণ ভাবতেন, মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে—বিয়ে করবে হয়তো।'

কথার মাঝখানে রমেশ বলে উঠলো, 'ছি বৌদি, মৃণাল আমার ছাত্রী ছিল।'

রমেশের মুখের দিকে চেয়ে কুমুদিনী চুপ করে গেল। সে মুখ এক লহমায় বদলে কঠোর হয়ে উঠেছে। তার দলের কড়া নিয়মনিষ্ঠা, সংযম আর কাঠিন্য সবগুলো যেন ফুটে উঠেছে রমেশের প্রৌঢ় আধবুড়ো মুখে কঠিনতর হয়ে! তার যুগের দুর্বলতা সে আজও যেন এতটুকু সহ্য করতে রাজী নয়। তবে এ যুগের কথা আলাদা—বাসনাদের যুগ: হালকা পলকা অস্থির। তার মতই চঞ্চল।

কুমুদিনী কথায় কথায় বলে গত তিন বছরের কলকাতার কথা। সারা শহরটা যেন একটা বারুদখানা। শুরু হেলো মিলিটারি ফৌজের সঙ্গে সাধারণ মানুষের লড়াই, বড় বড় মিছিল; স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী, সাধারন মানুষ—সবাই যেন ক্ষেপে উঠল। শুধু ললিত নয়, তার পেছনে পেছনে শুধু বাসনাই নয়—ওই

রকম হাজার হাজার ছেলেমেয়ে, হাজার হাজার মানুষ। তারপর হিন্দু-মুসলমানের গৃহযুদ্ধ। কেমন এক অভাবনীয় ভাবে রূপ বদলে গেল যেন যুদ্ধক্ষেত্রের।

শুনতে ভালো লাগে না রমেশের। বিদ্রূপ করে বলে উঠলো, 'তারপর বিপ্লবী বীরপুরুষেরা নিরস্ত্র মানুষদের ধরে ধরে মেরেছে।'

'না না—ললিতরা ওর মধ্যে নেই।' কুমুদিনী বললে, 'ওরা মানে ছাত্ররা সব ক্ষেপে উঠেছিল সেই মিলিটারীর সঙ্গে লড়াইয়ের সময়।'

এসব এ যুগের কথা। তাকে দু-হাতে যেন জোর করে ঠেলে দিয়ে রমেশ বলে উঠলো, 'নরেন দাসকে তোমার মনে পড়ে বৌদি?'

অতীতের একটি ছেঁড়া সুতো ধরে টান মেরেছে রমেশ আবার।

কুমুদিনী বললে, 'তোমাদের দলের সব চেয়ে সেই ছোট ছেলেটি তো? শুনেছিলাম, পুলিসের হাতে ধরা পড়েছিল—তারপর নাকি পাগল হ'য়ে গিয়ে আত্মহত্যা করেছিল।'

রমেশ বললো, 'পুলিসের হাতে পাগলই হয়েছিল বটে। অত্যাচারের তাড়ায় কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে দলকে বাঁচিয়ে গেছে সে।'

ছেলেপুলের মা কুমুদিনী—জিবে চুক্ চুক্ ক'রে শব্দ করে উঠল। বললে, 'কি সুন্দর টুকটুকে ছেলেটি ছিল!'

রমেশ খুশিতে হাসলো। তার প্রসন্ন মুখ নীরবে যেন এই কথাটাই বলে: এই তাদের বিপ্লবী আত্মত্যাগ—তাদের বীরত্ব—তাদের আত্মবিসর্জন! দম্ভেভরা সে মুখটা হঠাৎ বড় রূঢ় লাগে কুমুদিনীর কাছে।

রমেশ অনর্গল কথা বলে যায়। নরেন দাস, ভবানী, অনাথ—কত জনের নাম এসে পড়ে। সেই সব নির্ভীক সেরা ছেলেগুলি। কংসাবতীর বুনো চরে, গোপনন্দিনীর পাহাড়ী অন্তরালে দেশোদ্ধারের নিঃশব্দ সে এক বৈপ্লবিক আয়োজনের দিনগুলি। সেই সব দিনে, সেই সব পথে, সেই সব মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আজ বিশ বছর পরে সোৎসাহে আর সানন্দে যেন রমেশ ঘুরে বেড়ায়। কুমুদিনীকে সোজা প্রশ্ন করে:

'আছে ওদের তেমন ছেলেমেয়ে?—আছে তেমন ত্যাগ নিষ্ঠা?'

কুমুদিনী কেমন ঘাবড়ে যায়। কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে বললে, 'মৃণাল এখন কোথায় কি জানি।'

'তারা আর নেই—কেউ নেই। আমাদের দল ভেঙে গেছে বৌদি।' রমেশের হঠাৎ এই স্বীকারোক্তিতে কেমন বিষণ্ণতার আমেজ। বললো, 'সবাই কে যে কোথায় ছিটকে পড়েছে—শুনলাম অনেকে মত পথ বদলেছে। জেলের ভেতরে

থেকে আমি কিন্তু তাদেরই কথা শুধু ভাবতুম। ভাবতুম, বেরিয়ে গিয়ে আবার নতুন করে দল গড়বো।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো সে—যেন ধ্যানস্থ। তারপর আবার বলে চললো, 'জেলে থেকে পালাবারও বহু চেষ্টা করেছি। একবার অনেকখানি এগোলামও। কিন্তু ধরা পড়ে গেলাম শেষ পর্যন্ত। খুশি হয়ে জেলার উপহার দিল নিঃসঙ্গ অন্ধকার কারাবাস।—বাঁ চোখটা গেল তার কিছুদিন পরেই।'

কুমুদিনী জিবে আবার চুক্ চুক্ শব্দ করে উঠল। বললে 'চোখে কি খোঁচা মেরেছিল নাকি?'

'না—খোঁচাটোচা না। আমার চোখেব সামনে থেকে বাইরের জগৎটাকে একেবারে বোধকরি আড়াল করে দেওয়ার দরকার হয়েছিল ওদের।'

দুরন্ত সন্ত্রাশবাদী এক নেতাকে সকলের সঙ্গে সাধারণ শেলে রেখে জেল কর্তৃপক্ষের স্বস্তি নেই—তার জন্যে ব্যবস্থা হয়েছিল আলাদা এক শেলের, গভীর অন্ধকারে।

রমেশ বললো, 'প্রথমটা বড় কষ্ট হত। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে ফেললুম—মাথার ওপরে অনেক উঁচুতে একটা ছোট ঘুলঘুলি বেয়ে একটু আলো ছিটকে আসছে। কি ভালই যে লাগতো সেটুকু; সেই ছিল আমার সকাল সন্ধ্যের ঘড়ি। তোমাদের বাইরের খোলা মেলা আকাশ আর এত আলো—তার চেয়ে কত ভালো যে লাগতো সেই আলোটুকু। ওয়ার্ডারের সামনে সেদিকে কোনদিন তাকাতুম না—পাছে ধরা পড়ে যায়।'

রমেশ হাসলো। কুমুদিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

রমেশ বলে চললো, 'কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেলুম। জেলার এসে অনেক তোড়জোড় করে ঘুলঘুলিটা একেবারে চুনবালি দিয়ে বন্ধ করে দিয়ে গেল। তার ছ'মাস পরে যেদিন বাইরে নিয়ে এলো সেদিন আলোর দিকে আর তাকাতে পারিনি। দু-হাতে চোখ ঢেকে বসে পড়েছিলাম, কতক্ষণ ছিলাম মনে নেই। তারপর থেকে চোখে জল আসতো অনবরত।'

ওদের নিঃশব্দ আত্মবলির জীবন। কুমুদিনী শুনতে শুনতে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে লোকটা আজ অন্ধ ভেতরে বাইরে, সে থামে কই।

রমেশ বললো, 'তারও মাস চারেক পরে বোধ করি, দয়া করে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তখন বাঁ চোখটায় আর দেখতে পাইনে, ডান চোখটায় জল পড়ছে। অপারেশন করলো—গেল বাঁ চোখটা। তারপর ডান চোখটাতে ছানি পড়ে গেল। সেটা আর অপারেশন করাইনি।' শেষে হেসে বললো, 'রেখে দিয়েছিলুম ওদেরই

জন্যে, বাইরে বেরিয়ে ভালো করে সারিয়ে তুলে বাঁ চোখটার শোধ তুলবো।'

কুমুদিনী চাপা গলায় অসহ্য ভাবে বলে উঠল, 'শোধ তোলো তুমি।'

রমেশ করুণ হেসে বললে, 'শোধ তুলবো কী!—আজ সকালে ছাড়া পাওয়ার আগে স্বয়ং জেলার সাহেব শুনিয়ে দিল যে, আজ বৃটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করছে—সেই জন্যেই আমি ছাড়া পাচ্ছি।—স্বাধীন ভারতে!' বিদ্রূপ করে রমেশ বললো, 'জেলার বললে—জেলের বাইরে গিয়ে স্বাধীন দেশের মানুষ আপনি—দেখবেন আপনাদের ত্যাগ বৃথা যায়নি। আরও সব কি কি লম্বা লম্বা বাত আওড়ালো। শুনে লজ্জা পেলুম। সেই পুরানো জেলার—ফোকলা দাঁতে কথা বললে। বুড়ো হয়ে গেছে বোধ হয়।'—

রমেশেরও একটা গোটা যৌবন কেটে গেছে জেলের মধ্যে। চেহারায় প্রৌঢ়ত্বের শাদা নিশান—মনে কিন্তু বিশ বছর আগের বিদ্রোহ। ১৪ই অগাস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশের সকাল। জেলের গেট থেকে বাড়ীতে হাত ধরে নিয়ে এসেছিল ললিত আর বাসনা। কোনো ভিড় ছিল না জেল-গেটে—শহর জুড়ে ১৪৪ ধারার কড়া পুলিসী পাঞ্জা। হিন্দু মুসলমানের গৃহযুদ্ধ কিছুদিন হলো চুপচাপ। আবার একটা অন্ধ উচ্ছ্বাসের উত্তাপ সংগ্রহ করবার জন্যে যেন দম নিচ্ছে। সাধারণ মানুষ শঙ্কায় স্তব্ধ: চূড়ান্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনে একটা চরম মোকাবিলা হয়ে যাবে হয়তো দুই সম্প্রদায়ে। আজ সেই দিন।…

রমেশ বললো, 'নাঃ, এ রকম একটা দেশ আমরা ছেড়ে যাইনি। একবার ললিত আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বলেছিল—আমাদের অস্ত্র নাকি জনসাধারণের হাতে উঠেছে। সেদিন হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।' রমেশ বিদ্রূপ করে বললো, 'কিন্তু কথাটা মিছে নয়। আজ বাইরে পা দিয়ে বুঝলাম—বোমা-এসিড, রিভলভার স্টেনগান নিয়ে স্বদেশ উদ্ধারের জন্যে ললিতদের জনসাধারণ পরস্পরকে মেরে শেষ করে দিলে।' একটু থেমে রমেশ বাঁকা হেসে আবার বললো, 'আজ আবার ললিত বললো—জনসাধারণ নাকি দাঙ্গা চায় না।—হবে। ওরাই বোঝে। ওদের জনসাধারণ।'

কুমুদিনী চুপ করে বসে রইল। রাজনীতির খুঁটিনাটিতে সে ঢুকতে চায় না। শুধু সে এইটুকু বুঝল, পুরানো সন্ত্রাসবাদী রমেশ দত্ত বসে আছে তার সামনে। কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্যে কুমুদিনী সহজ গলায় বললে, 'বাসনা বলেছিল—তোমার মুখ থেকে গল্প শুনবে। কত কথা হলো কিন্তু সে-ই নেই।'

রমেশ চটে উঠলো, 'গল্প!—আমাদের কথা শুধু গল্প! হাত-পা গুটিয়ে আরাম

করে বসে শোনবার বস্তু হয়ে গেছে নাকি ওদের কাছে ? বল তো, ওরা কী—এ্যাঁ, ওরা কী ?'

ঠিক এই সময়েই কি বাসনা চটি ঘষটে ঘষটে আসছে হুড়মুড় করে। কুমুদিনী আতঙ্কিত হয়ে উঠল। রমেশ শুনছে কান খাড়া করে। পরিচিত পায়ের শব্দ। রমেশের মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে : ছুটো ছানি পড়া কানা চোখ, উত্তেজিত ক্ষুব্ধ বলি রেখা পড়া বুড়োটে মুখ। যেন পুরানো মর্চে ধরা এবড়ো খেবড়ো বল্লমের ফলা।

বাসনা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললো, 'আবার এ্যাসিড, গুলিটুলি ছুঁড়েছে বৌদি—আমাদের মেয়েরাও যাচ্ছে সেখানে। ললিত এলে বলে দেবেন। বড়বাজারে।'

কুমুদিনী শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, 'সে কি রে—আবার দাঙ্গা !'

বাসনা যেতে যেতে ঘুরে বিষণ্ণ গলায় বলে গেল, 'শান্তিবাহিনী আসছিল—হিন্দুরাই গুলি চালিয়েছে। শান্তিটান্তি ও-সব নাকি চলবে না।'

বাসনা চলে গেল।

রমেশের থুত্নিটা ঝুলে পড়েছে। বিশ্রী ক্ষুব্ধ একটা মুখ। আস্তে আস্তে বললো, 'বাসনা কী সেখানে গেল ?' যেন বিশ্বাস করতে পারছে না রমেশ।

'গেল তো !' কেমন অভিভূত কণ্ঠে কুমুদিনী বললে।

কিছুক্ষণ বাদে রমেশ যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলো আস্তে আস্তে আবার, 'গেল,—না ?'

কুমুদিনী শুধু হতাশভাবে বললে, 'মানুষ ক্ষেপে জানোয়ার হয়ে গেছে একেবারে।'

আর কেউ কোনো কথা বলে না। অতীতের কথা-কাহিনীতে ভরা ঘরের অন্তরঙ্গ উষ্ণ আবহাওয়া হঠাৎ যেন গোরস্তানের অসহ্য এক নীরবতায় ভরে গেল। সেদিনের আশা উত্তেজনা আজ নতুন করে যেন বেঁচে উঠেছিল। কিন্তু একটা ধাক্কায় কী হয়ে গেল যেন ! কুমুদিনীর ডানাগুটোনো ঘর-বাঁধা মন শঙ্কিত—সন্ত্রস্ত। রাস্তার ধারের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চোখ চারিয়ে দেখতে লাগল। অন্যমনে বললে, 'রাস্তার লোকজন কেমন এলোমেলো মনে হচ্ছে রমেশ। ছেলে-মেয়েগুলো যে কোথায় বেরিয়ে গেল সব !'—

রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো, 'ইচ্ছে হচ্ছে, আমার সেই বুড়ো জেলারের কাছে আবার ফিরে গিয়ে বলি—আমাদের সব স্বপ্ন সব সাধ শেষ হয়ে গেছে, দয়া করে আবার ভেতরেই নাও।'

বহুক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলে না। জানালার গরাদ ধরে কুমুদিনী তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। শহরের ধোঁয়াটে আকাশ কালো করে বিকেলের বিষণ্ণ ছায়া ঘন হয়ে আসছে আস্তে আস্তে।

'রাস্তার লোকজন খুব এলোমেলো—না বৌদি ?' রমেশের সকৌতুক প্রশ্ন।

'তাইতো মনে হচ্ছে রমেশ। কোথাও কোথাও জটলাও হয়েছে। ছেলে-মেয়েগুলো সব বেরিয়ে গেছে দুপুর থেকে ! এ আর পারা যায় না বাপু।' কুমুদিনী অতিষ্ঠ গলায় বললে, 'এই তো ঘিঞ্জি পাড়া—তার একটি মাত্র ওই ন্যাড়া পার্ক। পার্ক থেকে চার শো হাত তফাতেই মুসলমান মহল্লা। আজ একটা বছর থেকে ছেলে-মেয়েগুলো ঘরে পচে পচে শুকিয়ে গেল।'

রমেশ হঠাৎ একটু খুশির হাসি হেসে বললো, 'রাস্তার লোক ছুটোছুটি করছে না পাগলের মতো ?'

অবোধ জবাব কুমুদিনীর, 'তা করছে না।'

'করবে।' রমেশ বললো, 'উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটোছুটি করবে ওরা—বিশ বছর পরে, কানা চোখেই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—পাগলের মত চক্কর খাবে।'

কুমুদিনী কোনো কথা বলে না। শুধু ঝুঁকে একাগ্রভাবে কি দেখবার চেষ্টা করছে যেন। দেখতে পেল। বলে উঠল, 'আমাদের এই পাড়ার মোড়ে মুসলমান পাড়ার পাশ ঘেঁষে তোরণ বানাচ্ছে দেখি গোটা কয়েক ছেলে। একটা ভয়ংকর কিছু না হয়ে যায় না আজ !'

'১৪ই অগাস্ট আজ।' রমেশ হালকা গলায় খোঁচা দিয়ে বললো, 'ঠিক রাত বারোটার সময় স্বাধীন হয়ে যাবে দেশ। তারই তোড়জোড় চলছে বোধ করি।'

কুমুদিনী অন্যমনে বললে, 'কি জানি !'

'বুঝতে পারছো না তুমি ?' রমেশ হাসলো। বললে, 'স্বাধীনতা বুঝতে পারছো না !'

কুমুদিনী বুঝতে পারছে না। বহু দিনের শৃঙ্খল মোচনের কোনো আবেগ, বহু রক্তপাতের পর স্মরণীয় দিনের একটি মহোৎসবের কোনো আনন্দ-উজ্জ্বল চিহ্ন চোখে পড়ছে না তার। মহানগরীর পথে চলমান জনস্রোত—সেখানে আনন্দের কোন চিহ্ন নেই। বরং চমকানো শঙ্কা। এরই মাঝখানে পাড়ার গুটি কয়েক মাত্র ছোকরা তোরণ বাঁধছে। সামনের সব কিছু থেকে সেটা যেন অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন, তেমনি নিরুত্তাপ একটা ঘটনা মাত্র ! না, কোনো আনন্দ নেই—কোনো আবেগ নেই। বরং কুমুদিনী একটা গন্ধ পাচ্ছে যেন ঘন কালো শঙ্কার।

রমেশ জিজ্ঞেস করলে, 'এ পাড়ায় তোরণ বাঁধা হচ্ছে কিন্তু মুসলমান মহল্লায় হচ্ছেটা কি? রাস্তার এধার ওধার তো। দেখতে পাচ্ছ না?'

'কিছুটা দেখতে পাচ্ছি।' কুমুদিনী একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, 'তারা কয়েকজন মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদিকে দেখছে।'

'মোড়ে মিলিটারী পিকেট নেই?'

'আছে।'

'তারা ক্ষেপিয়ে দিচ্ছে না?'

কুমুদিনী চাপা গলায় বললে, 'ওদের বিশ্বাস নেই। এখুনি লাগিয়ে দিতে পারে। ওই তো! শুনতে পাচ্ছ—কোথায় যেন একটা হল্লা পাকিয়ে উঠছে?'

রমেশ নিষ্ঠুরভাবে হেসে উঠলো, 'খুব শুনতে পাচ্ছি। এই এদের যুগ!…'

বহু দূরে কোথায় যেন একটা হল্লা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে—বাতাসে তার অনুরণন। রাস্তার লোকগুলোকে কেমন চনমনে মনে হয় কুমুদিনীর। দূরের মুসলমান মহল্লাটা এতক্ষণ যেন ঝিমিয়ে ছিল। এমনিতেই ওপাশটা জনবিরল—এপাশের লোক পা বাড়ায়নি পুরো একটি বছর। হঠাৎ সেদিকেও যেন একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। ঝটপট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দোকানপাট। দূরের হল্লাটা যেন ক্রমশ জোরে পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশ ভরে তুলছে।

'শুনছো বৌদি?' রমেশ বললো, 'শেষ শ্রাদ্ধটা যেন জমবে ভালো।'

কুমুদিনী আতঙ্কিত কণ্ঠে বললে, 'শুনছি!'

হল্লা এগিয়ে আসছে এবার—কুমুদিনীর চারপাশের থম্‌থমে বাতাস মুখর হয়ে উঠছে। একটা মহাকায় যন্ত্র যেন কোথায় কোন বিদ্যুৎ প্রবাহের ছোঁয়া লেগে প্রথমে ধীরে, তারপর বিপুল বেগে তার মহাঘর্ঘর আওয়াজ জাগিয়ে তুলছে আকাশ বাতাস ভরে।

দু-এক জন করে লোক জমছে—ভিড় বাড়ছে তোরণ বাঁধার কাছে। বিকেলের ম্লান আলো কালো হয়ে আসছে ক্রমশ। সেই অস্পষ্ট আলোয় কুমুদিনী দেখতে পায়, মুসলমান পাড়ার মোড়ে হঠাৎ একটা দ্রুত তোরণ বাঁধার তোড়জোড়। তারপর তার আচ্ছন্ন চেতনার ওপর দিয়ে বহু দূরের পাকিয়ে পাকিয়ে ওঠা হল্লাটা উচ্ছ্বসিত সমুদ্র বন্যার মতো বয়ে যায়: 'এক হো…এক্ হো…'

রমেশ বিচলিত গলায় বলে উঠলো, 'এ কী! কি হচ্ছে বৌদি?'

'বুঝতে পারছিনে রমেশ।' কুমুদিনী আচ্ছন্ন ভাবে বললে, 'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিনে—সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কিন্তু মনে হচ্ছে, ওপাশের মুসলমান পাড়ায় কোথা থেকে অনেক পতাকা উড়ছে—ওদের সবুজ পতাকা আর তিন রঙা পতাকা।'

কুমুদিনী দম নিয়ে বললে, 'এপাড়া ওপাড়া হৈ হৈ করে মিশে যাচ্ছে হঠাৎ এক হো—এক হো করে। ওঃ-ই—পুলিসের গাড়ীটা মোড় থেকে চলে গেল যে!'

'চলে গেল?'

'হ্যাঁ—চলে গেল। পুবের মোড থেকেও চলে গেল। মোড়ে ভিড় বাড়ছে।'

'১৪৪ কি উঠে গেল! ব্যাপার কি বলো বৌদি? আমি বুঝতে পারছিনে।'

'কি জানি রমেশ।' কুমুদিনী শুধু একই কথা আবার বললে, 'এপাড়া ওপাড়া মিশে যাচ্ছে হৈ হৈ করে।'

'কেন?'

'কি জানি রমেশ! কি যেন হয়ে গেছে—সব মিলে মিশে যাচ্ছে।'

'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনে, কিছু বিশ্বাস করতে পারছিনে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে রমেশের অবিশ্বাসী কণ্ঠকে খড়কুটোর মতো কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল যেন দুরন্ত একটা ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপট: '…এক্ হো…এক্ হো…'

কাছে, দূরে—অনেক দূরে—শুধু এক নিরবচ্ছিন্ন শব্দ-সমুদ্র। আর কিছু শোনা যায় না, আর কিছু দেখা যায় না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট তরল অন্ধকারে অসংখ্য মানুষ তরলতর হয়ে অত্যন্ত অস্পষ্ট অস্থির ভাবে কি একটা আকারে যেন রূপ নিচ্ছে।

বিভ্রান্ত রমেশ শুধু বললো, 'ব্যাপারটা কী হচ্ছে বৌদি! বলো—আমাকে বলো।'

কুমুদিনী বলে উঠল, 'আহা-হা, সেই বুড়ো শালকর আমাদের মোড়ে এসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে রমেশ।'

'কে?'

'এই পাড়ায় দোকান ছিল—বুড়ো মুসলমান শালকর। তিন ছেলে মরেছে এই পাড়ায়। ওমা—ওই ত্যাখো!' কুমুদিনী বলতে বলতে আঁৎকে উঠল, 'দুটো ছোকরা রিভলভার হাতে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মোড়ের দিকে। যেন ক্ষেপে গেছে রমেশ! মাগো—কি ক'রে বসে। হে ঈশ্বর…'

'হুঁ।' রমেশ মাথা নেড়ে বললো, 'মারলো—না?'

'না তো—রিভলবার আকাশের দিকে তুলে সব ফায়ার করে দিল রমেশ।' আবেগে কুমুদিনীর গলা কাঁপছে।

'আকাশের দিকে?—শূন্যে?' রমেশ যেন বুঝতে পারছে না।

'কোথায় ছিল—ওরা কোথায় ছিল এতদিন! কেন এমন ক'রে সব শেষ করে দেয়নি!' আবেগে বলে উঠল কুমুদিনী।

'ওরা আর দাঙ্গা মারামারি চায় না?' রমেশ নিজেকেই শোনালো, 'তাই কী?'

কেউ উত্তর দিল না। রমেশ কিছু দেখতে পাচ্ছে না, কিছু বুঝতে পারছে না! একটা দুর্বোধ্য অন্ধকারের ওপর দিয়ে যেন চোখ ঝলসানো একটা জ্যোতির প্রবাহ বয়ে চলে যায়:

'...আজাদ হিন্দুস্থান...আজাদ পাকিস্তান...'

'তাই কী? স্বাধীনতা!' এতগুলো লোক তবে ঠকছে? বহুদিনের থিতিয়ে মরা অন্ধ আবেগ কি পথ খুঁজছে ললিতদের সেই জনসাধারণের বুক ভরা উচ্ছ্বাসের মধ্যে? রমেশ তার দু-চোখের গভীর অন্ধকারে বিভ্রান্তের মতো যেন হাতড়ে হাতড়ে খোঁজে, 'আমি কিছু বুঝতে পারছিনে বৌদি। বলো—বলো, কি হচ্ছে।'

'মানুষ হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গেছে রমেশ।' এইটুকু শুধু বললে কুমুদিনী আচ্ছন্ন গলায়।

আর কেউ কোনো কথা বলে না। রাত বাড়ছে। কুমুদিনী শুধু দেখছে—সমস্ত কলকাতার মানুষ যেন বেরিয়ে পড়েছে পথে আজ। চোখের আড়ালে, এতগুলি আবেগ উন্মত্ত মানুষের কেমন করে রূপান্তর হলো—জানার আগ্রহ এখন তার নেই। খড়কুটোর মত ভেসে গেছে সব জিজ্ঞাসা। শুধু দেখছে।...উচ্ছ্বসিত আন্দোলিত এক বর্তমান। রমেশ উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, তার অন্ধকার দুই চোখের সামনে অসংখ্য মানুষের অস্পষ্ট একটা অস্থির রূপ ভেসে উঠছে। সে শুধু গৃহযুদ্ধের অবসান ঘোষণা নয়, মুক্তির উত্তাল আবেগও নয়। সবগুলো মিলে-মিশে একাকার হয়ে একটা বিরাট নীহারিকা মণ্ডলীর মতো অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে, অত্যন্ত অস্থির ভাবে তাদের সহস্র সংঘর্ষের মাঝখানেও কি একটা রূপ নিচ্ছে। সে এক মহাকায় রূপ। সে রূপ রমেশের জেলের এক চিলতে পুরানো আকাশ আবৃত ক'রে, ইট কাঠ পাথর গলি ঘুঁজি ভেঙে মত্ত ঐরাবতের মতো তার অন্ধকার চোখের সামনে এসে যেন দুলছে। ললিতের কথা মনে পড়ে: জনশক্তি! রূপহীন বর্ণহীন অন্ধ এক পুঞ্জিত আবেগ! ললিত বলেছিল...

রমেশ বলে উঠলো 'ললিত এখনও ফিরলো না।'

কুমুদিনী বললে 'কোথায় মিশে গেছে আজ এই খ্যাপামীর ভিড়ে।'

'কটা বাজলো বৌদি?'

'১১টা। ওই ভাখো—কি বিরাট এক মিছিল হিন্দু-মুসলমানের!'—

'হিন্দু-মুসলমানের—কি বলছো?' কানা রমেশ নিঃসংশয় হওয়ার জন্যে যেন আবার জিজ্ঞেস করলো, 'খুব বড় মিছিল?'

মিছিল গলির মুখে। কুমুদিনী বললো, 'তাই তো দেখছি রমেশ!'

'...এক্ হো...এক্ হো...'

কুমুদিনী জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বলে উঠল, 'ওমা, মিছিল যে আমাদেরই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়লো রমেশ! তাইতো, কাকে ওরা যেন কাঁধে করে নিয়ে এসেছে!'

নিয়ে এসেছে ললিতকে।

কুমুদিনীর আচ্ছন্ন চেতনায় সবটা বোধগম্য হওয়ার আগে ক'টি যুবক ঘরে এসে ঢুকলো। তারপর একটি অজস্র ফুলে ঢাকা খাটিয়া সামনের বারান্দায়। রাশি রাশি ফুলের মাঝখান থেকে শুধু ললিতের মুখটুকু দেখা যাচ্ছে—যেন ঘুমোচ্ছে।

একটি ছেলে বললো, 'বড়বাজারে ওঁকে গুলি করে। শান্তি শোভাযাত্রায় আগে আগে ছিলেন।' একটু দম নিয়ে ছেলেটি বললো, 'সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাই। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই মারা যান। ঠিকানা জানিনে—সময় মতো খবর দিতে পারিনি। মরবার আগে একবার মাত্র জ্ঞান ফিরে আসে—তখনই সব জানতে পারি। তারপর আমরা মিছিল করে বেরিয়েছি।—'

রমেশ কান খাড়া করে শুনছে। সারা ঘর নিস্তব্ধ। বাইরে মহানগরীর অন্ধকার আকাশ ভরে কাছে আর দূরে নিরবচ্ছিন্ন গর্জন: এক্ হো···এক্ হো। ···

একজোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে দ্রুত—সেই চেনা শব্দ রমেশের, সেই হুড়মুড়ে, চঞ্চল, সংকোচহীন। দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলছে:

'বৌদি—ললিত ফেরেনি এখনও! বৌদি!—'

ঘরের সামনে থমকে দাঁড়ালো সে। এগিয়ে এলো ধীর পায়ে—নিঃশব্দে, সকৌতূহলে। তারপর সে-ঘরের মহানীরব এক দানব যেন গিলে ফেললো তাকেও। সবাই চুপ করে গেছে।

একটি ছেলে নীরবতা ভেঙে বলে উঠলো, 'উনি নার্সকে নাকি বলেছিলেন, ওঁর দাদা রমেশ দত্তের কাছে যেন একবার নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি নাকি আজ ছাড়া পেয়েছেন—পুরানো অগ্নিযুগের বিপ্লবী। আর—আর ওঁর হাতে একটা আংটি ছিল। বাসনা বলে কাকে ফিরিয়ে দিতে বলে গেছেন।'

বলতে বলতে ছেলেটি আংটিটা খোলবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো খাটিয়ার ওপরে।

হঠাৎ একটা বাঘিনী যেন পেছন থেকে আর্তনাদ করে ওঠে সুগভীর একটা খোঁচা খেয়ে:

'না না—না।'—

বাসনা। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে—টলে পড়ছে। কুমুদিনী ধরে ফেললে।

ঘরের মধ্যে নেমে এলো আবার সেই মহানীরব গুমোট। তার মাঝখানে শুধু

অবরুদ্ধ একটা ফোঁপানী শোনা যায়। উচ্ছ্বসিত একটা কান্নার সমুদ্র যেন ফুলে ফুলে উঠছে।

রমেশ এগিয়ে গেছে মৃতদেহের পাশে। হাতড়ে হাতড়ে দেখছে—হাত বুলোচ্ছে ললিতের মুখে চোখে নাকে কপালে। একটা তরুণ তাজা মুখ—অতি সাধারণ একটা মুখ: গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথায় লম্বা লম্বা চুল। ললিতের মুখটা মনে করবার চেষ্টা করে।

এলোমেলো কম্পিত হাতে ললিতের মুখে হাত বুলোতে বুলোতে রমেশ বিড় বিড় করে বললো, 'ললিত বলে গেছে…কি বললে তোমরা….তার দাদার কাছে!'…

গলাটা একটু যেন কেঁপে ওঠে রমেশের।…এই কী ললিতের প্রত্যয়িত চূড়ান্ত বার্তা!

গলির মোড়ে মিছিল অপেক্ষা করে আছে। ললিতের মৃতদেহ নিয়ে সারা রাত ওরা ঘুরবে শহরের পথে পথে। ফুলে ঢাকা খাটিয়াটা আবার বেরিয়ে এলো এক সময়ে বাইরে—দাঁড়ালো গিয়ে মিছিলের সামনে।

অজগরের মতো মিছিল চললো আবার, পড়ে রইলো একটা বাজপড়া ঘর।

ওরা কেউ আর কথা বলে না। হঠাৎ সব কথা বলা যেন ওদের শেষ।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে রমেশ জিজ্ঞেস করলো, 'বৌদি—বাসনা?'

'মিছিলের পেছনে ছুটে গেল। ওর চটি খুলে রেখে গেছে।'

'মিছিলে গেছে!' অন্ধ রমেশ কথাটা আওড়ালো নিজের মনে।

হঠাৎ এইসময়ে বাইরে থেকে নিরবচ্ছিন্ন শঙ্খরোল ভেসে আসে।

রমেশ বললো, 'বারোটা কি বাজলো বৌদি?'

'হ্যাঁ!' কুমুদিনীর গলা কাঁপছে।

'তাই শঙ্খধ্বনি। স্বা-ধী-ন-তা।'…কেটে কেটে কথাটা উচ্চারণ করল রমেশ।

কুমুদিনী নীরব।

'তুমি কি কাঁদছো বৌদি?'

'না তো।'

কিন্তু অজস্রধারায় গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের ফোঁটাগুলো। কান্না চাপার ব্যর্থ চেষ্টায় কাঁপছে থরথর করে। এমন দিনে সারা বাড়ীটা যে বড় খালি লাগছে তার। ললিত নেই।

রমেশ খসখসে ভারী গলায় বললো, 'ললিতকে নিয়ে ওরা শ্মশানে যাবে যখন—আমাকে নিয়ে যাবে বৌদি?'